CENTRAL LIBRARY

আড্ডা

মাসিক পত্রিকা
একবিংশতি বর্ষ

শা
র
দী
য়া
সং
খ্যা
১৩৭৭

সম্পাদিকা—রেখা চট্টোপাধ্যায়

With best Compliments of

THE PEERLESS GENERAL FINANCE & INVESTMENT CO. LTD.

Regd. Office :

'PEERLESS BHAVAN'

3, Esplanade East, Calcutta-700 069

INDIA'S LARGEST NON-BANKING SAVINGS COMPANY

CENTRAL LIBRARY

বাৎসরিক নিয়ম অনুসারে যথারীতি শারদোৎসব এসেছে। পত্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ও দোকানে বাজারে পোষাক পরিচ্ছদের সমারোহ থাকলেও ক্রেতার সংখ্যা সীমিত। সমস্ত দেশজুড়ে একটা অনিশ্চয়তার ভাব ছড়িয়ে আছে। ক্রমান্বয়ে জিনিষপত্রের যানবাহনের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে চলেছে। চিন্তায় ভাবনায় মানুষ জর্জরিত। এহেন পরিবেশে মা আসছেন তাই মনের আনন্দে মানুষ পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতে পারছে না।

আভা পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত তিনজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শয্যাশায়ী—শ্রীমতী আশাপূর্ণাদেবী, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীমতী মায়া বসু এবং অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব) শারদ সংখ্যায় এবার এঁদের লেখা পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া গেল না। শ্রীভগবানের চরণে এঁদের আরোগ্য কামনা করি।

এবারে যে সব লেখক লেখিকা ও বিজ্ঞাপন দাতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে পূজা সংখ্যা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে ৺বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই।

—সম্পাদিকা

কবি ও সাহিত্যিকা *৺শোভনা সেন*

স্মরণে—

সর্বে ভবন্তু মঙ্গলম
সর্বে সন্তু নিরাময়

M/s. A. K. SEN & CO.
M/s. I. T. T. PVT. LTD.

M/s. ALLIED CHROMES & CHEMICALS PVT. LTD.

M/s. ANALYTIQUE

43A, BLOCK-'C', NEW ALIPORE, CALCUTTA-700 053

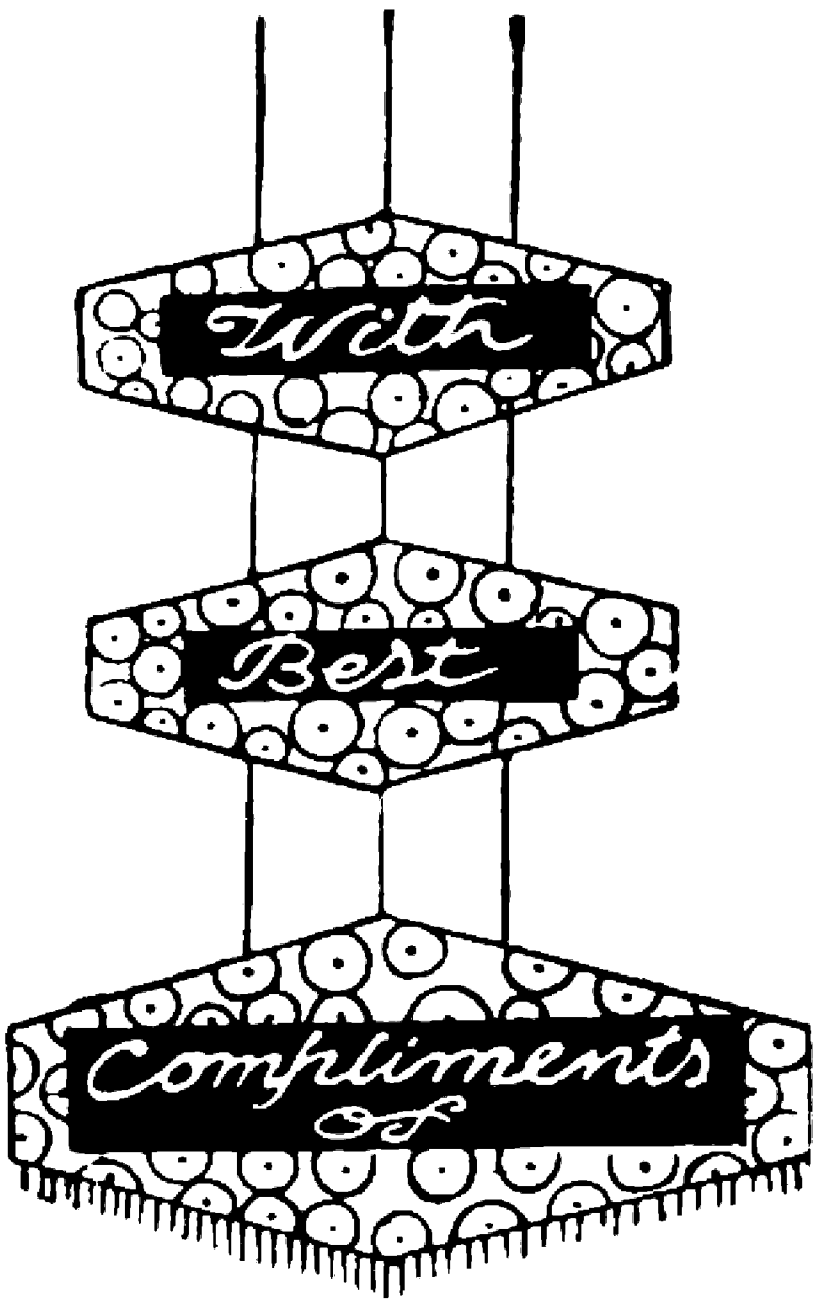

PRIYA BUISCUITS

সুসাহিত্যিকা *শোভনা সেন*-এর

পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য	(মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ৫০০তম আবির্ভাব স্মরণে)	মূল্য ২০ টাকা
সাধক মালিকা	(মহাপুরুষগণের জীবনী পদ্যে)	মূল্য ১০ টাকা
ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ	(পদ্যে)	মূল্য ৫ টাকা
মাটির প্রদীপ	(কাব্য গ্রন্থ)	মূল্য ৫ টাকা
ওরা কাজ করে	(গল্প)	মূল্য ১৫ টাকা

প্রকাশক : কৃষ্ণ কিশোর সেন, ১৮৩, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৬৯

প্রাপ্তিস্থান : এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।

কবি ও প্রাবন্ধিক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাবলী

কাব্য গ্রন্থ—

চলার গান (১৯৩৩) ; চন্দ্রমল্লিকা (১৯৩৫) ; চুনি পান্নার কান্না (১৯৩৬) ; **পৌত্তলিক (১৯৪১) ; ভ্রমণ (১৯৪৩) ; তিমিরাভিসার (১৯৫৪) ; সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা (১৯৫৯) ;** আশ্বিনের ফেরিওলা **(১৯৬৩) ;** সাঁকো থেকে দেখা **(১৯৬৮) ;** ঝাউয়ের শব্দ **(১৯৭৩) ;** হৃদয়ে চকিতে কে সে **(১৯৭৪) ;** ইদানীং আমি **(১৯৮০) ;** যা আছে যা নেই ; **(১৯৮৪) ;** ছবি ফিরে দেখা **(১৯৮৪) ; ইয়াক (১৯৮৮) ; রুশী কবিতা (অনুবাদ) (১৯৭৪)** ইত্যাদি।

প্রবন্ধ গ্রন্থ—

সাহিত্য-পরিক্রমা **(১৯৪৬) ;** বাংলা কাব্যে প্রাক্-রবীন্দ্র **(১৯৪৮) ;** দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ—**১৯৮১) ; সাহিত্য পাঠকের ডায়রি ১ম খণ্ড (১৯৫১) ; সাহিত্য পাঠকের ডায়রি ২য় খণ্ড (১৯৫৩) ; সাহিত্যের নানাকথা (১৩৬৩ ; দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৯০) ; সাহিত্য বিচিন্তা (১৯৬১) ; তারাশঙ্কর (১৯৬১) ; কবিতার বিচিত্র কথা (১৯৬১) ; দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ (১৯৬৪) ; রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ (১৯৬৩) ; বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ (১৯৬৩) ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ (১৩৬১ ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৬ ; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৪) ; বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা (১৯৬৮) ; দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে (১ম খণ্ড ১৯৭৯ ; ২য় খণ্ড ১৯৮১)** ইত্যাদি।

সুসাহিত্যিক **শ্রীমতী মায়া বসু**-র

কয়েকটি বই

নীল দিগন্ত—শশধর প্রকাশনী
নরক স্বর্গ নরক—শশধর প্রকাশনী
সবুজ দরজা—শশধর প্রকাশনী
জনারণ্যে একজন—শশধর প্রকাশনী
দূরাবগাহিনী—তুলি কলম
রাধাপদ্ম—জ্ঞান তীর্থ
তরঙ্গ বলয়—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কখন অন্য মনে—মিত্র ঘোষ
পতঙ্গের প্রেম—গ্রন্থ জগৎ
চেনা অচেনা— ,, ,,
সূর্য শিখা— ,, ,,
আলোকিত অন্ধকারে (কাব্য)—বিশ্বজ্ঞান

সাহিত্যিক শ্রীজ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"সাম্যবাদী রাজপথ" (নিবন্ধমূলক উপন্যাস)

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ৩০ টাকা

প্রকাশক : শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়দীপ প্রকাশন ; ১/৮৩, নাকতলা, কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

প্রাপ্তিস্থান : শৈব্যা পুস্তকালয় ; ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **বেদুইন**-এর

কয়েকটি বই

পথে প্রান্তরে (সম্পূর্ণ)—৩৫ টাকা	প্রকাশক	সাহিত্য প্রকাশ
অপরাধ অপরাধী—৩৫ টাকা	,,	,, ,,
অতঃকিম—৩৫ টাকা	,,	,, ,,
সমকালীন ভারতবর্ষ ও সুভাষচন্দ্র—২৫ টাকা	,,	নাথ পাবলিশিং
তৃতীয় পক্ষ বনাম চতুর্থ পক্ষ—১২ টাকা	,,	অনিমা প্রকাশনী
সন্ত্রাস যুগে যুগে—৩০ টাকা	,,	পত্রপুট

CENTRAL LIBRARY

With best compliments from

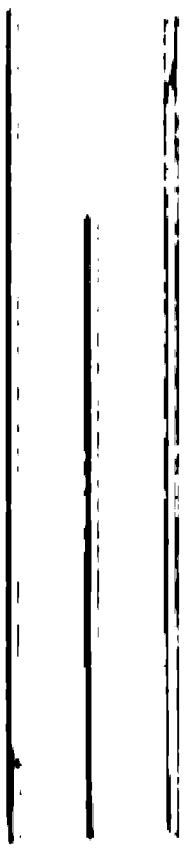

LOKNATH ENTERPRISE

12, BAMA CHARAN ROY ROAD

CALCUTTA-700 034

"মায়ের পূজায় সাদর অভিনন্দন—

শতরূপা

(আধুনিক ডিজাইনের তাঁতের শাড়ী ও ধুতি বিক্রেতা)

৬২/৪, সূর্য্য সেন স্ট্রীট, (ইণ্ডিয়া হোটেলের নীচের তলায়)

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

With best compliments of :

SUNNY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

13N, DHIRENDRA NATH GHOSH ROAD

CALCUTTA-700 025

.....If you are interested to go to Puri, Digha, Chandipur, Gopalpur etc., by AC / Non AC Cars please hurry up and book—also hotels at very reasonable rates.

DEEKAY ENTERPRISE

2A, EKDALIA PLACE, CALCUTTA-700 019

(Near Ballygunge Station)

Phones : 40-7612 & 40-4050

With
Compliments
of

DABUR (INDIA) LIMITED

CALCUTTA-700 029

প্রফেসর ডাঃ জি. সি, মুখার্জী ও ডাঃ (মিসেস)
কবীর প্রণীত—

"ডায়াবিটিসের জীবন ও চিকিৎসা"

(দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—১৫ টাকা।

ডায়াবেটিস রোগী, নার্স, সেবিকা, প্যারা-মেডিক্যাল কর্ম্মীদের জন্য
সাবলীল সোজা বাংলায় লিখিত।

প্রকাশক : ন্যাশনাল ডায়াবিটিক এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া (ইষ্ট ইণ্ডিয়া)
৬, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

প্রাপ্তিস্থান—'আভা' কার্যালয়', ৭৩সি, শরৎ বসু রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০২৬

ফাটা ছাদ ?
জল পড়ে ?
ফাটা ছাদের সমস্যায় হতাশ ?

মূল্যবান পরামর্শ ও দশ বৎসরের গ্যারান্টিসহ
মেরামতের জন্য যোগাযোগ করুন।

কুমার ব্রাদার্স এণ্ড কোং

২, চার্চ লেন, কলিকাতা—৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২৮-৮৫৫৫

With the compliments of :

B. E. PUMPS PRIVATE LIMITED

4, B. B. D. Bag, East

Calcutta-700 001

Gram :	Telex :	Phones :
BHOWMKAL	021-2426	28-7746, 7747, 7837, 8714

With best comliments from :

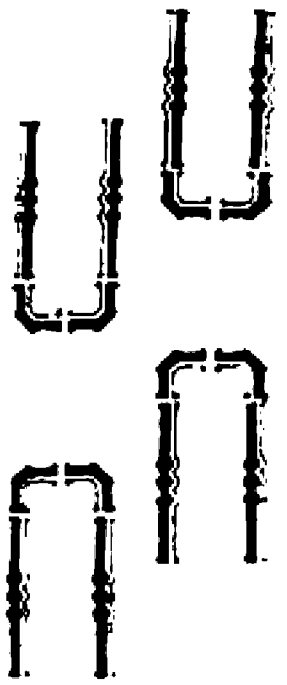

S. K. HAZRA & CO. PVT. LTD.

Manufacturers of :

"S. K. H." PUMPS & MOTORS

167, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001

With best compliments from :

PRATIMA SAREE SELECTION

Shop. No. NI-005, 1st Floor,

(AC Showroom)

NEW MARKET (New Building)

With best compliments of :

MODERN SANITARY CORPORATION

'*SAROBAR*', Flat No. 5 N. W.
102, SOUTHERN AVENUE,
CALCUTTA-700 029

With best compliments from :

Phones : { 26-3020
26-0915

THE CITY EXCHANGE HOUSE

6, BRABOURNE ROAD,

CALCUTTA.700 001

With best compliments from :

M/S. BARUAH BROTHERS

P. N. Road, Santipara

Dibrugarh, Assam

Distributor for :

NESTLE INDIA LTD.

SELVEL

FOR HOARDING SITES

'SELVEL HOUSE'
10/1B, DIAMOND HARBOUR ROAD
CALCUTTA-700 027

Phones : 79-7075, 79-6795, 79-9734
79-5342, 79-5365, 79-9492

710, MEGHDOOT
94, NEHRU PLACE
NEW DELHI-110 019

Phone : 643-1853 & 643-1369

B R A N C H E S

Jalandhar City (Ph 72161) ; Jammu ; Jaipur (Ph. 74137) ; Amritsar ; Ludhiana ; Chandigarh ; Lucknow (Ph. 381986) : Kanpur (Ph. 296303) ; Varanasi (Ph. 56856) ; Allahabad (Ph. 56160); Patna (Ph. 221188) ; Gorakhpur (Ph. 336561) ; Jamshedpur (Ph. 20085) ; Ranchi (Ph. 23112 & 27348) ; Dhanbad (Ph. 2160) ; Durgapur (Ph. 2777) Cuttack (Ph. 20381) ; Rourkela (Ph. 3652) ; Bhubaneswar (Ph. 54147) ; Raipur ; Guwahati (Ph 32275) ; Silchar (Ph. 21831) ; Dibrugarh (Ph. 22589) ; Siliguri (Ph. 21524) : Malda.

তাঁত, সিল্ক, বেনারসী, সুতি এবং
ফ্যান্সি শাড়ির মনকাড়া সংগ্রহ

১০% ছাড়

চণ্ডিকা

এসি শো-রুম

এন আই-০৭৪, নিউমার্কেট (দ্বিতল)
চলমান সিঁড়ির বাঁদিকে।

With best compliments from :

M/S. KASHYAP ASSOCIATES

Distributors : **M/s. NESTLE INDIA LTD.**

JANATA ROAD, DIGBOI–786171

A S S A M

With best compliments from :

N. K. GHOSH & CO.

F/12, DAKHINAPAN

2, GARIAHAT ROAD (SOUTH)

CALCUTTA-700 068

Space Donated by .

WELL WISHER

বাংলা গল্প সংকলন (প্রথম খণ্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত কুমার ঘোষ

এই সংকলনে কুড়িজন গল্পকারের একুশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। এর শুরু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' দিয়ে, শেষ ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' গল্পটিতে। মূল্য ৭০ টাকা।

বাংলা গল্প সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা : অশ্রুকুমার সিকদার ও কবিতা সিংহ

এই দ্বিতীয় খণ্ডটিতে সংকলিত হয়েছে চব্বিশজন গল্পকারের একটি করে গল্প। এর শুরু জগদীশচন্দ্র গুপ্তের 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন' দিয়ে, শেষ অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নীলকমল' গল্পটিতে। মূল্য ৭৫ টাকা।

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী-১১০০০১

জীবনতারা ভবন, ২৩এ ৪৪ এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৩

With best compliments of :

Team Consultants (P) Ltd.

Estd—1973

CONSULTING ENGINEERS

Implement Turnkey Projects

Prepare Project Reports, Large Medium & Small Industries.

Electrification & Illumination of Buildings

Regd. Office :

80A, BELTALLA ROAD, CALCUTTA-26

Tele : 75-9630

Branch Office :

46C, JAWHARLAL NEHRU ROAD,

EVERST HOUSE

Tele : 22-4865

With best compliments of :

Phone : 48-4004

KAMAL OPTICAL

General ophthalmic services & sight testing by qualified & experienced Eye Specialists.

114A, ASUTOSH MUKHERJEE ROAD

CALCUTTA-700 025

With best compliments from :

DOLPHIN ENGG. CO.

আভা পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সংখ্যা, গ্রন্থ-পঞ্জীসহ

ছাত্র-ছাত্রীদের ও বাংলা ভাষার গবেষকদের সহায়ক।

	মূল্য টাকা		মূল্য টাকা
শরৎ শত-বার্ষিকী সংখ্যা (দ্বিতীয় পর্ব) ভাষান্তরে শরৎ সাহিত্য সহ	৯·০০	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা	৪·৫০
		প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা	১২·০০
নজরুল স্মরণ সংখ্যা	৩·০০	হীরেন বসু সংখ্যা	৭·৫০
ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সংখ্যা	২·০০	আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা	১৫·০০
আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা	৭·৫০	শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সংখ্যা (নিঃশেষিত)	৭·৫০
ভাষাবিদ হরিনাথ দে জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৪·৫০	"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" সংখ্যা	১২·০০
তরু দত্ত স্মরণ সংখ্যা	৪·৫০	অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) সংখ্যা	১২·০০
কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৬·০০	শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা	৬·০০
বনফুল শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা	৬·০০	শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংখ্যা	৯·০০

"দাদামশাই" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১২·০০ টাকা

"দাদামশাই" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা সম্পর্কে "আনন্দ বাজার পত্রিকার অভিমত :—

"একদা সরস গল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এমত অনেকের অনুরাগ অর্জন করেছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার এই প্রবাসী অজাত শত্রু দাদামশাইকে নিয়ে রেখা চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'আভা' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাঁর সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও আছে তৎরচিত দুটি গল্প, কয়েকটি বিখ্যাত রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা অপ্রকাশিত কবিতা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে কৌতূহলপ্রদ নিশ্চয় কেদারনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একাদিক পত্র, শরৎচন্দ্র, রাজশেখর বসু, অবনীন্দ্র নাথ, জলধর সেন, নজরুল প্রমুখের পত্রাবলী। আরও প্রশংসনীয় সংযোজন কেদারনাথের চিঠিগুলি। বনফুলকে একটি চিঠিতে কেদারনাথ লিখছেন, 'ছোট গল্পই সাহিত্য জগতে তোমায় বড় করবে।' বৃদ্ধের এমন সরস আশীর্বাণী সফল হয়েছে মনে হয়।"

সূচীপত্র

শারদীয়া ১৩৯৯ (ইং ১৯৯২)

বন্দে শ্রীদুর্গাম্ :—দিবেন্দু হালদার

প্রবন্ধ

কেন অকাল বোধন—ডাঃ বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে—হরপ্রসাদ মিত্র ১১৯

অবাঞ্ছিতা—রেখা চট্টোপাধ্যায় ১২১

পশ্চিমবঙ্গে মাৎস্যন্যায়—জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪

শোভনা সেন : মমতাময়ী ছবি—সুশান্ত কুমার পাল ১৩২

সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব : ফ্রাঞ্জ কাফ্‌কা—রণজিৎ কুমার সেন ১৫২

'কলকাতা'—সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য—রমেন্দ্র নাথ মল্লিক ১৬৯

চিঠিপত্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র—সংগ্রাহক : আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩৭

কাহিনী

হামাম মঞ্জিলের হিন্দু মন্দির—এ. কে. সেন ২০৪

উপন্যাস

গায়ত্রী দেবীর তপস্যা—জগন্ময় মিশ্র ১৭১

রম্য রচনা

শেক্‌স্‌পীয়ারের সঙ্গে কিছুক্ষণ—দিগম্বর দাশগুপ্ত ১৪৩

গল্প

মধুরেণ—শৈলজা চৌধুরী ১৩৩

চোর—বেদুইন ১৩৭

সমবেদনা—কুমারেশ ঘোষ ১৪১

পূরবী—হাজারীলাল বিশ্বাস ১৪৬

শেকল ছেঁড়া পাখী—কালী শঙ্কর মল্লিক ১৫৭

বোবা কান্না—তপতী চক্রবর্তী ২২৪

'পাগলেরও আপনা বুঝ'—মণিকা ঘোষাল ২২৭

P 29180

অতঃকিম—সতীদেবী মুখোপাধ্যায় ২৩০
প্রত্যাবর্তন—জিতেন কুমার দাস ২৪১
সুরের সংসার বনাম সংসার—সুনীল কুমার মণ্ডল ২৪৭
সেই পয়লা জানুয়ারী—আদিত্য নাথ মুখোপাধ্যায় ২৫২

কবিতা

বসন্তাগমণে—মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় ১১০
পেঁচকের চোখ—সুধাংশু ঘোষ ১১৮
সনেট—শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১১৯
শতরূপে—শোভনা সেন ১৩০
আকাশে উঠব—চিত্রিতা দেবী ১৩০
প্রার্থনা—নচিকেতা ভরদ্বাজ ১৩১
অন্বেষণ—লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক ১৩৫
প্রভুকে দেখলাম—সুনীল কুমার দে ১৩৫
সত্যজিৎ স্মরণে—গৌর গোপাল পাল ১৩৬
ঈশ্বরের সিঁড়ি—সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৩৬
ভালবাসার রূপ—জগৎ দেবনাথ ১৫৬
আগমনী—মধুসূদন গোস্বামী ১৬৩
এস, দূষণ মুক্ত রাখি মাকে—মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭০
ছন্নছাড়া—কেশব ভট্টাচার্য্য ১০৩
'যৌবনের স্বপ্ন'—চন্দ্রা বসু ১১৯
বিদায় নিতে চাই—রমা গুপ্ত ১৩৬
শেষবিন্দু—সরোজ কুমার পাণ্ডে ২৪৬
জাগ্রত ভারত আত্মা—নীরেন্দু হাজরা ২৫১
থাকা না-থাকা—কিরণ শঙ্কর মৈত্র ২৫৯
একটি কবিতা যেন—নিখিল ঘোষ ২৫৯

সম্পাদিকা : রেখা চট্টোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক : ডাঃ গোবিন্দ দাস চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রণ : কৃষ্ণা আর্ট প্রেস প্রচার সম্পাদক : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাপ্তিস্থান : আভা কার্যালয় —৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৭৫-৮১৭২
মূল্য—১০ টাকা

—ঃ বন্দে শ্রীদুর্গাম্ঃ —

দশভুজ-ধারিণীম্ দুর্গতিনাশিনীম্ ।
মৃগেন্দ্রাসীনাম মহাঘোরাবর্ণাম্ ॥
ত্রিজগতোহরাতিম অশুভ-হন্ত্রীম ।
বন্দে শ্রীদুর্গাম্ শারদীয়া-শারদাম্ ॥[১]

মহিষাসুর-মর্দিনীম্ মধু-কৈটভ-ঘাতিনীম্ ।
শুম্ভ-নিশুম্ভজয়িনীম মা-দুর্গা-জননীম্ ॥
মহাকালীরূপাম্ করাল-বদনাম্ ।
বন্দে শ্রীদুর্গাম্ শারদীয়া-শারদাম্ ॥[২]

দন্তকালিকাম্ কৌশিকী মা-কালীম্ ।
দানব-দলনীম্ দশভুজা-দারুণাম্ ॥
কৌমারী-কায়াম্ কৈলাস-বাসিনীম্ ।
বন্দে শ্রীদুর্গাম্ শারদীয়া-শারদাম্ ॥

কালমঞ্জরী-দাক্ষায়নীম্ সৃষ্টিস্থিতি-লয়িণীম্ ।
সন্তাপহারিণীম্ সৌভাগ্য-দায়িনীম্ ॥
মহামায়া স্বরূপাম্ প্রসিদ্ধি গামিনীম্ ।
বন্দে শ্রীদুর্গাম্ শারদীয়া-শারদাম ।[৩]

বামে বাণীস্থিতাম্ দক্ষিণে লক্ষ্মী সংহিতাম্ ।
গজানন-সহিতাম্-কার্ত্তিক-উপেতাম্ ॥
ভুজঙ্গভূষিতাম্ বীরেন্দ্র-আরূঢ়াম্ ।
বন্দে শ্রীদুর্গাম্ শারদীয়-শারদাম্ ॥[৪]

ব্রহ্মাদিজাতাম্ তেজোদ্ভূতাম্ দুর্গাশক্তিম্ ।
কল্যাণদায়িণীম্ মহামেধা-ধারিণীম্ ॥
ভূতাধিবাসিনীম্ মাতৃরূপা প্রতিমাম্ ॥
বন্দে শ্রীদুর্গাম্ শারদীয়া-শারদাম্ ॥[৫]

দিব্যেন্দু হালদার

একবিংশতি বর্ষ

সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা

আভা

তমসো মা জ্যোতির্গময়

আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৯৯

September & October 1992

—ঃ কেন অকাল বোধন ঃ—

ডাঃ বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ কালে দুর্গা পূজোর প্রবর্ত্তন করেন শ্রীরামচন্দ্র। এই পূজোকে বলা হয় অকাল বোধন। কথিত রাবণ বধের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র যে সময় পূজো করেছিলেন সেটা শাস্ত্র বিহিত সময় নয়।

"রাবণ বধের জন্য বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ॥
এই দুই কর্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।"[১]

জীব জগতে দুটি কাল নির্ণীত। একটা—দিন একটা—রাত্তির। দেব দেবীদের বেলায় এর ব্যতিক্রম নেই। তবে বৈশিষ্ট আছে। জীব জগতের কাল পরিবর্ত্তন হয় রোজ। দেব দেবীদের বেলায় কাল পরিবর্ত্তন হয় ছ'মাস অন্তর। দেব দেবীদের দিন হচ্ছে মাঘ হতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত। এই সময়কে শাস্ত্রীয় মতে বলা হয় সূর্য্যের উত্তরায়ণ কাল। আর শ্রাবণ হতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত [illegible] এই সময়কে শাস্ত্রীয় মতে বলা হয় সূর্যের দক্ষিণায়ণ কাল। স্বভাবতই দেব দেবীরা জীবেদের মতই দিনে জেগে থাকেন আর রাত্তিরে ঘুমিয়ে থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণ বধের জন্য আশ্বিন মাসে শরৎ কালে দেবী দুর্গার পূজো করতে হয়েছিল। এই সময় দেবীর ঘুমের সময়। তিনি ঘুমিয়েছিলেন। তাই তাঁকে তার ঘুম ভাঙ্গাতে হয়েছিল। অসময়ে দেবীকে ঘুম থেকে তুলে তাঁর পূজো করেছিলেন বলেই এই পূজোকে বলা হয় অকাল বোধন। যথারীতি শাস্ত্র বিহিত মতে দুর্গাপূজো হয় চৈত্র মাসে বসন্ত কালে। ঐথন আমরা বলি "বাসন্তী পূজো" কিন্তু কেন শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে মা দুর্গাকে ঘুম থেকে তুলে পূজো করলেন? পূর্বাপর্ব ঘটনা থেকে জানা যায় রাবণ দেবী দুর্গার ভক্ত ছিলেন। দেখা গেল রাম-রাবণের

যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র বার বার রাবণের প্রাণ হরণ করে ধরাশায়ী করার পরও দেবীর কৃপায় জ্ঞান ফেরা মাত্রই তিনি দেবী দুর্গার স্তব পড়ছেন, আর দেবী স্বয়ং তাঁকে তাঁর কোলে আশ্রয় দিচ্ছেন।

শ্রীরামচন্দ্র বুঝেছিলেন দেবী দুর্গার আশ্রিত রাবণকে সহজে বধ করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলে, ব্রহ্মা তাঁকে পরামর্শ দিলেন অতীতে তুমি যেমন শরৎ কালে পূজা করে অসুর নিধন করেছিলে, এখন রাবণকে বধ করতে হলে শ্রীরামচন্দ্রকে এই সময় দেবী দুর্গাকে ঘুম থেকে তুলে তাঁর পূজো করতে হবে। উপরোক্ত শ্লোক থেকে এই কথায় বোঝা যায় যে রাবণ বধের জন্যেই ব্রহ্মা অকালে শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়ে দুর্গাপুজো করিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শ্রীরামচন্দ্রের শরৎ কালে পূজো করার কথা বাল্মীকি বা তুলসীদাস রামায়ণের কোথাও লেখা নেই। একমাত্র কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণে উল্লেখ দেখা যায়। এমন কি পরবর্ত্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে কৃত্তিবাস রামায়ণ বেরিয়েছিল তাতেও অকাল বোধনের কথা নেই।

সেজন্যে স্বভাবতই মনে হয় কৃত্তিবাস কোথা হতে এই প্রসঙ্গ পেলেন? শ্রীরামচন্দ্র কি আদৌ দুর্গাপূজো করেছিলেন? অনেকে মনে করেন কৃত্তিবাস পুরাণ, উপপুরাণ, নির্ভর করে এবং সেকালের প্রচলিত প্রাচীন উপকথার ভিত্তিতে এই কাহিনীর অবতারণা করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন বাল্মিকী ও তুলসীদাস রামায়ণে ঘটনাটি না থাকলেও কালিকা পুরাণে ঘটনাটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ্ শ্রীজীব ন্যায় রত্ন বলেছেন, "তাঁর পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এ বিষয় যথেষ্ট গবেষণা করে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে (৮৩/৩৪)"—

"স সম্প্রেক্ষ্য ধনুষ্পাণি মায়াযোগমরিন্দমঃ।
তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ॥"

শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—এখানে মায়া শব্দে দুর্গা আর ব্রহ্মবিধান কথার উল্লেখ থাকায় কালিকা পুরাণের বচনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণ অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। উক্ত শ্লোকটির যথাযথ বিশ্লেষণ না হওয়ার জন্যেই লোকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।[২]

শাস্ত্রকারেরা নানা যুক্তির অবতারণা করলেও বিষয়টি আজও বিতর্কিতই রয়ে গেছে।

১। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' লঙ্কাকাণ্ড পৃঃ ৪২৪।

২। নব ভারত প্রকাশিত কালিকা পুরাণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

॥ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের আগেই রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) এবং শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা চর্চার পত্তন ঘটে গেছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় এবং ঐ সময়ে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্গত সেন্ট ম্যাথিউ-র গসপেল ছাপা হয়। এই বইটির নাম ছিল 'মঙ্গল সমাচার মাত্তিউর রচিত'। তার কয়েক বছর পরেই ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই মিশন থেকেই বেরোয় পাঁচালীর রীতিতে লেখা খ্রীষ্টজীবনী—যার নাম দেওয়া হয় 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং'। উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) আগেই টমাস বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন এবং কেরী তাঁর সঙ্গে মালদহে ছিলেন শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই। ১৮০১-এ টমাসের মৃত্যু হয়। ১৭৯৯ সালে এদেশে আসেন জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩)। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে পূর্বোক্ত ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস স্থাপিত হয়।

রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, তারিণীচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি লেখকদের বাংলা গদ্য রচনা দেখা দেয় সেই পর্বেই।

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের সূচনা ও পরিণতির ধারায় রামমোহনের আমল থেকে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বের মধ্যবর্তী পর্বে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর নানা চর্চা অবশ্যই স্মরণীয়। রামমোহন ইংরেজী, ফারসী, সম্ভবত আরবী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখে গেছেন যে, তিনি "জলের মত বাংলা লিখিতেন"। রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও সে কথা মেনে নিতে বাধ্য হন—একথা অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে (সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৬) উল্লেখ করেন। রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮১৫), বিদ্যাসাগরের জন্ম হয় তারও পাঁচ বছর পরে। রামমোহনের ঐ বইগুলি ছিল অনুবাদধর্মী।

রামমোহনের বেদান্তব্যাখ্যা ও বেদান্তপ্রচারের নিন্দার কাজে খ্রীষ্টান পাদরি সমাজ মৃত্যুঞ্জয়কে নিযুক্ত করেন। রামমোহনের বেদান্তব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ১৮১৭ সালে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা (প্রথম খণ্ড)' প্রকাশ করেন, কিন্তু 'দ্বিতীয় খণ্ড আর বেরোয়নি, কারণ পরে যা 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে প্রকাশিত হয়, রামমোহনের সেই ৬৪ পৃষ্ঠার উত্তরটি বেরিয়ে যায় সেই ১৮১৭ সালেই—এবং সুকুমার সেন মহাশয়ের কথায়—"বলা বাহুল্য ভট্টাচার্য আর লেখনী ছুটান নাই। প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় নাই।"

এইভাবে রামমোহনের বিচার-বিতর্কধর্মী বাংলা গদ্যের প্রবাহ চলতে থাকে।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা। অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখে গেছেন যে, সাধারণ বাঙালী পাঠক সেই প্রথম খবর কাগজের রস পান। শুধু তাই নয়, তিনি লেখেন—"সমাচার দর্পণের সাফল্য বিবিধ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছিল। এই সাময়িকপত্রের মধ্যে অনুশীলিত হইয়াই বাঙ্গালা গদ্যের জড়তা-মুক্তি ঘটিয়াছিল।"

এর পরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (ভাদ্র, ১২৫০ বঙ্গাব্দ) অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬) সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ন্তা ও আদর্শকার ছিলেন বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও ভাষাচর্চার মূল প্রেরণা ছিল শিক্ষাবিস্তার ও পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে আশ্রিত। অধ্যাপক সেনের কথায়—"বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট-উইলিয়ম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযথ গ্রহণবর্জন করিয়া সাহিত্যযোগ্য সুডৌল যে গদ্যরীতি চালাইয়া দিলেন তাহা সাহিত্যের ও সংসার কার্যের সবরকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইল।"

॥ বসন্তাগমনে ॥

অধ্যাপক মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী)

এল এল এলরে বসন্তেরি ঢেউ,
গাহিয়া নাচিয়া ঘরে রহিবে না কেউ।
পুলকে উঠিছে মন গুঞ্জরিয়া
মুকুলে উড়িয়া ফেরে মৌমাছিরা।
দখিণা পবনে চিত্ত হয় যে উদাস,
কিসের বিহনে সে যে হারায় উচ্ছ্বাস।
চতুর্দিক পুষ্পগন্ধে হয়েছে মদির,
অজানা ভাবের ঘোরে মন যে অধীর।
ফাগুনের করস্পর্শে নব কিশলয়
শোভিত সকল বৃক্ষ সম্মুখে উদয়।
এমনী প্রভাতে আজ পুষ্পচয়ন
করিতেছে অবিরত দিকবালাগণ।
মাঝে মাঝে শুনিতেছে বিহগ কাকলী,
কোকিলের কুহুতানে হয় যে আকুলি।

অবাঞ্ছিতা

রেখা চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার হয়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান বহুদিন ধরেই বহু প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আচারে আচরণে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। আজ চাঁদকে অধিকার করে শুক্রগ্রহের দিকে মানুষ এগিয়ে চলেছে। মানে মর্যাদায় ভারত আজ জগৎ সভায় নিজের আসন ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে—এহেন সময় জাগতিক নিয়ম অনুসারে নারী ও পুরুষের সহাবস্থান চলেছে। নারী আজ স্বকীয় ক্ষমতায় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতার ফলে বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত। প্লেন চালান থেকে আরম্ভ করে দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। মন্ত্রী বা রাজ্যসভা এবং লোকসভার আসন তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। এই সমস্ত প্রগতির কথা সত্য, তবে সমস্ত নারীজাতীর তুলনায় তার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। সমস্ত দেশের কথা চিন্তা করলে এই মুষ্টিমেয় নারী প্রগতি আমাদের চোখে পড়তে বাধ্য। গ্রামে গঞ্জে শহরতলিতে এমনকি বড় বড় শহরের ক্ষেত্রেও নারী প্রগতির সংখ্যা সীমিত।

প্রাচীনকালেও নারী প্রগতির কথা শোনা যায় সেখানেও সংখ্যা ভিত্তিক আলোচনা করলে বিশেষ আশার আলোক দেখা যায় না।

বর্তমান সমাজে চিরাচরিত প্রথায় নারী বঞ্চিত এবং অবহেলিত। তাঁর জন্ম মুহূর্তে বাড়ীতে শাঁক বাজে না—এবং বাড়ীর অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষই কন্যা জন্মগ্রহণের সংবাদে খুসী হতে পারে না। রাজস্থানে পিঁড়ি চাপা দিয়ে শিশুকন্যাকে হত্যার কথা শোনা যায় আর অত্যাধুনিক শিক্ষিত সমাজে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ফলে জন্মের আগে মাতৃগর্ভে শিশুর অস্তিত্ব জানার পরে তা কন্যা বলে জানা গেলে ভ্রূণ হত্যা করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ শিশুকন্যা আর কোনদিন পৃথিবীর আলো দেখার কোনো সুযোগ পায় না। এ সবের পরেও যে শিশু কন্যারা পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পায় তারাও কিন্তু জন্ম মুহূর্ত থেকেই নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে। বাড়ীতে যদি দুটি শিশু থাকে তবে মেয়েটিকে সব রকম পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে ছেলেটির প্রতিই বাড়ীর সকলের আকর্ষণ বেশী দেখা যায়। যে কন্যাশিশু উত্তর জীবনে অন্য শিশুর জন্মদাত্রী হবে তাকেই শৈশবে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যকর আহার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাড়ীতে ছেলে এবং মেয়ে দুটি শিশুই একই সঙ্গে বড় হতে থাকলে কন্যাকে মা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন "তুমি মেয়ে" এই কথা বলে। খেলাধূলা ঘোরাফেরা সব কাজেই মেয়ে বলে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কি স্কুল থেকে দুটি শিশুই যখন বাড়ী ফিরে আসে তখন মেয়েকে বলা হয় জামা জুতো বই ইত্যাদি ঠিক

জায়গায় গুছিয়ে রাখতে আর ছেলে বাড়ী ফিরে যে কোন স্থানে সেগুলো ছুড়ে ফেললে মেয়েকে দিয়ে তা আবার যথাস্থানে রাখান হয়। জলখাবার খাওয়ার পরে ছেলের রেকাবি মেয়েকেই সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্যকরা হয়। গ্রামে আবার ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থাকলেও মেয়েদের বাড়ীতে রেখে ঘরের কাজে সাহায্য করতে হয়—এমনকি মাঠ থেকে কাঠের বোঝা বা ঘুঁটের ঝুড়ি তাদেরই বহন করতে হয়। বাড়ীর ছোট শিশুদের পাহারা দেওয়া বা দেখাশোনার ভার নিতে বাধ্য হয় বাড়ীর শিশুকন্যারা।

এইভাবে সমস্ত প্রকারে বঞ্চিত হয়ে শিশুকন্যা ধীরে ধীরে যৌবনের পথে পৌঁছলে তাকে বিবাহ দেবার চিন্তায় মা-বাপের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়। বাজারের আলু পটলের মত বারবার তাকে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির করে নানা রকম পরীক্ষা দিতে হয়। দীর্ঘ দিন ধরে পরীক্ষা দেবার পরে শেষে যদি পাত্রপক্ষের মনোনয়ণ পায় তবে এবার দেনাপাওনার প্রশ্ন—বহু দর কসাকসির পরে পিতার জমিবাড়ী বাঁধা রেখে পাত্রপক্ষের দাবী মেটাবার ব্যবস্থা হলে তবেই বিয়ের পিঁড়িতে মেয়েটি বসতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পিতা নিতান্তভাবে অপারগ হলে বর্তমানে যে দাবী মেটান গেলনা ভবিষ্যতে তা পুরণ করবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে থাকেন। পাত্রপক্ষ কন্যাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছনা সুরু করে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই পাওনা আদায়ের জন্যই কন্যাকে উত্যক্ত করতে থাকে। সেই সঙ্গে চলে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। পরিণামে মেয়েটি নিজেই আত্মহত্যা করে এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চায়—নতুবা আগুনে পুড়িয়ে, বিষ খাইয়ে অথবা মারধর করে তাকে শেষ করে ফেলা হয়। এবং যেহেতু সমাজে পুরুষের কোন অপরাধই গ্রাহ্য হয় না—সেই ছেলেটি আবার যথা নিয়মে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসে। কিন্তু জন্ম থেকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত একটি মেয়ের জীবন শেষ হয়ে যায়।

বিবাহের সময় সামর্থের অধিক ব্যয় করতে হয় বলেই কিন্তু মেয়েদের জন্ম লগ্ন থেকে তারা পিতৃগৃহে লাঞ্ছনা পেয়ে থাকে। আবার আরও মজার ব্যাপার হল এই যে মেয়েদের সমস্ত রকম দুঃখ দুর্দশার মূলে কিন্তু মা বা তৎস্থানীয় কোন একজন মেয়েই থাকে। পুত্রের বিবাহের যৌতুকের তালিকা পুত্রের মাতা বা তৎস্থানীয় কোন মহিলাই করে থাকেন অর্থাৎ মেয়েদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের মূলে রয়েছে মেয়েরাই। মা'ই প্রথম জীবনে কন্যাকে আহারে আচরণে বঞ্চিত করে থাকেন—আর তাঁরই সচেষ্ট প্রয়াসে অথবা সমর্থনে বধূর জীবনে আসে অনাবশ্যক অনিশ্চয়তা। তাই বলা যেতে পারে সর্বক্ষেত্রে মেয়েরাই মেয়েদের পরম শত্রু।

আজ মেয়েদের রক্ষার জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন হয়েছে—পণ নিরোধ আইনের কোনো সুফল কি পাওয়া গেছে? তার প্রধান কারণ মানুষের মনে যে লোভ বাসা বেঁধে আছে তাকে বন্ধ করা আইনের দ্বারা সম্ভব নয়। পণ নেওয়া অপরাধ হলেও যৌতুকে বাধা নেই—অতএব অনেকক্ষেত্রে পণের দাবীকে যৌতুক নামে চালান হচ্চে—আর কন্যার ওপর বা বধূর ওপর অত্যাচার

আজও সমাজে বর্তমান রয়েছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে তার কটা ঘটনা প্রকাশ পায়? দেশ আজ অর্থমূল্যে বিচার্য হয়েছে তাই মানুষের মনে পুলিশ প্রশাসন বা আইন আদালতের প্রতি আস্থা হারিয়ে গেছে। যে কোন ধরণের অপরাধীই আজ অর্থের বিনিময়ে ছাড়া পেয়ে যেতে পারে এই বিশ্বাস থাকাতে আইনের মূল্য গেছে কমে—তার প্রভাবে অপরাধীদের মনোবল গেছে বেড়ে।

এ ছাড়া অর্থের প্রয়োজনে এবং আধুনিক সমাজের প্রচলনে আজ মেয়েরা পথে ঘাটে সর্বক্ষণ চলাফেরা করছে বা অনেক সময় তা করতে বাধ্য হচ্চে। আগে যে কোনো পুরুষ নারীত্বের সম্মান করত বা আপদে বিপদে তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসত। আজ পুরুষের মনোভাব গেছে পাল্টে—ফলে পথে নারী নিগ্রহের ঘটনা আজ সর্বত্র দেখা যাচ্চে। তাদের রক্ষার জন্য আইন আদালত কিছুই কার্যকরী হচ্চে না—প্রশাসন পুলিশ সবাই আজ নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। প্রকাশ্য রাজপথ থেকে নারীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। আর ধর্ষণের ঘটনাও অবাধে চলছে তা গৃহেই হোক আর পথের ধারের ঝুপড়িতেই হোক। নারী আজ সহজলভ্য হয়েও নিজের আত্মসম্মান রক্ষায় অপারগ। কোনো আইন করে একে বন্ধ করা যাবে না। কবির কথায়—'নারীকে নিজের ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিলে অধিকার' এই বাক্যকে মনে রেখে নারীকে নিজেকে নিজেই রক্ষা করার বীজমন্ত্র গ্রহণ করে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ জিনিষ কেউ তৈরী করে দেবে না—পরন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের মনোবলের জোরে নারীকে নিজেকে রক্ষা করার মন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ তাকে কিছু করে দেবে না।

যেদিন নারী আত্মমর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যখন তাকে আর অপরের কৃপা ভিক্ষা করার প্রয়োজন হবে না, তখনই নারীর নারীত্ব প্রস্ফুটিত হবে। সেদিন নারী অবাঞ্ছিতা থাকবে না।

মিশন হোমিও ক্লিনিক

৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

ডাঃ জি. ডি, চ্যাটার্জ্জী

ভারতীয় বনৌষধী হইতে বিভিন্ন

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আবিষ্কারক।

সাক্ষাতের সময় :

সকাল ৯টা—১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা—৮টা।

ফোন : ৭৫-৮১৭২

পশ্চিমবঙ্গে মাৎস্যন্যায়

(প্রবন্ধ)

জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই জানিবার স্পৃহাও নাই ? কথাটি জনৈক এ যুগের রাজনীতিকের। প্রতিবাদ সেদিন করিনি। এখন না করে পারছি না। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য সম্রাট বলেছিলেন 'আমরা সকল দেশের ইতিহাস পড়ি, নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা।' তাঁর সমকালীন অপর এক ব্যক্তি পুরুলিয়া আনন্দমঠের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দুসমাজের (বাঙ্গালী) ইতিহাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'আমরা সকলেই বুঝিয়াছি যে বাঙ্গালী হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ।' মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। কারণ যে কতিপয় দশ পনেরো শতাংশ চিন্তাবিদ মানবতাবাদী আজো এদেশে বর্তমান তাঁরাই সারাংশ উপলব্ধি করতে পারেন।

আমাদের বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে সুদীর্ঘকাল যাবৎ পল্লীসংস্কার ও সমাজসংস্কার ছিল এক সামাজিক কর্তব্য। আর ছিল পাড়ায় পাড়ায় শরীরচর্চা। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী একথা বলতে গেয়ে বলেছিলেন, 'সেকালে বাঙ্গালী ছাত্রদের এইসব কর্তব্য ও দায় পালন করতে আত্মনিগ্রহের সংকল্পও বড় কম ছিলনা।' অর্থাৎ সাধুভাষায় যাকে বলি আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির পথ। এই ভাবাদর্শেই উনবিংশ ও বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রী সমাজ গড়ে উঠত ; যার পরিণামে আমাদের দেশ অসংখ্য প্রকৃত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নরনারীর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে মর্মপীড়া অনুভব করে বাঙ্গালী অন্য এক বিপরীত ভঙ্গুর চিত্র প্রত্যক্ষ করছে। বৃথা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করে কয়েকটি মাত্র সংবাদ তুলে ধরছি। 'বাইকে চড়ে প্রতিনিয়ত পথে পথে ছাত্রীদের নিগ্রহ ; মারুতি গাড়ি নিয়ে বলপূর্বক তরুণীকে উঠিয়ে পলায়ন ; প্রায় প্রতিনিয়ত নারী ও নাবালিকা ধর্ষণ ; এমনকি আরক্ষী ও শিক্ষকেরাও কেউ পিছিয়ে নেই ; বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর গলায় ক্ষুর ; আর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেকের দুর্নীতি' ! কত লিখব !

মনে পড়ে অধ্যাপক জে বি এস হ্যালডেনের ঘরানার এক লেখক স্মিথ তাঁর 'থিয়োরী অব ইভলিউশনের' এক জায়গায় লিখেছিলেন, "the habits of population may change far more rapidly than its Genetic make-up…" এ বিদ্যায় জ্ঞান না থাকলেও বলতে পারি, বাঙ্গালীর ক্ষীণ দুর্বল প্রাকৃতিক গঠনে এই স্বভাবের অতিদ্রুত পরিবর্তনের ব্যাপারটি কিন্তু লক্ষ্যণীয় ! কারণ বোধ হয়, আজ স্বাজাত্যবোধ ও অধিকার রক্ষার চেয়ে অধিকার ভঙ্গের দায়বদ্ধতাই আমাদের সবদিক থেকে পেয়ে বসেছে ! অথচ বাঙ্গালী এরূপ স্বভাবের ছিলনা কোনদিনই। মানবিক মৌলিক

বোধের দায়দায়িত্বের প্রতি বাঙ্গালী ছিল নিষ্ঠাবান। সে কারণেই বৃটীশ শাসক বাঙ্গালীকে প্রকৃত নিষ্ঠাবান কর্মী বলে সংগ্রহ করে নিয়েছিল। তাঁরাই নিজের অধিকার রক্ষার নৈতিক দায়দায়িত্ব আজ বেমালুম ভুলে গেছে সবাই। পশ্চাদপটে এর জন্যে গোটা ভারতের অমানবিক একদল অর্থলোলুপ ব্যবসায়ি, রাজনীতিবিদ ও আমলারা কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। কারণ গত চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টা তাদের প্রায় সফল ; বাঙ্গালীকে পুরোপুরি এক ক্লীবত্বে পরিণত করতে পেরেছে, বাঙ্গালীর পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিতে পারছে। এজন্যে তিনযুগ ধরে অর্থনৈতিক কারচুপিতে. রাজনৈতিক বেণিয়া-বৃত্তিতে এবং সামাজিক দেউলিয়া বৃত্তিতে সংগোপন প্রচেষ্টা তাদের সাফল্য লাভ করছে। পুনরায় বাঙ্গালী পুরোপুরি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে !

চিরকাল আপনার সার্বিক অস্তিত্ব বিপন্ন করতে বাঙ্গালী পেছপা ছিলনা স্বভাবগত কারণে। সমগ্র উত্তর ভারতে বিগত পাঁচহাজার বছর ধরে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে গেছে বিজেতা-বিজিতের সম্পর্কে, বাঙ্গলায় সেটি প্রাকৃতিক ভাবে ঘটেছে খুব সামান্যই ; যেটুকু ঘটেছিল তা সামাজিক কারণে, দুর্বলতার জন্যে। বরাবরই এক জড়তার কাছে আত্মসমর্পণের চিত্র বর্তমান। তাই আজ অধিকার ভঙ্গের রূপ দিয়েছে। কিঞ্চিৎ যেটুকু ব্যতিক্রম উনবিংশ শতকে ও বিংশশতকের প্রথমাংশে দেখা গেছে, তাঁরা বিশ্বের মানবজাতির পনেরো শতাংশ বিশুদ্ধ রক্তের ধারাবাহী মাত্র ! সাধারণ বাঙ্গালী যে তাঁদের কোন কথা উপদেশ শোনেনি, কেবল বাহবামাত্র দিয়ে গেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত আজ দেখছি স্বচক্ষে !

স্বয়ং শ্রীচৈতন্য একদা নীলাচলে শ্রীবাসকে বিদায় দিতে যেয়ে বলেছিলেন, 'গৌড়ের ভার তোমার ওপর ; কারণ বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি' ইত্যাদি। নেতাজী যখন পরাধীন দেশের দ্বারপ্রান্তে যুদ্ধরত, আমরাই প্রকৃত শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিৎকার করেছি বাঙ্গলায়, '(নেতাজী) কুইসলিং !' বিদ্যাসাগরকে, বিবেকানন্দকে, অরবিন্দকে, রবীন্দ্রনাথকে, সুভাষচন্দ্রকে আমরা ফ্রেমেই বাঁধিয়ে রেখেছি, তাঁদের নিয়ে বাণিজ্য পর্যন্ত করেছি ; তবু শ্রদ্ধাভক্তিভরে তাঁদের পথে প্রাণপাত করিনি। অথচ দক্ষিণ ভারতে এখনই সুব্রাহ্মণ্য ভারতীকে চেনে রবীন্দ্রনাথ নেতাজীকে নয়, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে দার্জিলিংয়ে ভানুভক্তকে জানে রবীন্দ্রনাথকে নয় ; উত্তর ভারত তুলসীদাসকে পূজো করে রবীন্দ্রনাথ-নেতাজী-বিবেকানন্দকে নয়। মাউন্টব্যাটেন-কার্জন উত্তর ভারতের সুহৃদ, কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র শত্রু ! এবং সেই উত্তর ভারতেরই প্রভাবে বাঙ্গালী সর্ব দায়দায়িত্ব খুইয়ে এখন দেউলিয়া ! কেন এ কলকাতায় আজ বাঙ্গালী পরদেশী ভিখারী ? দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর হিন্দী সমাচার প্রচার করা হয়না, হিন্দী অনুষ্ঠান বর্জিত টি ভি, বেতার সর্বত্র। আর আমাদের কলকাতায় বাংলা গীতাঞ্জলীর জন্য পনেরো মিনিটের বেশি সময় নেই ! অধিকাংশ অস্পৃশ্য অস্বাস্থ্যকর হিন্দীচিত্রের অবারিত দ্বার কলকাতায় !

জীবদ্দশায় কিন্তু স্বয়ং চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত সবাইকেই আমরা কঠোর নিন্দা সমালোচনা করেছি এবং মৃত্যুর পরে যখন বহির্বিশ্ব বাহবা দিয়েছে, আমরা বৈঠকখানায় তাঁদের ফটো ঝুলিয়ে কর্তব্য পালন করেছি।

শতবর্ষ পূর্বে বাঙ্গালায় যে চিত্র ছিল বাঙ্গালীর, বর্তমানে ঠিক তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র কেন কেউ ভাবিনা পর্যন্ত। বরঞ্চ ধ্বংসোন্মুখ রাজনীতিবিদদের প্ররোচনায় ক্রমশই বাঙ্গালী সমাজ রসাতলে যাচ্ছে; ইন্ধন যোগাচ্ছে দুর্নীতিপরায়ণ অবাঙ্গালী সমাজ। প্রতিবাদহীন হয়ে মার খেয়ে মরছে বাঙ্গালী। তাই '৪২ সালের অভ্যুত্থানের সুবর্ণ জয়ন্তী করতে দেখে ক্লীবত্বের পরাকাষ্ঠা বলেই মনে হচ্ছে। যারা এসব করছেন, তারা অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং উদাসীন! তাদেরই বা স্ব-পরিচয় কী?

স্বামী বিবেকানন্দ একদল ত্যাগীর আহ্বান জানিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও একদল মরণপণ ত্যাগীর রক্ত চেয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা এনে দেবেন বলে শপথ নিয়েছিলেন! আমরা বাঙ্গালীরা তাঁদের দু'জনকেই বিমুখ করেছিলাম। বহির্বিশ্ব তাঁদের মাথায় করে নিয়েছিল।

অতি সাম্প্রতিক সময়েও সত্যজিৎ রায়কে বহির্বিশ্ব স্বীকৃতি না জানালে আমরা ক্লীব হয়ে হাত গুটিয়েই থাকতাম। সুতরাং আমরা কী দায়ভঙ্গের জন্য দায়ি নই? নেহেরুর সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বিবেকানন্দের স্বপ্নের অনুকরণ; কিন্তু কোথাও সামান্যমাত্রও ঋণ স্বীকার ছিলনা! আমাদের স্বাধীনতাও নেতাজীর প্রতি বহুলাংশে ঋণী। তথাপি এমনকি বাঙ্গালীও সে ঋণ স্বীকারে পরাঙ্মুখ! অন্যে পরে কা কথা! দক্ষিণপন্থী রাজনীতির কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বোস পর্যন্ত সবাইকেই বরাবর দাবিয়ে রেখেছে। বিপ্লবীদের তো স্বীকৃতিই মেলেনি! আজকের বামপন্থীদের চিত্রও বাঙ্গালীর চরিত্রের পরিপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদেরই অনুবর্তী। বাঙ্গলাকে কে বাঁচাবে?

তর্কের খাতিরে অনেকে অনেক কথা বলবেন। প্রশ্ন করি একটাই, যে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতের মানচিত্রে গত শতাব্দী থেকে প্রাকস্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে, সেই বাঙ্গালী মাত্র এই পঁয়তাল্লিশ বছরেই পশ্চাতে পিছিয়ে পড়ল কেন? দরকার বাস্তব চিন্তা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির। কল্পনা বিলাসিতা যথেষ্ট হয়েছে। এর উত্তর কেউ খোঁজে না।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, সমগ্র দক্ষিণভারত থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত কৃষিতে শিল্পে শিক্ষায় বেসরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এমনকি ন্যক্কারজনক বর্তমানের বাম ও দক্ষিণ রাজনীতিতে পর্যন্ত বহুলাংশে উন্নতি করেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে! সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল, নীতি, নিষ্ঠা। সেই গুণাবলীতে ছিল বাঙ্গালীর সুনাম। এখন বাঙ্গালী সবার চেয়ে হীনতার দোষে দুষ্ট। নরনারী নির্বিশেষে সকলের রক্তেমাংসে দুর্নীতি এবং অমানবিকতার জীবানুগুলি সর্বক্ষণ কিলবিল করছে! অন্যকে দোষ দিয়ে, অন্যের প্রতি অঙ্গুলীনির্দেশ

করে লাভ নেই। দক্ষিণ ভারতের অন্তত চল্লিশটির মতন বড় শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে ; উত্তর ভারতের ত কথাই নেই। পশ্চিমবঙ্গে বছর বছর হাজার হাজার বাইরের লোকের আগমন হলেও, কলকাতা ছাড়া অন্য কোন দর্শনীয় স্থান আজো নেই। বাঙ্গালী খোদ কলকাতার বুকেই ক্রমশঃ অপসৃয়মান।

এসবের জন্যে সর্বাগ্রে বাঙ্গালী রাজনীতির পসারীদের অপরাধী করতে হয়। এইসব রাজনীতি ব্যবসায়িদের চৈতন্য জাগাবে কে? বাঙ্গালী জাতিকেই তারা মেরুদণ্ডহীন জড়ভরতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে তাদের সুবিধার জন্যে। আজ দরকারছিল আর একজন অদ্বৈতাচার্যের, যিনি চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটাতে পারতেন! অন্যথায় দ্বিতীয় কোন ষ্টালিনীয় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল ; যিনি বেয়নেটের ঘায়ে নিদ্রিত এই জাতটাকে জাগাতে পারতেন! দুর্ভাগ্য আমাদের।

সখেদে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র শতবর্ষ পূর্বে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই ; নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না।" আমারও সেই কথা। আমাদের ঘরে ঘরে রাজনীতি নয়, ইতিহাস—বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস পড়াতে হবে। জানাতে হবে তরুণ তরুণীদের যে তাদেরও অতীত ইতিহাস রয়েছে। স্বার্থান্বেষীরা বিকৃত তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে চোখে ঠুলি পরিয়ে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার উপায় হল, নিজেদের বংশপরিচয় জানা, অর্থাৎ বাঙ্গালীর আপন অতীতকে জানতে চেষ্টা করা। মনুষ্যত্বটুকু যে কোনরূপে বজায় রাখা। লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণীর এই যে অপচয় ঘটান হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

কয়েকটি উদ্ধৃত দিয়ে শেষ করব। মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত একটি চর্যাগীতি—

টালিতে মোর ঘর নাহি পড়িবেশী
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জা অ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে সমাঅ ॥

অর্থাৎ 'টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই ; নিত্য ক্ষুধার্ত। ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে। দোয়া দুধ বাঁটে ঢুকিয়া যাইতেছে।'

খৃষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের পূর্বেই আমাদের বাঙ্গলায় গঙ্গারাষ্ট্র ছিল, উল্লেখ গ্রীক-লাতিন লেখকদের বইতে রয়েছে এবং সেই গঙ্গারাষ্ট্রের শৌর্য-বীর্য কিছু কমও ছিলনা। দুর্ভাগ্য যে সেইসবের কোন তথ্য আজ আমাদের জানা নেই। তবে গঙ্গারাষ্ট্র বাঙ্গলারই ছিল।

আর গঙ্গারাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর কাছেই প্রতিহত হয়ে গ্রীক সৈন্যবাহিনী যে ফিরে গেছল সে কথাও জানা যাচ্ছে। বাঙ্গালীরও অতীত শৌর্য কিছু ছিল! গৌড়, সমতট ইত্যাদিও বাঙ্গালীর সাম্রাজ্যই ছিল! ইতিহাস তারও সাক্ষ্য বহন করছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বাঙ্গলায় তথা পূর্বভারতে মাৎস্যন্যায়ের প্রাবল্য ঘটেছিল। কামরূপের রাজার সহায়তায় এই সময় সুযোগ বুঝে চীন ও তিব্বতের রাজারা এদেশ জয় করেছিলেন। এই অরাজকতা একশ' বছরের ওপর বজায় ছিল। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' (ডঃ নীহার রায় উল্লেখিত) আছে যে, মহারাজা শশাঙ্কের পর থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি বাঙ্গলার কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপালদেবকে সম্রাটের পদে বরণ করে চারশত বছরের বাঙ্গালীর শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর রাজত্বকালের সূচনা করেন! সেই ইতিহাস উদ্ধারে আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের বংশগৌরবের ইতিহাস যে!

আজকের অরাজকতা, অমানবিকতা, দুর্নীতি, খুনোখুনী দেখতে দেখতে পুনরায় নতুন করে মাৎস্যন্যায়ের আবির্ভাবের কথাই কেবল মনে আসে। এর পরিণাম অবশ্যম্ভাবী রূপে ভয়াবহ। সকলেই সেই সূচনা দেখতে পাচ্ছেন। অতএব মাভৈঃ বলে নোংরামীর দুর্নীতির স্রোতে সকলে গা ভাসিয়ে দিক। তাহলেই নিস্তার।

পেঁচকের চোখ

সুধাংশু ঘোষ (জামসেদপুর)

দিনান্তের অস্তমিত সূর্য্য
দিবসের অবসানে
মিটে যাওয়া আলো
রাত্রির আগমণি বার্ত্তা ;
নিস্তেজ পৃথিবীর
স্তব্ধ আনাগোনা
খেটে খাওয়া মানুষের
অবসন্ন দেহ
ক্ষণিকের বিশ্রাম।

জাগ্রত মানুষের নেশাখের
ঢুলু ঢুলু আঁখি
অতন্দ্র প্রহরীর জেগে থাকা
পেঁচকের চোখ।
রাত্রির গভীরতা
নির্জন পৃথিবীর অন্ধকার
অবাঞ্ছিত মানুষের উগ্রতা
রাত্রির মাতোয়ারা অভিসার।

সনেট

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সত্যিকার বলো দেখি অরণ্যে গিয়েছে কোনো পথ ?
শহরের ধুলো ধোঁয়া মনকে বিষিয়ে দেয় বড় ;
এখানের মানুষেরা অঙ্ক কষে আপন ও পর
চুলচেরা বিচারের পর ঠিক করে কার রথ
ছাড়পত্র পাবে আর দেওয়া হবে সুবিধা তাবৎ,
কাকে ফাঁসে লটকে দেবে নিয়মের অমোঘ নিগড়
জানি না তা, তবু মন জোগাবার প্রচেষ্টা দুস্তর,
তাই বনে যেতে চাই ছেড়ে এই উজ্জ্বল জগৎ।

শহরে পর্যাপ্ত সুখ, পণ্যবস্তু, মূল্য যার ফাঁকি
সহজে যে কেউ পারে সস্তাদরে কিনে নিতে সব,
নিকেলের মনে গান সারাক্ষণ টুং টাং বাজে ;
আতরে আচ্ছন্ন হয়ে অবিকার শুধু শুয়ে থাকি
প্রতিদিন উৎসবের কানে আসে তীব্র কলরব !
অথচ আনন্দ নেই, আনন্দ ত' অরণ্যেই সাজে।

নব নীড় (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আবাস)

৩০, অশোক এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৪০

ও

১/২ শ্যাম বোস রোড, চেতলা, কলিকাতা-১৭

কেবলমাত্র বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে, স্বল্পব্যয়ে সর্ববিধ
সুবিধাসহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরিচালনায় :—

উইমেনস্ কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল

৫/১, রেডক্রস্ প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১

প্রয়াত শোভনা সেন-এর অপ্রকাশিত কবিতা

শতরূপে

নগ্ন প্রায়, ছিন্ন বস্ত্র গায়,
কে আসি দাঁড়ালে দরজায়,
দশমীর শেষে,
এই বিজয়ায় ?
স্বল্প দৃষ্টি, অন্ধ প্রায়,
লোকটির দক্ষিণ হস্তখানি
স্ত্রীলোকটির স্কন্ধ,
কোরে আছে স্পর্শ।
মাগো, ভিক্ষা দাও বলি,
সুমুখের প্রাঙ্গনে
আসিয়া দাঁড়ায়।

কিছু পয়সা দিলাম ভিক্ষা,
বলি, একটু কর অপেক্ষা।
মিঠাইও একটু দিলাম এসে
তাদের হাতে এনে।

জীর্ণ, শীর্ণ, জায়াপতি,
পরস্পর করিয়া নির্ভর,
দেউড়ী হ'য়ে গেল পার,
কৈলাসে ফিরিল যেন
উমা—মহেশ্বর !

আকাশে উঠব

চিত্রিতা দেবী

আমি একদিন আকাশে উঠব।
আমি আকাশ হয়ে যাব।
আমার এ জীবনের সব দুঃখগুলি
ধোঁয়ার রেখার মত আকাশে পাঠাব।
মেঘের কোমল গায়ে জড়াব তাদের।
শান্তিজলে ধুয়ে দেব তার যত তাপ।
তারপরে,
বৃষ্টিধারায় আমি আসব আবার
আমার এ পরিচিত পৃথিবীর
নবতৃণাঙ্কুরে।

॥ প্রার্থনা ॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ

মাগো, তোর কোল জোড়া শিশু হ'য়ে থাকতে চাই আমি—
জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে তোর বুকে শুয়ে থেকে
তোর ঐ দুঠোঁটের হাসি
খেয়ে মেখে আহ্লাদে ভেসে যেতে চাই অহংকারে।
এই মাতৃহীনকে তুই স্বেচ্ছায় অনাবিল মাতৃস্নেহ দিয়ে অকাতরে
কাছে ডেকে নিলি মাগো! কী দিয়ে শুধব তোর এই মাতৃঋণ?
আমার যে কিছু নেই। নিঃস্ব ভিখারী শুধু হাত পেতে দাঁড়িয়ে তোর দ্বারে
চেয়ে আছি তোর মুখে। —জানি তোর পবিত্র বরাভয় করে
শুদ্ধ নিরাময় আছে। এই রাত্রি শেষে তুই নিয়ে আসবি দিন।

কেন এত ভালোবাসলি অক্ষম গুণহীন এ বিদীর্ণ বৃদ্ধ লোকটাকে?
আমার মধ্যে তুই কী দেখেছিস—সত্যি ক'রে বল মা আমাকে।
মনে হয় তোর ঐ দেবী-দৃষ্টি রাত্রিদিন আমাকে সে ডাকে।
একটি মুহূর্ত আর থাকতে পারি না আমি মাতৃমুখ-চন্দ্রমা না দেখে।
কাছে এসে দাঁড়ালেই মনে হয়—আকাশ নদীর সম্মেলন
ঘটছে আমার মধ্যে—নবজন্ম ফিরে পাই নতুন বিবেকে।
তোর দৃষ্টি, তোর স্পর্শ, ভালোবাসা মাখা তোর কথার বর্ষণ
আমার সর্বাঙ্গে যেন ঝ'রে পড়ে; মুছে দেয় হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ,
সব পাপ, সব গ্লানি ধুয়ে যায়—তোর মাতৃমমতার বরে।
আমার কণ্ঠে যেন ফিরে আসে নবতর জীবনের সঙ্গীত সংলাপ।

আমার শিয়রে তুমি জেগে থাকো—সর্বাঙ্গ বিষাক্ত করা
আমার এই অসহায় জীবনের জ্বরে।
ছোট্ট তোর শিশুর মতো ভাবতে তুই পারিস না আমাকে—
তোরই জরায়ুর থেকে বিনির্গত আমি তোর স্নেহের সন্তান?
আমার জন্য তুই মুক্ত ক'রে দে মা তোর
ঐ মাতৃ মমতার মোহন উদ্যান।
ছোট্ট শিশুর মতো আমাকে জড়িয়ে থাক—
মাতৃহীন ফিরে যেন পায় তার মাকে।

শোভনা সেন ঃ মমতাময়ী ছবি

সুশান্ত কুমার পাল

'মাটীর প্রদীপ' হাতে নিয়ে যিনি বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন এবং ভক্তি ও ভালোবাসায় যিনি বঙ্গ-সাহিত্য সেবকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন—তিনি আমাদের মধ্যে কয়েকবছর ধরে অনুপস্থিত। যতো দিন চলে যাবে ততদিন তাঁর অভাব আরো বেশী করে অনুভব করবো। অনুভব করবো তাঁর মমতাময়ী ছবি—তাঁর মৃদু সম্ভাষণ, সর্বতোভদ্র আচরণ, এবং তাঁর সপ্রেম ও সনিষ্ঠ সাহিত্য সেবা।

মূলতঃ কবি হিসেবে তিনি সুপরিচিতা হলেও বাস্তব জীবনের মুখোমুখি অভিজ্ঞতা নিয়ে 'ওরা কাজ করে' নামে একটি গল্পগ্রন্থও রচনা করেছেন। এতে আছে বিজাতি বিজিত, স্বজাতি নিন্দিত খেটে খাওয়া মানুষের ক্রন্দন, আর প্রতিবাদ। আরও একটি বড় কাজ তিনি করেছেন—যাঁর জন্যে তিনি আমাদের মধ্যে থাকবেন। সেটি হলো মহাপুরুষদের জীবনী পদ্যে লিখেছেন 'সাধক মালিকা' গ্রন্থে। তাঁর আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ 'পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য' মহাপ্রভুর ৫০০ তম আবির্ভাব স্মরণে তাঁর অনবদ্য অবদান। এই গ্রন্থগুলি ভক্তিরসের ধারার সঙ্গে ইতিহাসের ধারাবাহিক সংবাদের নিখুঁত মিশ্রণে পরিবেশিত হয়েছে। কোথাও বুঝলাম না বলবার উপায় নেই।

আমার সঙ্গে তাঁর দিদি এবং ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল। তিনি দিদি আমি ভাই। কখন যে তিনি আমাকে ভাইয়ের আসনে অভিষিক্ত করেছিলেন তা আর আমার এখন মনে নেই। তবে সেই একদিনের কথা এখনও ভুলতে পারিনি। হয়তো আর ভুলতেও পারবো না। কলিকাতা সাহিত্যিকার পত্রিকা নিয়ে তাঁর বাড়ীতে এক বৈশাখের খরতপ্ত দুপুরে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম, দেখলাম দিদি, নিবিষ্ট চিত্তে লিখছেন। আমি দিদি বলে ডাকলাম। তিনি মৃদু হেসে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। মুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মুখটা কষ্টে করুণ হয়ে উঠলো। তিনি আদর মাখানো স্বরে বললেন বসো। লোডশেডিং চলছিলো। পাশের ঘরে চলে গেলেন তিনি। আমি পাশে পড়ে থাকা হাত পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম। আর খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ তাঁর হাতের স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তিনি ভিজে গামছা দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। কিছু বলার সুযোগই পেলাম না। তারপর আমার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে হাওয়া করতে চাইছিলেন। আমি বাধা দিলাম। 'না, দিদি, লাগবে না। আমি নিজেই হাওয়া করে নেবো।" এরপর তিনি পাশের ঘরে গিয়ে নিজে হাতে সরবৎ করে নিয়ে এলেন। তারপর যথারীতি জলযোগ। সেদিনের কথা মনে এলে এখনও চোখে জল আসে। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। দিদির স্নেহ আদর, ভালোবাসা—এ সবই যেন আমার হারানো মায়ের অবিকল মমতাময়ী ছবি। প্রণাম দিদি, তোমাকে শতকোটী প্রণাম—

মধুরেণ

শৈলজা চৌধুরী

অজয়ের তখন কতই বা বয়স। সবে ইউনিভার্সিটির গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এমন সময় কাজ পেয়ে গেল একটা গ্রামের ইস্কুলে।

মা বলেন, এত তাড়া কিসের? ভাল চাকরীর খোঁজ কর। কিন্তু তার বাবা বলেন, বসে থাকার চেয়ে কিছু করা ভাল। চাকরী করতে করতে অন্য চাকরীর চেষ্টা কোরো।

অজয় তাঁর ছোট ছেলে। রিটায়ার করার সময় হয়ে এসেছে। অন্য দুই ছেলে প্রতিষ্ঠিত। তিনি দেখে যেতে চান অজয় নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পেরেছে।

বাবার মত পেয়ে অজয় সহর থেকে বহু দূরে এক অজ গায়ে এসে পৌঁছল। গায়ের নাম মৌরীগ্রাম। এককালে যে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল অজয় গ্রামে পা দিয়েই বুঝতে পারল।

বড় বড় মন্দির, জলাশয় সবই আছে। বিদ্যালয়টিও একটি নাম করা লোকের বাড়ি ছিল।

স্কুল কমিটিতে সেদিন সবাই চিন্তিত। অজয়ের মত একটি শিক্ষক তারা খুঁজছিল। কিন্তু সমস্যা হল অজয়ের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে।

অন্যান্য শিক্ষক কাছাকাছি গ্রাম থেকে আসতেন, কেউ কেউ চলে যেতেন। কেউ কেউ থাকতেন। স্কুলবাড়ির দোতালা ছাদের ঘরটিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্নান করতে যেতে হত নীচের পুকুরে। অজয় কলকাতার ছেলে। সে কি এই ব্যবস্থায় থাকতে পারবে?

অজয়কে ওরা কোনওক্রমেই হারাতে চায় না। শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান নীরদবাবু বলেন, আচ্ছা সূর্যবাবুর বাইরে ঘরের পাশের ঘরটায় ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? ওটা অতিথির জন্যেই রাখা হয়েছে। স্নানাগার, শৌচাগার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া। অন্দরের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই।

সূর্যবাবু এক কথায় রাজি। কিন্তু আপত্তি তুললেন সূর্যবাবুর স্ত্রী কুন্দমালতী।

—না বাপু বিয়ে হয়নি এমন ছেলেকে ঘরে রাখব না। আমার মেয়ে না থাক, ভাশুর ঝি, দেওর ঝি সব বড় হয়ে উঠেছে। না থাকা চলবে না।

নীরদবাবু ছাড়বার পাত্র নন, বলেন আমাদের ইস্কুলের জন্য একটু মিথ্যাভাষন করতে হবে। জানেন তো প্রয়োজনে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

বলতে হবে, আপনি বিবাহিত, বধূকে আনতে পারছেন না কারণ তিনি সন্তান সম্ভবা।

কথাটা শুনে অজয়ের কানের ডগা লাল হয়ে যায়।

নীরদবাবু বলেন, কথাগুলো আমরাই বলব, আপনি শুধু প্রতিবাদ করবেন না।

এমনি ভাবেই অজয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

কুন্দমালতী মানুষটি মন্দ নয়। দু'বেলা অজয়ের খোঁজ খবর করেন। এমন কি অজয়কে রাঁধতে হয় না। পুরোনো চাকরকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেন। তবে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, —বৌমা কেমন আছেন? ছেলে, মেয়ে যা হয় জানিও আমি মন্দিরে পূজো দেব।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল। স্কুলেরও উন্নতি হয়েছে। অজয়কে পেয়ে সবাই খুশী। অজয় নিজের ঘর আর সামনের পথ ছাড়া ভুলেও কুন্দমালতীর আঙিনা মাড়ায় না।

কুন্দমালতী মাঝে মাঝে তাড়া দেন, কি হল বৌমার? বৌমাকে আনলে না।

এ কথার উত্তর সূর্যবাবু দেন। —আরে বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে, সহজে কি ছাড়বে! তোমার নিজের কথা মনে নেই?

এইরকম করে আরো কিছুদিন চলার পর, একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল।

আকাশে মেঘ করেছে। গাছে গাছে ঘন ছায়া। সামনের দিঘিটা জলে ছলছল করছে। তারই ধারে চাঁপা গাছটা থেকে ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে।

আর তারই তলায় ও কে? তন্বি শ্যামা, শিখরদশনা—সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ যেন উঠে এসেছে। চাপা ফুল কুড়িয়ে কানে, মাথায় পরেছে। লোধ্ররেণু মেখে এ যেন কালিদাসের কালের মেয়ে।

মেয়েটি এবার পিছন ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে শুভদৃষ্টি। মেঘের আড়ালে নির্জন প্রকৃতিতে অলক্ষ্যে ওদের মালা বদল হয়ে গেল।

অজয় না দেখার চেষ্টা করলেও এ বাড়ির মেয়েদের একবার না একবার চোখে পড়েছে। কিন্তু একে তো দেখেনি সে।

অবশ্য খবরটা পেতে বেশী কষ্ট করতে হল না। কুন্দমালতীর ছোট বোনের মেয়ে রেবা, কলেজের ছুটিতে এসেছে মাসির বাড়িতে।

নীরদবাবু সূর্যবাবুকে বলেন, অজয়ের নতুন চাকরীর appiontment letter এসে গেছে—বলতো রেবার সঙ্গে সম্বন্ধ করি।

এর পরের ঘটনটা ছোট হলেও মধুর।

একেবারে দেখা হল বাসর ঘরে অজয়ের সঙ্গে কুন্দমালতীর।

—ওরে দুষ্টু ছেলে পেটে পেটে এত বুদ্ধি—বলেই কান মুলে দিলেন অজয়ের।

কুন্দমালতীর বোন সন্ধ্যামালতী সেসময়ে এসে হেসে বলেন, ওকে একা দোষ দিওনা দিদি, মূলে তোমার কর্তাটি আছেন।

এরপর হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়। সূর্যবাবু হেসে বলেন, যাই বল, শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

অন্বেষণ

লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক

তোমাকে খুঁজে বেড়াই অবিরত অবিশ্রান্তভাবে
সবুজ আরণ্যের গভীরে, শুভ্র পর্বত শিখরে,
সীমাহীন সমুদ্রের সফেন উত্তাল জলোচ্ছ্বাসে
দর্শনের অন্তহীন প্রত্যাশায় আকুল অন্তরে।
সুদূর নীলিমায় অসংখ্য জ্যোতিষ্কের মাঝে,
ভোরের স্নিগ্ধ শিশির বিন্দুতে, ফুলের সমারোহে
মাতৃহীন শিশুর মতো অনেক খুঁজেছি তোমাকে
উদ্দাম ঝর্ণাধারায়, খরস্রোতা নদীর প্রবাহে।
অনেক হেঁটেছি পথ চতুর্দিকে আলোকে আঁধারে,
গ্রীষ্মের খরতাপে সুশীতল স্নিগ্ধ বর্ষধারায়
অক্লেশে অনায়াসে শক্তিকে সব কেন্দ্রীভূত করে,
তবুও রহস্যের উন্মোচন হয়নি চেতনায়।
আজও রূপের মাঝে ঘটেনি তো অরূপদর্শন,
জানিনা কোথায় রহেছো লুকায়ে বিশ্বচরাচরে।
অথচ মেনে নিতে হয় সম্পূর্ণ দ্বীধাহীন ভাবে
রহেছো তুমি প্রভু নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করে।
শাস্ত্রের অতল গভীরে ডুবেও পাইনি তোমায়,
জেনেছি শুধু তুমি বাক্য এবং গোচরের অতীত।
তোমাকে খোঁজা মানে তাই সময়ের বৃথা অপচয়,
অনুভব করি আজ আমার অস্তিত্বে, শোণিত ধারায়।

প্রভুকে দেখলাম

সুনীল কুমার দে (বিহার)

মন্দির মসজিদ গির্জা গুরুদ্বারে মাথা খুঁড়লাম,
বেদ কোরাণ বাইবেল আর গুরুগ্রন্থের পাতায়
অযোধ্যা মক্কা বেথেলহাম আর স্বর্ণমন্দিরে
খুঁজলাম তাঁকে।
জানতে চাইলাম গুরু আচার্য্য পাদ্‌রী ও
মৌলবীর কাছে!
প্রভুকে পেলাম না!
ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা আর বিবাদ,
প্রভুকে নিয়ে টানাটানি হানাহানি
মত আর পথ নিয়ে হিংসা হত্যা খুন!
ভেতরের শিব উঠলো জেগে!
বিবেক দেখিয়ে দিলো প্রভুকে আমার
মানুষের মাঝে!
দরিদ্র মুর্খ, ক্লীষ্ট, অসহায়
জনে জনে দ্বারে দ্বারে
প্রভুকে দেখলাম বহুরূপে সম্মুখে
আনন্দ নিরাময় ও প্রেমঘন সত্তায়।

"সত্যজিৎ স্মরণে"

(গান)

গৌরগোপাল পাল (বীরভূম)

আমি গান শোনাই গো সেই মানিকের-বিশ্ব লোকের দরবারে ।
চলচিত্রে অঙ্কার যার বাড়িয়ে গেল মানটারে ॥
তাঁর, ঘরে-বাইরে, জলসা-ঘর, আর
পথের পাঁচালি, অপুর সংসার,
অশনি-সংকেত, কাঞ্চন-জঙ্ঘার—কোন্‌টাতে না প্রাণ কাড়ে ॥

নিখুতভাবে পরিচালনার—ছাপ রেখেছেন সব ছবিতেই,
অল্প কথায়, তাঁর বিষয়ে ঘাট হয়েছে, গাইতে এসেই ;
সব স্মৃতি তার বেঁচে আছে,
সেই মাণিকই চলে গ্যাছে,
আপন যারা পেতে কাছে—আজও খুঁজে বেড়ায় তারে ॥

ঈশ্বরের সিঁড়ি

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রেমই ঈশ্বরের পথের সিঁড়ি
সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ
গোলাপ মোড়ানো পিঁড়ি
আতর বিছানো এ পথ
এ পথে যেতে লাগে
শুধু হৃদয়ের রথ
অলিন্দ-নিলয়ে আঁচড়, আনমন
চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত ঝরে অনুক্ষণ
যেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু
কিংবা ভালবাসার আকুতি নিয়ে
দু'হাত বাড়ানো এক শিশু
দেয় ভরে আকুল আলিঙ্গন
এ পথেই বসন্ত
নতুবা অনন্ত দিগন্ত
এ পথে গোলাপ মোড়ানো পিঁড়ি
ঈশ্বরের পথের সিঁড়ি

চোর

বেদুইন

এরশাদ আমার এক ক্লাশ ওপরে পড়ত।

আমরা যে ছোট শহরে থাকতাম তা ছিল মোটামুটি সম্পন্নব্যক্তি অধ্যুষিত। তবে জনসংখ্যায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। পড়াশোনার ব্যবস্থাটা পরিচালনা করত যারা তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান ধনী সম্প্রদায়। তাদের চেষ্টায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় যেমন ছিল তেমনি ছিল মক্তব মাদ্রাসা। ইংরেজি বিদ্যালয়ে নীচের কোন ক্লাশ ছিল না সেজন্য প্রাথমিক পড়াশোনার জন্য ছিল মক্তব ও মাদ্রাসা। মক্তবের ছিল তিনটি ক্লাশ আর মাদ্রাসার ছিল ছয়টি ক্লাশ।

আমি মাদ্রাসায় পড়তাম। যখন ক্লাশ থ্রিতে পড়ছি সে সময় এরশাদ এসে ক্লাশ ফোরে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু এরশাদ ছিল খুব মিশুকে। ওপর ক্লাশের ও নীচের ক্লাশের সবার সঙ্গে তার ছিল বিশেষ ভাব-ভালবাসা।

এরশাদের বাবা আকসার মিঞা মিউনিসিপ্যালিটির বাজারে তরিতরকারী বিক্রি করত। অবস্থা ছিল খুবই মন্দ। সোজা কথায় আকসার মিঞা ছিল খুবই দরিদ্র। কোন রকমে মাদ্রাসার বেতন জুগিয়ে যেত। আশা করত, তার ছেলে কোন রকমে মাইনর পাশ করলে আদালতে কোন উকিল অথবা মোক্তারের মুহুরিগিরি করতে পারবে। তাতে তার অবস্থারও পরিবর্তন হবে।

এরশাদ কখনও তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করত না। এরশাদদের বাড়িতে ছিল একটা কামরাঙ্গা গাছ। কামরাঙ্গা পাকলে পকেট ভর্তি কামরাঙ্গা নিয়ে আসত আর বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। মাঝে মাঝে পকেটে করে শীতকালে নারকেলি কুল নিয়ে আসত। তারও ভাগীদার হতাম আমরা সবাই।

দেখতে দেখতে তিনটে বছর প্রায় কেটে গেছে। এরশাদ তখন সিকসে পড়ে। আমি পড়ি ফাইভে। গ্রীষ্মের ছুটি। সবেমাত্র বর্ষা নেমেছে। আমরা তখন নদীতে ঝাপাই পিটিয়ে. বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলে সময় কাটাই। পড়াশোনা তখন গৌণ। আমাদের বাড়ি থেকে এরশাদের বাড়ি প্রায় এক ফার্লং দূরে। দূরত্বটা যতই হোক, এরশাদ তার বাড়ি থেকে রোজই বেরিয়ে আসত দুপুর বেলায়। টৈ-টৈ করে ঘুরে বেড়ান আর অন্যের বাগানের আম পেড়ে খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো ছিল তার কাজ।

একদিন দুপুরে এরশাদ একটা থলে ভর্তি করে গোপাল ভোগ আম নিয়ে এসে বলল, নে খা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় পেলি এই আম ?

আফজল মোক্তারের বাগান থেকে বুধবার রাতে পেড়ে এনেছিলাম। দুদিন জাগ দিয়ে পাকিয়েছি। খা, ওসব তোকে ভাবতে হবেনা।

বললাম, তুই আম চুরি করেছিস, এই তো?

চুরি? সে কিরে! শালা আফজল মোক্তার খুবই হারামী। একটা আমও কাউকে দেয় না। দশ পনরটা গোপাল ভোগ আম গাছে কয়েক হাজার আম হয়। শালা সব আম বিক্রি করে, ফকির মিচকিনকেও একটা আম দেয় না। নে খা। হামিদ আর নিমাইকে আজ আমার বাড়িতে আসতে বলেছি। ফলার খাবে। তুই তো আমার বাড়ি যাবি না, তাই তোর জন্য পোঁঠলা বেঁধে এনেছি।

দুজনে পরিতোষ সহকারে আম খেয়ে গেলাম মাঠে ফুটবল খেলতে!

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যার সময় এরশাদ এসে বলল, ন·চ-ভ-এর বাগানে নারকোল হয়েছে। আজ রাতে কিছু হাতাতে হবে। যাবি আমার সঙ্গে?

ন-চ-ভ মানে নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। সাত্যিক ব্রাহ্মণ, দোল দুর্গোৎসব হয় তাঁর বাড়িতে। দান খয়রাতও করে থাকেন। তাঁর কাছে চাইলে দু একটা নারকোল বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। চুরি করাটা ঠিক হবেনা।

আমি বললাম, না ভাই রাতের বেলায় ও কাজ করতে পারব না।

এরশাদ অনেক যুক্তি দেখালেও আমি তার সঙ্গী হতে রাজি হইনি।

ক্লাশ-সিক্স্ পাশ করে এরশাদ আর পড়াশোনা করেনি। মাঝে মাঝে শুনতাম এরশাদ হাটে, মেলায় চায়ের দোকান করে। উপার্জন ভালই হয়। চায়ের দোকানে পান-সিগারেটে-বিড়িও বিক্রি করে।

আমি উচ্চ ইংরেজি স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়তে গেলাম। এরশাদ তার ব্যবসা নিয়ে রইল আমাদের সেই শহরে। ছুটিছাটায় বাড়ি গেলে এরশাদের সঙ্গে দেখা হত। আমার খবর পেলে এরশাদ দোকান বন্ধ করে ছুটে আসত গল্প করতে। তার গল্পের বিষয়বস্তু বিশেষ কোন বিষয় নয়। তবে বড় বড় দোকানদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সে বিষ উদ্গারণ করত। যে ভাবে সে মন্তব্য করত তাতে ভয় পেতাম। যে কোন সময় এরশাদ দল বেঁধে লুটপাট করতে পারে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বার আনাই হিন্দু, তার আক্রোশের কেন্দ্রস্থল ছিল হিন্দু অর্থাৎ কেমন একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব। তবে খোলাখুলি তা বলত না।

এরশাদ বলত, ওই শালারা শাইলক। রক্ত চুষে খায়। গরীবের দিকে তাকায় না। আমাদের বুজরুগরা বলে, ফেতরা দাও। গরীবকে দান কর। কোন শালাই তা করে না। তোদের তো দানধ্যানের অনেক গল্প আছে, কোন শালাই তো তা করেনা।

বললাম, এই তো সেদিন বিরাট মহোৎসবের সময় কয়েক হাজার গরীবকে মহাজনরা খাইয়েছে, প্রত্যেক পরিবারে একটা করে তুলার কম্বল দিয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

তাতো দেখেছি। কিন্তু এতে কি মানুষের দুঃখ কমবে? ভিখারীর সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে। এসব দানধর্ম সব ভণ্ডামি।

দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল।

আরম্ভ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বাজারে চাল নেই। কাপড় নেই। তেল নেই। ওষুধ নেই।

যে যেমন পারছে লুটে খাচ্ছে।

আমি কয়েক বৎসর স্বদেশী করার পুরস্কার পেতে রাজগৃহে অতিথি ছিলাম। দেশের খবর কিছুই রাখতাম না। হঠাৎ রাজগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় গেলাম আইন পড়তে।

পড়া শেষ করে যখন দেশে ফিরলাম আইন ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে নিয়ে, ঠিক সেই সময় দেশের মানুষ অনাহারে মরতে আরম্ভ করেছে। চারিদিকে হাহাকার। নাই-নাই চিৎকার, আর অনাহারীর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। আমি সবেমাত্র একটা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে বসেছি মক্কেলের আশায়। আমার প্রথম মক্কেল হলেন এরশাদের মা সাকিনা বিবি।

বৃদ্ধা বিধবা কোন রকমে আমার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেই বলল, আমাকে চিনতে পার বাপজান? আমি এরশাদের মা।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে সাকিনাবিবিকে পাশের চেয়ারে বসিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে বললাম, আপনি তো আমারও মা। এরশাদ কেমন আছে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এরশাদের মা বললেন, ওর জন্যই তো এসেছি। এরশাদকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ওকে জামিন করতে হবে বাপজান।

এরশাদের অপরাধ কি?

অপরাধ হল পেট। নিজের আর পাড়ার সবার। তৈসাকিয়ার হাট থেকে সরকারের ফড়িয়া এস্তাজমালি কয়েক সপ্তাহে নাগাড়ে চাল কিনে গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে সরকারী গুদাম ভর্তি করছিল। এদিকে দেশের লোক তো খেতে পাচ্ছেনা। তুমি তো জান এরশাদ কেমন গোঁয়ার, একটা গাড়ির চাল আটক করে সব চাল বিলিয়ে দিয়েছে ভুখা গরীবদের।

বললাম উদ্দেশ্য তো ভাল। তবে কাজটা ইংরেজের আইন বিরুদ্ধ।

অনেক বাকবিতণ্ডা করে এরশাদের জামিন করেছিলাম।

এরশাদকে দেখে মনে হল না, তার কাজের জন্য সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত।

বলেছিল, আরে বাপু দু বছর জেল না হয় খাটব। জেলে তো খেতে দেবে কিন্তু এতগুলো লোককে তো একমাস পেট ভর্তি খেতে দিতে পেরেছি। আল্লার রহম আমার ওপর রইবে চিরকাল। শয়তান ইংরেজ, তার চেয়ে বড় শয়তান শালা ফড়িয়ারা।

মামলা চলতে থাকে।

P 29180

CENTRAL LIBRARY

এরশাদের সমাজ সেবার স্পৃহা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পাড়ার মুসলমান মেয়েরা দল বেঁধে এরশাদের কাছে এসে আবেদন জানায়, এরশাদ, আমাদের পিনহার ত্যানা নাই। ঘরের বাইরে বেরতে পারছি না। তুই একটা ব্যবস্থা কর।

কি ব্যবস্থা করব চাচী। সরকার সব ধুতি শাড়ি লুঙ্গি কন্ট্রোল করেছে। সেই কন্ট্রোলের মাল চোরা পথে বিক্রি হচ্ছে দুনো তিনগুণ দাম না দিলে পাওয়া যায় না। আমার কি অত পয়সা আছে তোদের লাজ মেটাতে।

মেয়েরা চোখ মুছতে থাকে।

কাঁদিস না তোরা। আল্লার ওপর ভরসা রাখ। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

এরশাদ ব্যবস্থা করেছিল।

ঝাবর মাল মাড়োয়ারীর কন্ট্রোলের কাপড়ের গুদাম থেকে ষাট সত্তর খানা শাড়ি লুঙ্গী গুদামের পেছনের জানালা ভেঙ্গে চুরি করে মাথায় করে আসছিল।

দূরে টর্চের আলো জ্বেলে রাতের রাউণ্ডের পুলিশ একটা লোককে মোট মাথায় করে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠল। হুকুমদার (Who comes there ?)

এরশাদ বুঝল সমূহ বিপদ। মাল ধরা পড়লে নির্ঘাত তিন বছর তার ওপর চাল লুটের মামলা তখনও ঝুলছে। রাস্তার পাশে একটা ডোবা ছিল, আস্তে আস্তে কাপড়ের মোটটা ডোবার জলে নামিয়ে দিয়ে ঝোপে আত্মগোপন করে রইল। রাউণ্ডের পুলিশ কাউকে দেখতে না পেয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল।

পরের দিন সকালে এরশাদ জল থেকে কাপড়ের মোট তুলে পাড়ার মেয়েদের ডেকে প্রত্যেকের হাতে একখানা করে কাপড় দিয়ে বলল, এই নে, ত্যানা। তোদের আব্রু বাঁচুক। আরও ক'খানা রইল। রমজান মাসের পর যার ঘরের মেয়ের বিয়ে হবে তার জন্য একখানা করে শাড়ি জমা রইল।

ঘটনাটা পরের দিন এরশাদ আমাকে বলেছিল কিন্তু চাল লুটের মামলায় এরশাদকে বাঁচাতে পারিনি, পুরো নয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

অনেকেই বলেছিল, এরশাদ চোর। চোরের শাস্তি হওয়া উচিত। এমনকি যারা লুটের চালের ভাত খেয়েছিল, পরিবারের লজ্জা নিবারণ করেছিল এরশাদের দেওয়া ত্যানায় তাদের অনেকে বলেছিল, শালা পাকা চোর। উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।

(সত্য ঘটনার ছায়াতে)

॥ সমবেদনা ॥

(গল্প)

কুমারেশ ঘোষ

ভদ্রলোক মারা গেলেন।

কী হয়েছিলো তাঁর, কে চিকিৎসা করেছিলেন, কী চিকিৎসা হয়েছিলো, এসবে আমাদের দরকার নেই। তবে তিনি ছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক। এবং হঠাৎ-মৃত্যুর খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত হলেন।

সবাই ঘরে উঁকি মেরে ভদ্রলোকের মরদেহ একবার দেখে নিলেন। সবাই এসেচেন সমবেদনা জানাতে।

তারপর বাইরের ঘরে এসে বসলেন।

কতদিন পরে সকলের দেখা, একসঙ্গে হওয়া।

অবশ্য কারণটা দুঃখের।

খাট মালা ফুল আনতে গেচে বাজারে।

মুখ বুজে থাকা যায় কতক্ষণ!

—তা তোমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলো। কেমন আছ?

—ভালই। তোমরা।

—এই চলচে একরকম।

—ছেলেরা এখন কি করচে?

—বড়টা চাকরি করচে, ছোটটা ব্যবসা।

অন্যদল—

—সোভিয়েট রাশিয়া কেমন হুড়মুড়িয়ে পড়লো।

—শ্বেত ভালুকের মৃত্যু।

—এখন দেখা যাচ্চে কাগজের বাঘ।

—কিন্তু এতদিন দাপট দেখিয়ে এলো তো!

—গরবাচেভ কিন্তু ঐতিহাসিক হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, লেখা হবে, লোকটি দেশের উপকার করিতে গিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারিয়াছিল।....

আরেক দল—

—আজ ক্রিকেটের খবর জানো ?

—না। আমি তো ফোনে খবর পেয়েই চলে এলাম। রাত্রে টি-ভিতে.....

—আমরাও। যাক, খুব ভালই গেলেন। পড়লেন আর মরলেন। এমন যেতে পারলেই... তবে ইণ্ডিয়া খেলা দেখাচ্চে বটে.....

অন্য একটি দল—

—চাণ্‌ক্য কেমন দেখচো ?

—ভালই জমিয়েচে।

—তবে মহাভারত-এর মত নয়। তবে চাণক্যে রাস্তায় লোক কেমন চলতো, বাড়িগুলো কেমন ছিল, সব দেখিয়েচে কিন্তু...। তবে বড্ড কথা !

—আরে, এটা তো সকলের জন্যে নয়। যাদের ইতিহাস পড়া আছে, তারাই এতে রস পাচ্চে !

একটু পরেই খাট ফুলমালা ধূপ এলো।

ভদ্রলোকের মরদেহ খাটে সাজানো হলো।

খাট কাঁধে তোলা হলো।

ভদ্রলোকের আত্মা মৃদু হেসে বললেন—চলি।

বাড়ির লোকেরা কান্না থামিয়ে ঘরদোর ধুয়ে পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

'আভা' পত্রিকার সত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ের বিবৃতি।

প্রকাশন স্থান : ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬।

প্রকাশ কাল : মাসিক।

মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ও সত্বাধীকারী : রেখা চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় নাগরিক।

ঠিকানা : ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬।

আমি রেখা চট্টোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণগুলি, যথাসম্ভব আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রেখা চট্টোপাধ্যায়

১০-৮-১৯৯২

প্রকাশক

শেক্‌স্‌পীয়ারের সঙ্গে কিছুক্ষণ

॥ রম্যরচনা ॥

—দিগম্বর দাশগুপ্ত

সন্ধ্যা ৬ টার পর পাঁচ নম্বর শেক্‌স্‌পীয়ার সরণির বৃটিশ কাউন্‌সিল লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে ফিরতে ফিরতে সরণির পশ্চিম প্রান্তে শেক্‌স্‌পীয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মের পর শতাব্দী পুরো হতেই কলকাতার একজন মেয়র (তিনি ইচ্ছা করেই ফলকের বুকে নিজের নামটা খোদাই করান নি।) থিয়েটার রোডের এই (পশ্চিম) প্রচণ্ড একটা লালরঙা চিঠি ফেলবার বাক্‌সের পাশে শেক্‌স্‌পীয়ারের খোদাই করা ফ্রেঞ্চকাট ছুঁচলো দাড়িসহ মুখচ্ছবি যুক্ত স্মৃতিফলকটির প্রতিষ্ঠা করিয়ে ছিলেন, আর থিয়েটার রোডের নাম বদ্‌লে করিয়েছিলেন শেক্‌স্‌পীয়ার সরণি। চিনতে দেরি হলো না, ফলকের বাইরে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত নাট্যকার। আমাকে ডেকে বললেন, "দাঁড়াও দিগম্বর।" আমি দাঁড়ালাম। বিদেহী শেক্‌স্‌পীয়ার আর দেহী আমি ছাড়া আর কেউ কাছাকাছির মধ্যে নেই। প্রশ্ন করলাম "আমার নাম জানালেন কি করে?" শেক্‌স্‌পীয়ার বললেন, "শুধু নাম নয়, তুমি যে সিভিল এন্‌জিনীয়ার, আর সাহিত্যে তোমার নেশা আছে তাও জানি। কথা কইবার লোক পাই না, তাই তোমাকে ডাকলাম। দু'চারটে মনের কথা কইব। তা তুমি তোমার লেখার কাজেও লাগিয়ে দিতে পারো। কপিরাইটের আওতায় পড়বে না। আমি ভাবছি আঠাশ বছর তো এখানে রইলাম, এবার তোমাদের দেশের হালচাল নিয়ে একখানা নাটক লিখব, তুমি যদি আমাকে একটু মদদ্ দাও।" আমি বললাম "আমার যথাসাধ্য মদদ্ আমি দেব। কি করতে হবে বলুন।" শেক্‌স্‌পীয়ার বললেন, "আমার কলমচি হতে হবে। আমার তো হাত নেই, কাগজ নেই, ডট্ পেন নেই। লিখব কি করে? আমার মুখ থেকে শোনা কথা তুমি লিখবে।"

আমি রাজি হয়ে গেলাম। শেক্‌স্‌পীয়ার বললেন, 'আজ প্রথম দিনে তোমার মগজকে বেশী চাপ দেব না। প্রাথমিক কিছু কথা বলেই ছেড়ে দেব। নাটক লিখতে শুরু করার আগে তোমাদের দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিতে চাই। আমার এলোমেলো প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে যেয়ো না। আমার প্রথম প্রশ্ন তোমরা তো সংবিধানে ভারতকে 'সেকিউলার' অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলে বেশ ঘটা করে ঘোষণা করেছ। তাহলে ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংখ্যা-লঘু সংখ্যা লঘু বলে এত চেল্লাও কেন? 'সেকিউলারিজম' আর 'মাইনরিটি' দুটি Contradictory terms, অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী শব্দ। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে প্রত্যেকটি ভারতবাসীই ভারতবাসী। ভারতের রাষ্ট্রের কাছে হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সবাই সমানভাবে ভারতবাসী—কে

কি ধর্মে আস্থাবান সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কায়েদ-এ-আজম জিন্না সাহেব যেমন বলেছিলেন, রাষ্ট্রের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এখনো কোনো ধর্মের অবলম্বীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় বিশেষ সুবিধা পাবে কেন? তোমরা ভারতবাসীরা দাবি করো তোমরা সত্যের পূজারী। আমি ভাবি সত্যের এর চাইতে বড় অপলাপ আর কি হতে পারে? রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আমার দেশ গ্রেট-ব্রিটেন তোমাদের দেশ ভারতের চাইতে অনেক বেশী অভিজ্ঞ, ঐতিহ্যবান আর সুদক্ষ। আমাদের দেশে তো তোমাদের দেশের মতো সংখ্যালঘু সমস্যা নেই।"

আমি আমার মন্তব্য প্রকাশের ঝামেলা এড়াবার জন্য প্রশ্ন করলাম, "আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি?"

শেক্‌স্‌পীয়ার বললেন, "তোমাদের গরীব দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে আর রাজ্য সরকার-গুলিতে মন্ত্রী সংখ্যা এত বেশী কেন, এবং তারা জনসাধারণের টাকা নিজেদের বিলাসে ব্যসনে এমন খোলামকুচির মতো ওড়ান কেন? আমার দেশবাসিদের শাসনকালে তোমাদের যত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাদের আদর্শ ছিল ত্যাগ, তাঁরা দুঃখ বরণ করে গেছেন। তোমরা এখন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য স্বরাজ পেয়ে তোমাদের ব্যাকরণ মাফিক 'স্বরাজ'-এর সন্ধি বিশ্লেষণ করে সু-অরাজ অর্থাৎ ভালো রকমের অরাজকতার সৃষ্টি করেছ। এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে তোমাদের যে সব নেতারা নামেন, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ত্যাগ নয়, ভোগ; দেশের সেবা নয়, নিজের সেবা, পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে সাতপুরুষ যাতে বসে খেতে পারে তার জন্য পাকা পোক্তভাবে আখের গুছিয়ে যাওয়া। রাজনীতির মাঠে কোমর বেঁধে নামার মুখ্য মতলব হচ্ছে আখের গোছানো। তোমাদের এ দেশের মানুষদের ভালো হবে কি করে?"

আমি বেগতিক দেখে প্রশ্ন করলাম "আপনার তৃতীয় প্রশ্ন?"

শেক্‌স্‌পীয়ার বিশ্বের সেরা নাট্যকার হলে হবে কি? তাঁর মগজটা আমার বাঙালী মগজের মতো চালাক নয়। তাই তিনি আমার 'ধরি মাছ না ছুঁই' মার্কা এড়িয়ে যাবার চালাকিটা ধরতে পারলেন না, তৃতীয় প্রশ্নটি শোনালেন। "তোমাদের সরকারের 'সংরক্ষণনীতি'-র কি কোনো যুক্তি সঙ্গত যুক্তি আছে?"

আমি জবাব এড়িয়ে তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয়?"

আমার বাঙালী মগজের কাছে এবারও শেক্‌স্‌পীয়ারের মগজ হার মেনে গেল। তিনি আমার বাঙালী চালাকিটা বুঝলেন না, বললেন, "তোমরা তপশীলী জাতি বলে একদল মানুষকে আলাদা করে রেখে সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী চাকরিতে তাদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছ কেন? চাকরির ক্ষেত্রে একমাত্র efficiency অর্থাৎ কর্মদক্ষতাই হবে মানদণ্ড।

প্রত্যেক পদে নির্বাচিত হবে যোগ্যতম ব্যাক্তি। যাদের বলছ শিক্ষার অভাবে backward অর্থাৎ অনগ্রসর, তাদের forward বা অগ্রসর করবার জন্য তাদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ দাও, যাতে শিক্ষার ফলে সবার সাথে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করে তাদের পদপ্রাপ্তি ঘটে। সংরক্ষণ নীতির ফলে তথাকথিত পশ্চাদপদ (backward) মানুষদের backwardness অর্থাৎ পশ্চাৎপদ-অবস্থাটা একটা মারাত্মক কায়েমী স্বার্থে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কর্মপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে জাত পাতের ভেদবিচার রাখাটা এক রকমের বজ্জাতি বলেই আমি মনে করি। তোমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সব নেতারা গদি পাবার বা রাখবার জন্য ভোট পাবার উদ্দেশ্যে পশ্চাৎপদ মানুষদের দরদী সাজেন, তাঁরা নিজেদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে এইসব পশ্চাৎপদ মানুষদের বলি দেন, তাদের পশ্চাৎপদ কায়েম রেখে।

মহাকবি শেকস্‌পীয়ারের কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল আমারই লেখা একটি ছোট্ট জাতীয় কবিতা—যাতে পাপী উদ্ধারকারী মহাপুরুষের বলছেন ; "ওরে পাপী সম্প্রদায়, দোহাই তোদের তোরা পাপাচার বন্ধ করে আপনা থেকেই সাধু হয়ে বসে আমাদের ভাতে মারিস নে। তোরা যদি পাপ করা বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসিস, তাহলে আমরা উদ্ধার করব কাকে ?"

শেক্‌সপীয়ার বললেন, "ব্রিটিশ রাজ ভারত ছাড়ার পর একখানা বাংলা গান বেশ চালু হয়েছিল—

"জাগে মহাভারতের জনতা,
একজাতি, একপ্রাণ, একতা।"

কিন্তু এখন কোথায় আমাদের সেই একজাতিত্ব, একপ্রাণতা, একতা ? বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ; Unity in Diversity-ই নাকি ভারতের মহান বিশেষত্ব কিন্তু কার্যতঃ তো তা দেখতে পাচ্ছি না—বিচ্ছিন্নতাই দেখতে পাচ্ছি।

আমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে শেক্‌সপীয়ারকে বললাম, ' আমার একটা আর্জেন্ট এন্‌গেজমেন্ট আছে। আজ চলি। কাল কি পরশু আবার আসব।

"ভারতের হালচাল নিয়ে যে নাটক লিখব, সে ব্যাপারে আমাকে মদ দ দেবে তো ?

আমি বললাম, "নিশ্চয় দেবো।"

গিরিবালা মহিলা নিবাস

ছাত্রী ও কর্মরতা মহিলাদের
আবাসিক ব্যবস্থা আছে।
ফোন : ৭৫-৮১৭২

পূরবী

হাজারীলাল বিশ্বাস (গোপালপুর)

বাইরে ভাদ্রের এক ঘেয়ে ঝির ঝিরে বৃষ্টি। তায় পুবে হাওয়ার মিতালী নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতায় বেপরোয়া।

কল্যাণ সঙ্ঘের ক্লাব ঘরের ভিতরটায় নাটক রিহার্সেলের জন্য একটা সতরঞ্চ পাতা ছিল সমস্ত মেঝে জুড়ে। তার এক পাশে জ্বলছিলো একটা হ্যারিকেনের আলো। আর আলোটাকে কেন্দ্র ক'রে মুখোমুখি বসে ছিল সুশান্ত, কুণাল, নিখিলেশ, প্রবীর আর শশীশেখর।

রিহার্সেল যে আজ হবে না। একথা ওরা বর্ষার এই মেজাজ দেখেই ধরে নিয়েছিল। তাই বসে বসে বৃষ্টি ধরার অপেক্ষায় চুপচাপ সময় কাটাচ্ছিল। নিখিল এক সময় বললো—"চুপ-চাপ বসে না থেকে বরং নিজেদের এ্যাক্টিং গুলোর প্রক্সি দিলে হতো না?"

"দুত্তোর এ্যাক্টিং। এমন রিম ঝিম বর্ষায়—তুই একটা আস্ত গর্দ্দভ। একফোঁটা কাব্য-রস, কি একফোটা প্রেমরস,—দুটোর একটাও নেই। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ. ছ্যাঃ"—হেয় জ্ঞানে একেবারে নিখিলেশকে দমিয়ে দিল প্রবীর। মুখখানা নাটকীয় ভঙ্গিতে এমন বিকৃত করলো যে নিখিলেশ ছাড়া সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

কুনাল বললো,—"সত্যিই ভগবান ওকে অনেক কিছুই দিয়েছেন, তবে শ্রেষ্ঠ বস্তু ওই প্রেমরস ছাড়া—।"

কুনালের কথার শেষে প্রবীর পুনরায় বলে উঠলো তেমনি করেই—"আরে রাখো, রাখো। একটা মিথ্যে মনিষ্যি, মিথ্যে মনিষ্যি। মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক।"

প্রবীর, বিশেষ ক'রে এই কল্যাণ সঙ্ঘের ড্রামা পার্টির একদিকে পরিচালক, বিশিষ্ট অভিনেতা, আবার শিক্ষা দাতা।

সুশান্ত বললো,—'যাও হে নিখিলেশ: তোমার গুরু প্রবীরবাবুকে একটু ধাতস্থ করাও। মনে হয় দোকান থেকে তেলে ভাজার সুমিষ্ট গন্ধে তোমার গুরুবর দিশেহারা। সুতরাং কি কর্ত্তব্য সহজেই বুঝতে পারছো। যাও বাবা, আগে গুরু সেবা করো, তারপর যা করার করবে।"

সুশান্ত কল্যাণ সঙ্ঘ ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য। সঙ্ঘের পরিচালনায় কোন নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সময় বেশ মোটা রকমের ব্যয় করার একটা সুনাম আছে। সুতরাং এহেন ব্যক্তির উপদেশ অবহেলা করতে বাধলো নিখিলেশের। আর প্রবীরকে ধাতস্থ করালে যে সমস্ত উপস্থিত

সদস্যদের ধাতস্থ করাতে হবে তাও বুঝলো নিখিলেশ। আর এও বুঝলো যে মোটা রকমের কিছু খসবে। তাই ছাতাটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো নিখিলেশ। শশীশেখর অমনি নিখিলেশকে তেলে ভাজার সঙ্গে মুড়ি আনার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। কারণ বর্ষার মেজাজে তেলেভাজা মুড়ি জমবে ভালো।

প্রবীর বললো,—"বেচারার খসালে তো অনেক। রিহার্সেলের দফাও গয়া। মুড়ি আর তেলেভাজা খেতে খেতে তোমায় একটা গল্প বলতে হবে কিন্তু সুশান্তদা, কারণ ওটা তোমার আসে ভালো।"

"দশচক্রে শ্রীভগবানকে একদা ভূতের মেকআপ নিতে হয়েছিল। আজ না হয় আমি তোমাদের চক্রে পড়ে একটু বাক্যব্যয় করলাম। কিন্তু গলাটা বড় খস্ খস্ করছে। গল্পটা যখন বলতে হবে, তখন গলাটা না হয় একটু পরিষ্কার করে নিই।" বলে কুনালের দিকে ফিরে সুশান্ত তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে একটা মুদ্রা দেখিয়ে বললো, "ছাড়ো তো বাপধন একটা।"

"চিল যখন পড়েছে, তখন কুটো গাছটা না নিয়ে উঠবে না।" "বলে কুনাল নিজের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা ছুড়ে দিল।

"কিনে অবধি কি সিগারেট, কি দেশালাই, কোনটাই কাজে লাগাস্‌নি হতভাগা!" —বলে সুশান্ত সিগারেট ধরিয়ে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশালাইটা নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বড় ধোঁয়ার রিং উপরের দিকে ছেড়ে দিল।

শশীশেখর কুনালকে উদ্দেশ্য করে বললো—"কাক দেখেছিস কুনাল, কাক।"

কুনাল নিঃশব্দে শশীশেখরের দিকে তাকালে, শশীশেখর বললো,—"এই ব্যাটা সব জীবের মাংস খায়। কিন্তু ওর মাংস কেউ খেতে পারে না;—না কি বড় তেতো।"

ঘরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে সিগারেট টান ছিলো সুশান্ত। একটা পা আর একটা পায়ের উপর তুলে দিয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো,—"তোরা বড় পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েছিস দেখছি। কারো ভালো তোরা দেখতে পারিস না। এ স্বভাব কিন্তু ভদ্রজনোচিত নয় হতভাগারা।"

—"সিগারেটের প্যাকেটের সঙ্গে দেশালাইটাও পকেটস্থ করাও বোধ করি এক ধরণের নির্মল ভদ্রতা, না সুশান্তদা?" —কুনাল বললো।

—"বাব্‌বা! একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এ্যাতো মুখনাড়া। ঘাট হয়েছে বাবা তোদের সিগারেট নিয়ে খাওয়া। নিতান্ত ধরিয়ে ফেলেছি তার আর কি করবো।"

সুশান্ত বললো বটে কিন্তু সিগারেটের প্যাকেট বা দেশালাই, কোনটাই ফেরৎ দেওয়ার প্রস্তুতি দেখা গেল না। নিবিষ্ট চিত্তে সিগারেট টানতে লাগলো। একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বললো,

"খুব একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শোনাবো তোদের। মানে, প্রেম বস্তুটা মানুষের জীবনে ঠিক একই সময়ে একই পথে একই রকমে প্রকাশ লাভ করে না। কেউবা ঘা খেয়ে ঘস্‌টে ঘস্‌টে, আবার কেউবা হঠাৎই প্রেমিকার প্রভাবে পড়ে প্রেমিক হয়ে ওঠে। এই দুটোর উদাহরণ. প্রথমটায় এখনো ঘসড়াচ্ছে নিখিলেশ। আর দ্বিতীয়টা আমি। কিন্তু নিখিলেশের কথা থাক্! কারণ পরচর্চ্চা নিন্দার্হ। আমার কথাটাই শোন্। বিশ্বাস করিস্ আর না করিস্, যে ঘটনাটা বলবো, সে ঘটনাটা গত পৌষ সংক্রান্তির। যা তোরা শুনিস্‌নি।"

এমন সময় নিখিলেশ ফিরলো। মুড়ি আর তেলেভাজা সবাইকে ভাগ করে দিলে, সুশান্ত খেতে খেতে বলতে শুরু করলো,—"এর আগে প্রেম কি বস্তু আমি জানতাম না। কেবল শোনা ছিল, অমুক অমুকের প্রেমে পড়েছে। আর নাটকে যা আমরা প্রেম প্রেম অভিনয় করে গেছি। এ থেকে একটা সাধারণ ধারণাই ছিল পুরুষ আর নারীর ঘনিষ্ঠতাই প্রেমের মুখবন্ধ। আর সব থেকে স্থূল ধারণা হলো নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের দৃষ্টান্ত হলো প্রেম। কিন্তু থাকগে ওসব সাহিত্যের কচকচানি। ওতোরা বুঝবি না। আর বুঝলে সমালোচনার নানা ফ্যাকড়া বের করে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলবি। তার চেয়ে যা ঘটেছে সেই ঘটনাটা শোন্।

একবার আমার মেসের ঝি বুড়িটার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম যে তাকে গঙ্গাসাগর থেকে স্নান করিয়ে আনবো। সুতরাং ঝি বুড়িটা ধরে বসলো এবার নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং না বলতে পারলাম না। অতএব বুড়ি বোঁচকা বেঁধে নিলো। আমিও সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে রওনা হ'লাম।

সেবার আলমগীর মঞ্চস্থ করতে তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমার হাত বেশ খালি হয়ে গিয়েছিলো। আর সেই অবস্থায় বুড়িকে নিয়ে গঙ্গাসাগর। বুড়ির বোধহয় ভাগ্য ভালোছিলো যে মা গঙ্গাসাগর বুড়িকে আর ফেরত দেয়নি। আমার হাত খালি ছিল বলে ট্রেন থেকে নেমে ষ্টীমারে পার না হয়ে নৌকায় উঠেছিলাম। সন্ধ্যার পর নৌকা ছেড়ে দিল। পৌষের হাড় কাপানো শীত। আর শীতের সঙ্গে কুয়াশা পাল্লা দিয়ে ভরে উঠলো নদীর বক্ষস্থল। সেই কুয়াশার মধ্য দিয়ে পুণ্যকামী যাত্রী বোঝাই নৌকাটা ছুটে চললো সাগরাভিমুখে। বলতে লজ্জা নেই, নৌকার পলুই এর দিকে ছইয়ের দরজাটার মুখ আগলে বসেছিলাম। জানি কি যদি কিছু হয় তবে আগে আমি বেরুতে পারবো। আমাকে মারে কে? তাই যাত্রীদের কাছে অপ্রিয় অভদ্র হয়েও দরজার মুখ ছাড়িনি।

যাক্ নৌকা চলতে লাগলো। নৌকায় ওঠার ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির গুতোয় ক্লান্ত যাত্রীরা যে যার জায়গায় এ ওর পিঠে ও এর কাঁধে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে দিনের ধকলটুকু উসুল করে নিচ্ছিল। কেবল আমিই আমার পৈত্রিক দেহটার মায়ায় রাত জেগে নৌকার গলুই এর

দিকে চোখ রেখে বসে রইলাম। নৌকার ছইয়ের ভেতর মাঝামাঝি জায়গায় বোধকরি মাঝির প্রপিতামহের আমলের একটা কালিধরা হ্যারিকেন কোন মতে মনিবের কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছিল শুধু। কেবল সেই নিঝুম নিস্তব্ধ রাতে দাঁড়ি মাঝিদের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে আমার কানে পৌঁছেছিল। সুযোগ থাকলেও আমার ঘুমোবার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আমার ডান পাশ ঘেঁসে একটা অষ্টাদশী তরুণী সুযোগের অভাবে শুতে পারেনি। বসে বসে ঢুলছিল। ঢুলছিল আর আমার ডান কাঁধে তার কপালটা ঠুকে দিচ্ছিল। অবশ্য ঠোকা লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। আর ঘুম ভাঙা সুনিবিড় চোখ দুটো দিয়ে কৃত কর্মের লজ্জায় নুয়ে পড়ছিল। কিন্তু কতক্ষণই বা। আবার পরক্ষণেই ঢুলুনি আর ঠুলমারা। আমি প্রথম প্রথম, একে তরুণী, অষ্টাদশী, তায় সুন্দরী, তার উপর সহযাত্রীনি হিসাবে ক্ষমা করে আসছিলাম। অবশেষে আর পারলাম না। ঠুলমারার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটায় একটু ঠেলা দিয়ে চাপা কণ্ঠে বললাম, "এ্যাতো ঘুম কাতুরে যখন সকলের মত একটু শুয়ে নিলে পারতেন তো, কেন মিছে মিছি আমার হাড় মাংস থেঁতলে দেবার মতলব করছেন।"

তরুণীটি এবার সলজ্জ দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ভাবে আমার দিকে তাকালো। হ্যারিকেনের সেই ঝাপ্‌সা আলোয় তার সেই ভীরু চোখ দুটো দেখলাম। যেন কত অপরাধী। আমি আহত হলাম। তরুণীটি তেমন ঘুম জড়ানো কণ্ঠে অপরাধীর মত বললো, "ভয়ানক মাথা ধরেছে। বোধহয় জ্বর হয়ে থাকবে। সুস্থভাবে বসে থাকার মত হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। ওঃ—"

ফিস্‌ফিসানীর একটা মোহ আছে। আর তা যদি নারী পুরুষের মাধ্যমে হয়। বিশেষ করে তরুণ বয়সের মধ্যে এর প্রভাব বড় বেশী। আমারও ঠিক তাই হয়েছিল। আমি আমার পা দুটো যথাসম্ভব কোলের দিকে গুটিয়ে নিয়ে সুমুখের দিকে খানিকটা জায়গা করে দিলাম। বললাম, "এখানে কোন রকমে শুয়ে পড়ুন। শরীর অসুস্থ তা আগে বলতে হয়।"

তরুণীটি দ্বিরুক্তি না করে আমার দিকে ফিরে শুয়ে পড়লো। উঃ আঃ এসব অস্ফুট কাতরোক্তি গুলো বেড়েই গেলো যেন। আমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেও কিছু বলতে যেন বাধলো। কারণ আমার চেয়ে ওর আত্মীয় বা সঙ্গীদের সহানুভূতি থাকা বেশী প্রয়োজন।

কিন্তু সামাজিক এই ভদ্রতাটা আমার কাছে বেশী সময় টিকলো না। জিজ্ঞেস করলাম, "কষ্ট হচ্ছে খুব? মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি?"

"—হ্যাঁ"—খুব ক্লান্তকর জবাব একটা।

আমি কোন কিছু চিন্তা না করে বলে ফেললাম,—"মাথাটা টিপে দেবো কি?"

তরুণীটি এবার কোন জবাব দিল না। বরং গায়ের কাপড়টা আরো একটু টেনে দিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে রইলো। আমি লজ্জিত হলাম।

অপরিচিতা, অনাত্মীয়া, তায় অবিবাহিতা তরুণী। অনধিকার চর্চ্চা করে বসলাম না তো? লজ্জিত হয়ে চুপ করলাম।

কয়েক মুহূর্ত্ত পর আবার সেই অস্ফুট আর্তনাদ। তির্যক দৃষ্টিতে তাকালাম এবার।

"দিন না একটু হাত বুলিয়ে। বুড়ো ঠাকুমা, জাগিয়ে আর কাজ নেই। শোয়ার জায়গা যখন দিলেন, তবে দক্ষিণাও শোধ দিন!"

আমি ধীরে ধীরে তরুণীটির কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

'আঃ—"একটা স্বস্তির মৃদু কণ্ঠ। আমার দ্বিধাগ্রস্থ অন্তরটা মুহূর্ত্তে স্বচ্ছ হয়ে উঠলো।

মুড়ি আর তেলে ভাজা শেষ করে সুশান্ত নিখিলেশকে চা আনতে বললো। নিখিলেশ উঠে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম সহ দোকানের ছেলেটাকে সঙ্গে এনে হাজির হলো। সুশান্ত চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

নিখিলেশ বললো, "তারপর?"

তারপর বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ওরও বোধ হয় স্বস্তিতে তন্দ্রা এসে থাকবে। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমার হাতটা ওর কপালেই থেমে ছিল। সচেতন হলাম হাতে মৃদু চাপ অনুভব করে।

তেমনি মৃদু কণ্ঠের জিজ্ঞাসা—"ঘুমিয়ে পড়লেন না কি?"

"বোধ হয়।" —ওরই মত ফিস্ ফিস্ করে জবাব দিলাম আমি। তেমনি ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মাথা ধরাটা এখন কেমন?"

"একটু কম। কিন্তু মাথাটা বড্ড ভারী লাগছে।" বলে আমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের গণ্ডের উপর চেপে ধরলো। তারপর ধীরে ধীরে তেমনি নিচুস্বরে বললো,—"পূর্ব্ব জন্মে বোধকরি আপনি আমার আপনজন ছিলেন। তাই একটু দয়া পেলাম।"

"এজন্মে তবে বাধাটা কোথায়?" এ্যাক্টরের মুখ। না বলে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম না যে এটা ষ্টেজ নয়। বা ও-ও আমার কো-এ্যাক্টর নয়। আর দাবীটাও সঙ্গত কিনা। কিন্তু পরক্ষণে সন্দেহ আর রইলো না। আমার হাতটায় চুম্বন স্পর্শ অনুভব করলাম। শিউরে উঠলো আমার স্নায়ু তন্ত্রী। সুপ্ত যৌবন যেন মূহুর্ত্তে উদ্বেল হয়ে উঠলো লালসার উদগ্র কামনায়। ভাবলাম না এমন আবার হয় না কি? প্রেমের প্রবাহ কি এমনি করেই সৃষ্টি হয় না-কি? শুধু অন্ধ আকাঙ্ক্ষা, প্রতিদানের ইচ্ছায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ভুলে গেলাম বিচার, বিবেচনা, শিক্ষা, দীক্ষা, সামাজিকতা, ভদ্রতা। নিস্তব্ধ রজনীর কুয়াশাবৃত অন্ধকারে রাতজাগা এই দুটি জীবনেরই অস্তিত্বকে অনুভব করলাম শুধু। আর যেন সব কিছু নিঃসীম অন্ধকারে অবলুপ্ত। সেই অসীম জলায়তনের ছায়াচ্ছন্ন বুকে অন্ধকারের সুযোগে আমার মুখটা নেমে এলো ওর তপ্ত ঠোঁটের উপর।

একটু চুপ করলো সুশান্ত। তারপর সিগারেটের শেষ টুকরোটা চায়ের খালি কাপে গুঁজে দিল।

প্রবীর শুধালো। "তারপর ? তারপর কি বললো মেয়েটা ?"

আপত্তির কথা বল্‌ছিস্ ? "না-না, আপত্তি সে করেনি। বরং সমর্থন পেলাম তার চুম্বনের একাগ্রতায়।" —বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুশান্ত।

কুনাল বললো, "এ্যাতোটা যখন ; তাহলে বিয়ের প্রস্তাবটা করলে না কেন ?"

"—তাই করবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কিছু বলার আগেই ও বললো, "এই দুষ্টুমি হচ্ছে বুঝি ?"

আমি বললাম "প্রশ্রয় দিলে কেন ? এবার তবে সঙ্গী করে নাও।"

ও বলেছিল,—"সে তো তুমিই নেবে। আমি চলবো তোমার পেছন পেছন।"

সুশান্ত আবার একটু থামলো। বোধকরি একটা গভীর ব্যাথা চাপবার চেষ্টা করতে লাগলো।

শশীশেখর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে উঠলো, "আরে বাবা যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফ্যাল। আবার ঢোক্ গিলিস্ কেন ?"

"না-না, তারপর তো বড় কিছু হয়নি শশীভাই। হয়েছিল সকরুণ একটা নির্ম্মম হাহাকার। যা এখনো সমস্ত বুক জুড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে রয়েছে।"— বললো সুশান্ত।

কুনাল বললো, "যা বলার তাড়াতাড়ি বলে দাও সুশান্তদা। ধানাই পানাই আর ভালো লাগে না।"

কি হয়েছিল জানিস্ ? আমি অবশ্য চোখে দেখিনি। অবশ্য কেউ তা দেখে না। শুধু অনুভব ক'রে বোঝে। আমি স্বেচ্ছাসেবক আর ডাক্তারের মুখে শুনে শুনে তাই বুঝেছিলুম। শুনেছিলাম একটা ষ্টিমারের সঙ্গে আমাদের নৌকাটা ঘাটে ভিড়বার সময় ধাক্কা খেয়েছিল। তাতে সবাই সাগরের বুকে।

অনেকের সঙ্গে আমিও অজ্ঞান হয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলাম। আর মেয়েটি আমার কণ্ঠ লগ্ন হয়েছিল। সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা অনেকের সঙ্গে আমাদের দেহ দুটো উদ্ধার করে ওখানকার হাসপাতালে চালান করে দিয়েছিল। ডাক্তার আর স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টায় আমার জ্ঞান ফিরেছিলো। কিন্তু যে দেহটা আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল, তার আর জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তার আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "উনি আপনার—" অবশ্য কথা শেষ না করে লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করলেন।

আমি শুধু নির্ব্বোধ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি কি বুঝেছিলেন জানিনা। বলেছিলেন,—"দুর্ভাগ্য এঁকে বাঁচানো গেল না।" ক্লাবের সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। কেবল বাইরে পুবে হাওয়ার সাথে মিতালী করে বৃষ্টি ধারা বয়ে চলেছে অবিরাম ধারায় একটানা।

।। সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ঃ ফ্র্যাঞ্জ কাফ্‌কা ।।

রণজিৎ কুমার সেন

ফ্র্যাঞ্জ কাফ্‌কা সাম্প্রতিককালে জয়েস, প্রাউস্ট, ইয়েট্‌স, রিল্‌কে, এলিয়ট প্রভৃতির মতো সাহিত্যসচেতন অনেকের মুখে প্রায়শঃই উচ্চারিত হন। কিন্তু এঁদের কারুর মতই তিনি জীবদ্দশায় বিশেষ জনস্বীকৃতি পাননি। জার্মান লেখকদের কেউ কেউ তাঁদের সমসাময়িককালে তাঁকে চিনতেন মাত্র। ১৯৩০-এ তাঁর কোনো-একটি বইয়ের ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ পায় আমেরিকায়। এটা ঘটে কাফ্‌কার মৃত্যুর ৬ বছর পর। বইটির নাম 'The Castle'; কাফ্‌কার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির একটি। কিছু বিদগ্ধ পাঠক এ বই পাঠ ক'রে কাফ্‌কার সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে মোটামুটি খানিকটা ধারণা করতে পারে; এবং ১৯৩৭ সাল নাগাদ যখন তাঁর 'The Trial' প্রকাশ পায়, তখন তার রহস্যময় ও বিহ্বলকারী বিষয়বস্তু অনেকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। এতে পাঠকেরা তাঁর রচনার গুরুত্ব সম্পর্কে যতটা না সচেতন হন, ততোধিক চমকিত হন। বলা যায়, তখন থেকেই বিশ শতকের ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে কাফ্‌কার রচনা বৃহৎসংখ্যক পাঠকের কাছে গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়। বহু ভাষায় তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা প্রকাশ পায়, এবং দেখা যায়—নব্যকালের বহু স্পর্শকাতর প্রবীন ও নবীন লেখক উপন্যাসের প্রচলিত ধারা অতিক্রম ক'রে কাফ্‌কার রীতি গ্রহণে কিছু উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। যেমন—বাংলা সাহিত্যের 'বনফুল' প্রমুখ কিছু লেখক। বলতে বাধা নেই যে, ফিলিপ র‍্যাভের (Philip Rahv) লেখায় তাঁর বিষয়ে আমরা আশানুরূপ অনেকখানি উল্লেখ পাই। প্রসঙ্গতঃ কাফ্‌কা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন: 'A master of narrative Tone, of a subtle, judicious, and ironically conservative style, Kafka combines in his fiction the real and the unreal, extreme subjectivity of content with forms rigononsly objective, a lovingly exact partrayal of the factual world with dreamlike dissolution of it. By unifying these contrary elements he was able to achieve a fundamentally new appropriation of the resources of the prose medium.'

ফিলিপ র‍্যাভ ১৯৭৩-এর ২৩শে ডিসেম্বর ৬৫ বছর বয়সে বোস্টনে মারা যান। তাঁর জন্ম ১৯০৮ সালে। রুশ ও ইহুদী বাপ-মায়ের সন্তান Ivan Greenberg—'Philip Rahv' নাম গ্রহণ করেন—যখন তিনি আমেরিকায় কম্যুনিষ্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পিতামহী ছিলেন রক্ষণশীল পরিবারের ধর্মপ্রাণ মহিলা; এই ভাবটি গ্রীনবার্গের মায়ের মধ্যেও অনেক পরিমানে ছিল। 'Rahv'-এর হিব্রু অর্থ –Rabbi, অর্থাৎ ইহুদী ব্যবস্থাশাস্ত্রের ব্যবস্থাপক

বা অধ্যাপক। এ নামের সঙ্গে প্রচলিত মার্কিন নামের কোনো মিল নেই। আমেরিকায় ইহুদি কম্যুনিষ্টদের অনেকেই এ ধরণের নাম ব্যবহার করতো। তাঁর 'An Introduction to Kafka' আমাদের কাছে কাফ্‌কা সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত তথ্য তুলে ধ'রে তাঁর বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে অনেকটা সাহায্য করেছে।

ঔপন্যাসিক গ্রাহাম গ্রীণ (Graham Greene) মন্তব্য করেছেন : 'Every creative writer worth our considerations, every writer who can be called in the wide sense of the term a poet, is a victim : a man given over to an obsession. Kafka's obsession was an inordinate sense of inadequsecy, failure, and sinfulness—a sanefullness corresponding to nothing he had actually done or left undone, but lodged in the innermost recesses of his being '

জার্মান সমালোচক ফ্রাঞ্জ ব্লেই (Franz Blei) ছিলেন কাফ্‌কার খুবই ঘনিষ্ঠ। কাফ্‌কা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন : '...the servant of a God not believed in ?' —এরকম ঈশ্বরনিষ্ঠ অথচ ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন বা অবিশ্বাসী মানুষ একেবারে দুর্লভ নয় পৃথিবীতে। —অনেক সময় ঈশ্বরচেতনায় মগ্ন থেকেও মাঝে মাঝে তিনি বড়বেশী সংশয়বাদী হয়ে উঠেছেন। ঈশ্বর থেকেও তাঁর কাছে নেই ; অর্থাৎ মনে মনে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি ক'রেও তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন : তাঁকে দেখা যায় না, তাঁকে পাওয়া যায় না। —কাফ্‌কার জীবনে পরম সংসারের মতো এ ছিল এক পরম জিজ্ঞাসা! তারই আভাস ফুটে উঠেছে তাঁর দু'টি পরিপূরক গ্রন্থ—'The Castle' ও 'The Trial'-এ।

১৮৮৩ সালে কাফ্‌কা (Franz Kafka) প্রাগের এক মধ্যবিত্ত চেক-ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবন থেকেই তিনি কেমন যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নিজেকে বহু অপরাধের সমষ্টিগত একজন বলে মনে করতেন। ১৯০৬ সালে তিনি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একটি এ্যাক্সিডেন্ট্‌ ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানীর অফিসে একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর মনঃপুত ছিলনা। এসময়ে তাঁর 'রিপোর্টেজ' জাতীয় কিছু রচনা গদ্যসাহিত্যে এক নতুন স্বাদ নিয়ে আসে। আসলে তাঁর মন ছিল সৃষ্টিশীল রচনায় নিবদ্ধ। এর পিছনে ছিল তাঁর নৈতিক একনিষ্ঠতা, উদ্যম ও ধর্মীয় বোধ। তাঁর নানা চিঠিতে তাঁর যে মানসিকতা প্রকাশ পায়, তাতে দেখা যায়—সাহিত্যে তাঁর লেখনী ধারণের মূলে ছিল সুখী হবার ও জীবনে পূর্ণতা পাবার আগ্রহ। তাঁর লোকপরিবৃত অবস্থার কথা মনে হলেই নিজের মধ্যে সমাধিভাব জাগতো, কারণ কারুর কাছ থেকেই তিনি কোনো

প্রসন্নতা বা রচনাসৃষ্টির কোনোরকম প্রেরণা পেতেন না। পরবর্তীকালে তিনি ইহুদী-লোকসাহিত্য, হিব্রুভাষা ও তালমুদ পাঠ ক'রে নিজের উপযোগি কিছু যুক্তিবিচার ও স্টাইল রপ্ত করবার অবকাশ পান এবং ইহুদী জীবন সম্পর্কে অনেকটা উৎসাহী হন।

তাঁর জীবনে দু'বার প্রেম আসে। ১৯১২ সালে বার্লিন থেকে এক অদ্ভুত রোমান্স নিয়ে আসে ফেলিস বী (Felice B) নাম্নী এক তরুণী। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কাফ্‌কা তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হন। কিন্তু দু' দু'বার তার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেও বঞ্চিত হন। ফলে এক অদ্ভুত ঘৃণায় ও বিদ্বেষে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে; তিনি মনে করেন—নিজের স্বাধীন সত্তা রক্ষা ক'রে শিল্পচেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বিয়ে করা চলে না।

সেই বছরই তাঁর সৃষ্টিকর্মে এমন দ্যোতনা আসে যার ফলে তিনি স্বকীয় ফর্মে কাহিনীমূলক 'The Judgement' গ্রন্থটি রচনা করতে সক্ষম হন—যার গভীরে থাকে পিতা ও পুত্রের সংগ্রাম। তাঁর পরবর্তী বড় আকারের দুটি বই হচ্ছে 'Amerika' ও 'The Metamorphosis.' এই দুটি গ্রন্থে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও কাহিনী গ্রন্থনের সুচারুতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। 'Amerika' গ্রন্থ রচনার মূল সূত্র নিহিত রয়েছে বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্‌লিনের-আত্মজীবনীতে। এতে আমেরিকার বহিরাঙ্গিক চিত্রের চাইতে অন্তরঙ্গ 'Symbolic' চিত্রটিই বেশী ফুটেছে।

এসব রচনার বহুপূর্বে কাফ্‌কা তাঁর বন্ধু ওস্কার পোলককে (Oskar Pollak) রচনা সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণার কথা একটি চিঠিতে উল্লেখ ক'রে লেখেন; '…the books we are need of the kind that act upon us like misfortune, that make us suffer like the death of some one we love more than ourselves, that make us feel as though we were on the verge of suicide, or lost in a forest remote from all human habitation—a book should serve as the ax for the frozen sea within us.'

মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে কিন্তু কাফ্‌কার এ উক্তি বিশেষ মেলে না। ১৯১৪-র নভেম্বরে তিনি লেখেন—'In the Penal colony; এ বই তাঁর 'The Trial' গ্রন্থের প্রায় সমকালে রচিত। ১৯২৪ সালের জুন মাসে মাত্র ৪১ বছর বয়সে এই বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পী কাফ্‌কা কণ্ঠনালীপ্রদাহজনিত যক্ষ্মায় মারা যান।

হের ব্রডের (Her Brod) 'The Kingdom of love' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হচ্ছে রিচার্ড গার্টার। কাফ্‌কার জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে এই চরিত্রটির মিল আছে। বলা যায়—কাফ্‌কার জীবন থেকেই এই চরিত্রটি এসে রূপ পেয়েছে রিচার্ড গার্টারে। অতীন্দ্রিয়তা ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্ঘাত ও প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ কাফ্‌কার লেখনীতে প্রশ্রয় পেয়ে পরোক্ষে হের ব্রডের মতো কিছু লেখককে তাঁদের গল্প-উপন্যাসের নায়ক-সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে, সন্দেহ নেই। অনেক সময়

অনেকের মতে কাফ্‌কা বড়বেশী স্ববিরোধী বলে মনে হলেও আসলে নিজের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মনে কোনোরকম দ্বিধা ছিল না। মানুষের জীবনের পূর্ণ ইচ্ছা পুরণে যে অনিবার্য ব্যর্থতা—তা নিয়তির অধীন; তাকে পরিহাসে ও ব্যঙ্গে প্রকাশ করাই কাফ্‌কার সৃষ্টিরীতির অন্যতম টেক্‌নিক। এক শ্রেণীর ভাববাদি মানুষ জীবনকে এইভাবেই গ্রহণ ক'রে সমস্ত দুঃখ-বেদনার সাঁকো পেরিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়ে থাকেন। স্বল্পতম জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে কাফ্‌কার চরিত্রে এমন কিছু আভাস কেউ কেউ অবশ্যই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। তাঁর জীবনের উপর দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে যায়। শতাব্দীর এই সভ্যতা তাঁর মনে কোনো আশার বাণী বয়ে আনতে পারেনি! কাফ্‌কা তাই একে বিশোষিত করেন সারমেয়ধর্মী পাশবিক সভ্যতা রূপে। তাঁর এসময়ের বিখ্যাত ব্যঙ্গ গল্প 'Bucket Rider' গড়ে ওঠে Severe want of coal and food-কে কেন্দ্র ক'রে। পরে এই গল্পটি তাঁর 'The Great wall of china' সঙ্কলনে স্থান পায়। কিন্তু গোড়া থেকেই কাফ্‌কার জীবনাদর্শের যে জিনিষটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে, তা হচ্ছে নীতিবোধ ও অধ্যাত্মচেতনা। মানুষের জীবন যে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই শক্তির নির্দেশিত পথেই যে মানুষের জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক—অভিযাত্রা, এই দর্শনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কোনো বিশেষ আলোচকের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলতে হয়: কাফ্‌কা কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য মহৎ হননি। তাঁর মহত্ত্ব সমস্যাকে চিন্তাক্ষেত্রে পৌঁছে দেবার জন্য কল্পনার রঙে রঞ্জিত ক'রে তাকে প্রকাশ করবার জন্য। একমাত্র তিনিই এমনতরো এক প্রয়াসে তদানীন্তন সময়ে ব্রতী হয়েছিলেন। কাফ্‌কার সকল রচনায় তাই বিমূর্ত সত্তার কল্পনা ও মানবজীবনের জটিলতার সংমিশ্রণ।

ভাষা, প্রকাশ-ব্যঞ্জনা, শব্দপ্রয়োগ ও চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও কাফ্‌কার অভিনবত্ব ছিল লক্ষ্য করবার মতো। সমকালীন বহু খ্যাতিমান লেখক থেকেই তা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রুচিবান ও মানসিকভাবে সুস্থ লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র সত্তায় উল্লেখিত একজন। অথচ বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি অনেক লেখকের মতই অধিক ডক্কানিনাদিত লেখক নন্। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও ধর্মীয় বোধ তাঁকে বৃহৎ জনতার দরবারে নিয়ে না পৌঁছালেও তাঁকে এমন একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল—সে সম্পর্কে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন না। তাঁর মনটি ছিল দুঃখবাদী মরমীয়াদের মতো। তাই যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি, তার সামাজিক বা জাগতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। 'কি হবে এসব দিয়ে?' 'এহো বাহ্য: আগে কহ আর' —এই জাতীয় একটা মানসিকতা অনেক সময় তাঁকে উদভ্রান্ত করেছে—যেমন উদভ্রান্ত করে কোনো ঈশ্বরসন্ধানীকে।

যে জার্মানীর মানুষ কাফ্‌কা, সেই জার্মানীরই পূর্বসূরী বিখ্যাত দুই দিকদর্শী দার্শনিক কান্ট ও কার্ল-মার্ক্স। একদিকে অধ্যাত্মবাদ ও অপরদিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—তাঁদের এই উভয় দার্শনিক দিক সম্পর্কেই কিছু স্পষ্ট ধারণা কাফ্‌কা রাখতেন। কিন্তু নিজেকে তিনি সর্বদা একটি স্বতন্ত্র চিন্তার জগতে

সরিয়ে রাখার প্রয়াসী ছিলেন—যদিও সে-প্রয়াস সর্বাংশে সার্থক হয়নি। তাঁর সমকালীন লেখক বুনিয়ন বিখ্যাত হন তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'Pilgrims Progress' রচনা ক'রে। আর তারই প্রায় সমধর্মী গ্রন্থ কাফ্‌কার 'The Castle' তখন ভবিতব্যের ভাগ্যলিপির অধীন।

আয়ুর শেষ পর্যায়ে কফ্‌কার জীবনে আর একবার প্রেম আসে। ডোরা ডাইমণ্ট্‌কে বলা যায় মৎস কন্যা। এসে নিজেকে উজার ক'রে দেয় কাফ্‌কাকে। কিন্তু তাকে নিয়েও ঘর বাঁধা সম্ভব হলো না কাফ্‌কার পক্ষে। দুরারোগ্য ব্যাধি তখন তাঁকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

তাঁর জীবদ্দশায় নিজের ইচ্ছানুযায়ী কালের বিচারে মহনীয় বৃহৎ কোনো রচনা তিনি সৃষ্টি ক'রে যেতে পারেননি; এমন কি তিনটি উপন্যাসই তিনি অসম্পূর্ণ রেখে যান। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ম্যাক্স্‌ ব্রডকে (Max Brod) লিখিত এক চিঠিতে অনুরোধ করেন—তাঁর যাবতীয় পাণ্ডুলিপি সে যেন পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু ম্যাক্স ব্রড সে-কথা রাখেননি। তিনি বন্ধুর যাবতীয় রচনা বিশেষ যত্নের সঙ্গে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সম্পাদনা ক'রে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরকম বন্ধুর সংখ্যাই বা সাহিত্যের ইতিহাসে ক'টি মেলে? ম্যাক্স ব্রডের জন্যেই কাফ্‌কা এখন বহুলাংশে জনসমাজে সমাদৃত। ফিলিপ র‍্যাভের কথায়—যদিও তিনি ছিলেন 'an artist of neurosis', কিন্তু he succeeds in incorporating his private world into the public world we all live in.'

ভালবাসার রূপ

জগত দেবনাথ

আমার জীবন যখন
পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে উঠে
দেহের ঠিক মাঝা-মাঝি এসেছে
তখনই আমাকে একটা রোগে ধরেছে ;
এবং তোমাকেও।
তারপর থেকে সমস্ত স্বাতন্ত্রবোধ
ভুলে আমরা
দু'জন একাকার হলাম।

এক সত্তা, এক মন, এক প্রান—
একাত্মতাই নাকি ভালবাসার সার্থক রূপ।
অবিচ্ছিন্ন থাকলে ভালোবাসবো কি করে ?

আমার আজ ফিরতে দেরী হবে
তুমি খেয়ে নিও
লোকে অসতী বলবে— ?
তা বলুক ॥

শেকল ছেঁড়া পাখী

কালীশঙ্কর মল্লিক

(নিউ দিল্লী)

কলকাতার এন্টালী এলাকায় করিম নওয়াজের নিজস্ব পৈত্রিক বাড়ী। আদি নিবাস হুগলী জেলায়। তিন পুরুষ ধরে কলকাতায় বাস। বয়স পঞ্চাশ। তিন ছেলে দুই মেয়ে। তিনি একটা ছাপাখানার মালিক।

বড় ছেলের বয়স চব্বিশ। এক বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। সে ছাপাখানায় বাবার কাজে সাহায্য করে। অন্য ছেলেমেয়েরা কলেজে ও স্কুলে পড়াশুনা করে। বড় মেয়ে নাজিমার বয়স আঠারো। স্কুল ফাইনাল পাশ করে বাড়ীতে বসে আছে। তার কলেজে পড়বার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু করিম মিয়া আর পড়াতে রাজী হননি। কারণ বিয়ের সময় উপযুক্ত পাত্র পাওয়া মুশকিল হবে। তার বিয়ের চেষ্টা চলছে। দু একটা সম্বন্ধ এসেছিল কিন্তু পাত্র পক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়নি।

সেদিন বম্বে থেকে করিমের নামে একটা চিঠি এলো। লিখেছে করিমের চাচাতো ভাই আবদুল মান্নান। আবদুল চিঠিতে লিখেছেন যে এখানে একটা ভাল পাত্র পাওয়া গেছে। আরব দেশের শেখ। প্রচুর পয়সার মালিক। সে এখানে বিয়ে করে স্ত্রীকে আরব দেশে নিয়ে যাবে। কোনো রকম দহেজ তো দিতে হবেই না উল্টে শেখ মেয়ের বাবাকে পঁচিশ হাজার টাকা নজরানা দেবে। যাবতীয় গয়নাগাটি পাত্রপক্ষই গড়িয়ে দেবে। তাতেও প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার মত খরচ পড়বে। নাজিমা আরব দেশে গিয়ে রাণীর হালে থাকবে। করিম যদি রাজি থাকে তাহলে শীঘ্রই যেন তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়। তাহলে তিনি সম্বন্ধ পাকা করে ফেল্‌বেন।

চিঠি পড়ে করিম খুব উল্লসিত হলেন। স্ত্রী ফরিদা বিবিকে ডেকে চিঠির কথা বলে বললেন বুঝলে বিবিজান, এ সম্বন্ধ হাতছাড়া করা মোটেই উচিত হবে না। শ্বশুরবাড়ীতে নাজিমা রাণীর হালে থাকবে। তাছাড়া আমরাও পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে যাবো। কোন দহেজ দিতে হবে না। গয়নাগাটিও দিতে হবে না। শুধু বিয়ের দিনে খাওয়ার খরচটা করতে হবে। খাওয়ার খরচ সাত আট হাজার টাকা ধরলেও সতেরো হাজার টাকা নীট্ হাতে থাকবে। সেই টাকা ছাপাখানায় ঢালতে পারলে ব্যবসায় লাভের অঙ্ক অনেক বেশী হবে। আমাদের মাসিক আয় অনেক বেড়ে যা'বে।

ফরিদা বিবি বললেন দেখ, একটা কথা ভুলে যেও না। আমরা বাঙ্গালী আর ওরা আরবী। ওদের সঙ্গে আমাদের কখনও মেলে। ওদের ভাষা আলাদা, চালচলন আলাদা।

করিম বললেন তাতে কী হয়েছে। নাজিমা আরবদেশে গেলে সেখানে তিনমাস থাকলেই দেখবে গড়গড় করে আরবী বলছে। আরবী ভাষা পবিত্র ভাষা। আরবী ভাষায় পবিত্র কোরাণ লেখা হয়েছে। তাছাড়া ওরাও মুসলমান আমরাও মুসলমান। চাল চলন তো প্রায় একই রকমের।

ফরিদা বললেন এটাও ভেবে দেখতে হবে ওখানে আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই। ওখানে কদিন থেকেই হাঁপিয়ে উঠবে। তাছাড়া আমারাও ওকে দেখতে পাব না। ওকেও এখানে কবে আসতে দেবে তার ঠিক নেই। মেয়ে আমাদের পর হয়ে যাবে। আমার তো মোটেই ইচ্ছে নয় যে আরব দেশে নাজিমার বিয়ে হোক।

করিম বললেন আজকাল কত মেয়েরই তো বিলেত আমেরিকায় বিয়ে হচ্ছে। ছেলেরা বিলেত আমেরিকায় চাকরী করছে। ওখানকার সিটিজেন হয়ে যাচ্ছে। শুধু আরব দেশ হলেই আপত্তি। তাছাড়া বিয়ে হলে মেয়ে তো পরের ঘরে যাবেই। মেয়ে পর হয়ে যাবে ওটা কোন যুক্তি নয়। তুমি আর আপত্তি কোরো না। আমি আবদুলকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি সে যেন সম্বন্ধটা পাকা করে ফেলে।

ফরিদা বললেন তুমি ব্যবসাদার মানুষ। তুমি সবেতেই শুধু লাভ লোকসানের হিসেব কষো। যেহেতু তুমি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পাবে সেহেতু তুমি মেয়েকে জলে ফেলে দিচ্ছ। মেয়েরও তো মন বলে একটা জিনিষ আছে। তার এ বিয়েতে মত আছে কী নেই সেটা তুমি তাকে জিগ্যেস করবে না?

করিম বললেন তুমি বাজে বোকো না। আমি নাজিমার বাবা। তার ভালমন্দ আমি বুঝি। নাজিমা ছেলেমানুষ। তার কী সাংসারিক বুদ্ধি আছে? সে বিয়ের পর রাণীর হালে থাকবে সেটাই তো বড় কথা। আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে কী হবে না সেটা কোন ব্যাপারই নয়।

ফরিদা বললেন তাহলে তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো। আমি কিছু জানি না।

এর বেশী কিছু বলতে তার ভয় করল কারণ মিয়াঁ যদি রাগের মাথায় তিনবার তালাক উচ্চারণ করে ফেলে তবে সত্যই তালাক হয়ে যাবে। এই ভয়টা তো ফরিদা বিবির মাথায় তরবারির মত সব সময় ঝুলছে।

নাজিমাকে ফরিদা বিবি এ সম্বন্ধের কথা বলতে নাজিমা প্রথমে আপত্তি করেছিল। কিন্তু যখন বুঝল তার আপত্তি টিকবে না তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হয়ে গেল।

করিম আবদুলকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আরবদেশের শেখের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী। আবদুল যেন দিনক্ষণ ঠিক করে তাকে জানিয়ে দেয়। আর পঁচিশ হাজার টাকাটা যেন বিয়ের আগেই দিয়ে দেয়।

দিন দশেক বাদে আবদুল করিমকে চিঠি দিয়ে বিয়ের তারিখ জানিয়ে দিয়ে লিখেছেন অমুকদিন আমরা বরকে নিয়ে কলকাতা রওনা হচ্ছি। সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হবে। কলকাতায় বিয়ে করে বর কনেকে নিয়ে আরব দেশে চলে যাবে।

পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিল কিন্তু করিম ফরিদা বিবিকে বললেন বুঝলে বিবিজান, এত বড়লোকের বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে এতে প্রতিবেশীরা হিংসায় জ্বলছে। ওদের কথায় কান দিলে চলে। আমার মেয়ে যাতে বিয়ের পর ভালভাবে থাকে সেটাই তো আমাদের দেখা কর্ত্তব্য।

যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল। শেখ নাজিমাকে নিয়ে কলকাতায় ভাড়া বাড়ীতে দিন সাতেক রইল। তারপর নাজিমাকে বাপের কাছে রেখে আরব দেশে চলে গেল। বলে গেল নাজিমার জন্য ভিসা পাশপোর্ট করতে মাস তিনেক সময় লাগবে। ওগুলো হয়ে গেলে সে নিজে এসে নাজিমাকে নিয়ে যাবে।

করিম পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে গেলেন। তাছাড়া শেখ নাজিমাকে ষাট হাজার টাকার গয়না উপহার দিয়েছেন। নাজিমা তো খুব খুশী। সাতটা দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল। ভাষার জন্য কিছুটা অসুবিধা হলেও সেটা খুব বাধার সৃষ্টি করেনি।

ভিসা পাশপোর্ট তৈয়ারী হতে মাস ছয়েক লেগে গেল। তারপর একদিন শেখ এসে নাজিমাকে নিয়ে প্লেনে চড়ে আরব দেশে চলে গেল।

আরব দেশে পৌঁছে নাজিমা শ্বশুর বাড়ী গেল। বিরাট দুর্গের মত বাড়ী। প্রচুর দাস দাসী। চার পাঁচ খানা মোটর গাড়ী। দিন পনেরো রঙীন স্বপ্নের মত কাটল। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশী দেরী হল না।

পনেরো দিন বাদেই তার আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হল। নাজিমা আরও অনেক খবর জানতে পারল। শেখের বয়স বাহান্ন। তার আরও তিনটে বিবি আছে। দুজন আরব দেশী ও একজন পাকিস্থানী। আরব দেশী বিবিরা নাজিমাকে দেখে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে আর হাসে। নাজিমা তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারে না।

একদিন একজন বাংলাদেশী দাসী তার ঘরে এসে বলল বহিন, যদি ভাল চাও তো এখান থেকে পালাও। নাহলে তোমাকে ক্রীতদাসীর মত সারাজীবন কাটাতে হবে। শেখ আমাকে বিয়ে করে এনেছিল। তারপর যেই আমি এখানকার নাগরিক হয়ে গেলাম, তখনই আমাকে তালাক দিয়ে দিল। আর আমি দাসীবাঁদী হয়ে গেলাম। আমি যে ভুল করেছি তুমি যেন সেই ভুল করো না। খবরদার এখানকার সিটিজেনশীপ নিও না। তাহলে তুমি এদেশ ছেড়ে আর কোনদিনও ভারতে ফিরতে পারবে না। এদেশে ছমাস হয়ে গেলেই তোমাকে সিটিজেনশীপ নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। তুমি নানা অজুহাতে কাটিয়ে দেবে। আমি সিটিজেনশীপ নিয়ে

ফেলেছি বলে এদেশ ছেড়ে আর বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারব না। ভিসা পাসপোর্ট নিয়ে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে।

এর মাসখানেক বাদে নাজিমা শুনল বাংলাদেশী বিবিকে শেখ অন্য একজন শেখের কাছে অনেক টাকার বিনিময়ে বিক্রী করে দিয়েছে। খবরটা শুনে সে খুব ভয় পেয়ে গেল। কয়েকদিন বাদেই নাজিমার ওপর ঘরদোর ঝাড়া মোছার কাজ দেওয়া হল। বাংলাদেশী বিবিকেও ওই কাজ দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন বাদ থেকে জামা কাপড় সাবান দিয়ে কাচা ও ইস্ত্রী করার কাজও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল।

নাজিমা বুঝল এখানে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে কোন লাভ হবে না। সেজন্য সে মুখ বুঁজে সব কাজ করে যেতে লাগল। তার মনে কোন শান্তি নেই। বাড়ীটা তার কাছে মনে হত যেন জেলখানা। কতদিন যে মাছভাত খেতে পায়নি তার ঠিক নেই।

রোজই দুতিন বার করে শক্ত শক্ত মোটা মোটা রুটি আর মাংস, একই খাবার খেয়ে খেয়ে তার অরুচি হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিবাদ করবার কোনও উপায় নেই। তাছাড়া রুক্ষ মরুভূমির দেশ। সকাল দুপুরে অস্বাভাবিক গরম আর রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা। শেখের ঘরগুলো শীততাপনিয়ন্ত্রিত। অন্যসব ঘরে পাখার ব্যবস্থা, কিন্তু জোরে পাখা চালালে মনে হয় যেন আগুনে শরীর ঝল্‌সে যাচ্ছে। যখন কোন কাজকর্ম থাকেনা তখন নাজিমার কলকাতার কথা মনে পড়ে। যদিও তাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না তবুও মনে শান্তি ছিল। এখানে তার আপনজন বলতে কেউ নেই। সে যেন একটা বস্তু বিশেষ! আর কমাস বাদেই শেখ তাকে অন্য কারো কাছে বিক্রী করে দেবে। এখন তার একমাত্র কামনা কীভাবে এখান থেকে কলকাতায় পালান যায়। কিন্তু তার এই কামনা সে কাহারো কাছে ব্যক্ত করেনি। যে যা হুকুম চালিয়েছে সেটা তখনই সে করে দিয়েছে। এজন্য সে ওখানকার লোকজনদের কিছুটা বিশ্বাস অর্জন করেছিল।

এইভাবে পাঁচমাস কেটে গেল। আর এক মাস কেটে গেলেই তাকে আরব দেশের সিটিজেন করে নেবে। তখন আর পালাবার কোন উপায় থাকবে না। বিনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তার দিন কাটতে লাগল।

একদিন সুযোগ এসে গেল। শেখ কয়েকদিন বাদেই কোন কাজের ব্যাপারে বোম্বাই যাবে। নাজিমা এটা জানতে পেরে শেখের কাছে আর্জি জানাল যেন তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। বাবা, মা, ভাইবোনদের জন্য মন বড়ই উতলা হয়ে রয়েছে। শেখ যদি মেহেরবাণী করে তাকে একবার তার বাপের বাড়ী ঘুরে আসবার সুযোগ দেন তবে সে অত্যন্ত বাধিত হবে।

শেখ ভেবে দেখল সঙ্গে একজন মেয়েছেলে থাকলে তার অনেক সুবিধা হবে। কারণ বিদেশ বিভূঁই জায়গায় তার হঠাৎ শরীর খারাপ করলে তার সেবা শশ্রূষা করতে পারবে। নাজিমা অত্যন্ত বাধ্য বলে শেখের বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিল। শেখ নাজিমাকে সঙ্গে নিতে রাজী হল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নাজিমা শেখের সঙ্গে বোম্বাই পৌঁছল। বোম্বাইতে তারা একটা পাঁচতারা হোটেলে উঠল। একদিন থাকার পরই শেখ সকাল এগারোটা নাগাদ কাজের ব্যাপারে হোটেল থেকে বেড়িয়ে গেল। নাজিমাকে বলে গেল তার ফিরতে রাত হবে। নাজিমা সুযোগ বুঝে হোটেল থেকে বেড়িয়ে একটা ট্যাক্সি চড়ে সোজা চলে গেল রেলওয়ে ষ্টেশন। সেখানে অনেক কষ্টে দালালকে টাকাকড়ি দিয়ে হাওড়াগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের একটা চেয়ার কারের টিকেট জোগাড় করে ট্রেনে উঠে বসল।

তার সঙ্গে ছিল একটা ছোট সুটকেশ। তাতে কিছু জামা কাপড় ও কিছু গয়না ছিল। সব গয়না সে আরব দেশ থেকে আনতে পারেনি।

তার পরের দিন সকালে নাজিমা তার বাপের বাড়ীতে এসে পৌঁছল। নাজিমার বাবা মা, ভাইবোনেরা তাকে দেখে খুব আনন্দিত হল ও খুব আদর আপ্যায়ন করল। কারণ তারা জানে নাজিমা এখন ধনীলোকের বিবি। কিন্তু তারা যখন শুনল সে কিভাবে পালিয়ে এসেছে তখন করিম মিয়াঁ খুব রাগারাগি করল। কিন্তু ফরিদা বিবি মেয়ের প্রতি খুব সহানুভুতি দেখাল। ভাইবোনেরাও বোনের এই দুঃখ কষ্ট শুনে নিজেরা খুব দুঃখিত হল। শুধু করিমই মেয়ের বিরুদ্ধে মত দিল। তিনি আবার মেয়েকে শেখের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করল।

নাজিমা বলল তাকে যদি আবার শেখের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয় তবে সে আত্মহত্যা করবে।

ফরিদা বিবি করিমকে বললেন তুমি কী কষাই? নিজের মেয়েকে সামান্য টাকার লোভে মেরে ফেলতে চাও?

অবশেষে মেয়ের কান্না শুনে ও নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের মতামত শুনে করিম মিয়াঁ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন ঠিক আছে নাজিমা এখানেই থাকবে। ওকে আর শেখের কাছে পাঠাব না। ওর সঙ্গে কোর্টে তালাক দেবার ব্যবস্থা করব। তবে নাজিমা যখন পালিয়ে এসেছে তখন শেখ নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়েছে। আর আজই হয়ত পুলিশ এখানে অনুসন্ধান করতে আসবে। আমি এখনই একজন এ্যাডভোকেটের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে আসি।

করিম নাজিমাকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ারই একজন এ্যাডভোকেট মুহম্মদ আলীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে গেল।

মুহম্মদ আলী নাজিমার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন নাজিমা যখন এখনও আরব দেশের সিটিজেন হয়নি তখন আরব দেশের আইন কানুন ওর ওপর প্রযোজ্য হবে না। তবে

আজই কোর্টে ডাইভোর্সের পিটিশন করে দিতে হবে। তাহলে শেখ আর নাজিমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

প্রথমে করিম মিয়াঁ তালাক দেবার ব্যাপারে একটু ইতঃস্তত: করেছিলেন কিন্তু নাজিমা এই সিদ্ধান্তে অটল রইল। তখন করিম মিয়াঁ ডাইভোর্স পিটিশনে সম্মতি দিলেন।

এ্যাডভোকেট মুহম্মদ আলী তখনই একটা ডাইভোর্স পিটিশন তৈয়ারী করে নাজিমাকে সই করতে বললেন। নাজিমা সই করে দিলে মুহম্মদ আলী, করিম ও নাজিমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে ডাইভোর্স পিটিশন ফাইল করে দিলেন।

ওদিকে বোম্বাইতে শেখ অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে নাজিমাকে দেখতে না পেয়ে ম্যানেজারকে তলব করে নাজিমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ম্যানেজার অনেক খোঁজ খবর করে জানতে পারলেন যে নাজিমা বিবি সকাল বারোটা নাগাদ একটা ছোট স্যুটকেশ হাতে করে বেড়িয়ে গেছেন। তারপর আর হোটেলে ফিরে আসেনি। তখন শেখ ম্যানেজারকে পুলিশে খবর দেবার জন্য অনুরোধ করল। ম্যানেজার স্থানীয় থানায় ফোন করলে অনেক রাত্রে পুলিশ এসে তদন্ত করে গেল। নাজিমার বাপের বাড়ীর ঠিকানাও নিয়ে গেল। বলে গেল আগামীকাল কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ব্যবস্থা করবে। শেখের ভাবনার কোন কারণ নেই।

পরদিন বোম্বাই পুলিশ কলকাতায় লালবাজর পুলিশ ষ্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাজিমার বাপের বাড়ীর ঠিকানা বলে দিল। নাজিমা কী রকম দেখতে, কত বয়স প্রভৃতিও বলে দিল।

করিম মিয়াঁ ও নাজিমা যখন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বাড়ী ফিরে এলো তখন দেখল একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ও একজন পুলিশ কনষ্টেবল তাদের বৈঠকখানা ঘরে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর তখন করিম মিয়াঁকে তাদের আসার কারণ বলল ও নাজিমাকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে পালিয়ে এসেছে।

নাজিমা তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করল ও বলল যদি তাকে জোর করে শেখের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করা হয় তবে সে আত্মহত্যা করবে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর ডাইভোর্স-পিটিশনের কপি দেখে বললেন যখন হাইকোর্টে ডাইভোর্স-পিটিশন ফাইল হয়ে গেছে তখন আমাদের আর কিছু করার নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। পুলিশ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। এখন এটা হাইকোর্টের এক্তিয়ারে।

তাঁরা চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে বোম্বাই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা ডাইভোর্স পিটিশনের কথাটা শেখকে জানিয়ে দেবেন।

বোম্বাইতে শেখ যখন জানতে পারল যে নাজিমা কলকাতা হাইকোর্টে ডাইভোর্স পিটিশন ফাইল করেছে তখন বুঝতে পারল পাখী শেকল ছিঁড়ে উড়ে গেছে আর তার কাছে ফিরে আসবে না। সে বোম্বাই থেকেই আবার আরব দেশে ফিরে গেল। কলকাতাতে আর এলো না।

মাস ছয়েক বাদে কলকাতা হাইকোর্টে নাজিমা ডাইভোর্সের এক তরফা ডিক্রী পেয়ে গেল।

ডাইভোর্স হয়ে যাবার পর নাজিমা আনন্দে ফরিদা বিবিকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করল।

ফরিদা বিবি বললেন তুই কিছু ভাবিস না। আমরা আবার তোর বিয়ে দেব।

নাজিমা বলল আমি কিন্তু ভারত ছেড়ে আর কোথাও যাব না। আমাকে যেন ভারতের মধ্যেই কোথাও বিয়ে দেওয়া হয়।

ফরিদা বিবি বললেন বেশ, তাই হবে।

আগমনী

মধুসূদন গোস্বামী (বীরভূম)

নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসল রে—
বছর পরে উমা-রাণী বাপের বাড়ী আসল রে,
নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসল রে ॥

শিউলী ঝরে পথের 'পরে—
কাশের চামর হাওয়ায় নড়ে,
খুশির জোয়ার ঘরে ঘরে
(সবাই) নতুন সাজে সাজল রে।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসল রে ॥

উমা রাণী এল বলে—
পদ্ম ফোটে দীঘির জলে,
ঠাকুর ঘরে তালে তালে
ড্যাম কুড়া কুড় বাজল রে।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসল রে ॥

আজকে তাই ভেদাভেদ নাই -
(ওরে) সবাই যে ভাই ভাই।
আনন্দে মেতেছে সবাই ;
সবার হৃদয় নাচল রে।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসল রে ॥

‘কলকাতা’-সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কলকাতা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মাথাঘামানি হয়েছে অনেক চিন্তার তোলপাড়ে বিদগ্ধ সমাজ আলোড়িত হয়েছে কিন্তু সে আলোড়ন বহিরঙ্গের। অন্তরঙ্গে প্রবেশ করলে বলতে হয় কেন এই আলোড়ন একটা শহরের নামকে কেন্দ্র করে? কেন এই নিয়ে মনীষার সময় ও পরিশ্রম দান, কেন এই তত্ত্ব ও তথ্যের পুঁথি ঘাটাঘাটি?

আসলে বাঙালি মাত্রই গর্ব করতে ভালোবাসেন এই শহরকে নিয়ে এবং এই শহরই দিয়েছে তাঁদের এমন এক সংস্কৃতিবোধ যা অন্য কোথাও মেলে না। এবং সেই অন্তরঙ্গের সৌরভে আন্দোলিত হৃদয়ে যে বোধ ও বোধি, যে ঋদ্ধি ও রুচি, যে সম্ভ্রম ও সৌজাত্য—তাই যেন প্রেরণার উৎসমূল। সমস্ত সৌভাগ্য যেন এইমাত্র সঞ্চারিত হয়ে ওঠে যখনই ভাবনায় রাখা যায় বঙ্গসন্তান তার অন্তর্প্রেরণায় শীর্ষতম আভিজাত্যস্থল কলকাতায় কেন্দ্রবিন্দু বিন্যস্ত করে হয়েছেন বৃত্তবদ্ধ।

শহরকে শহরতলীর মানুষ শুধু রুজিরোজগারের একমাত্র উত্তরণভূমি মনে করলেও তার অতিরিক্ত একটা আভিজাত্যও যে লাভ করতো না, তা বলা যায় না। একজন শহরতলীর মানুষ তাঁরই নিজের কলকাতার আত্মীয়কে বেশ একটা সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধির উচ্চ কোটির প্রান্তে উপস্থাপন করতে অনায়াস প্রবৃত্তিতে অভ্যস্থ দেখা যায়। যেন বেশ একটা সমীহ সমীহ ভাব, বেশ একটা আদরণীয় আদরণীয় অভ্যর্থনা—মুখে না প্রকাশ করলেও তাঁর মনের ভাবনায় থাকে—আহা কি সৌভাগ্যই না হয়েছে কলকাতায় বসতি স্থাপন করেছে, কি এলেম্‌দার মানুষই না হয়েছে কলকাতার বাসিন্দা হতে পেরেছে! একটা পৈঠে যেন ওপরের তলায় আসন পাতা হয়ে যায় যখন সে কলকাতায় নিবাস করে। একটা শহরের বসতিতেই জড়িয়ে যায় তার দেহে উচ্চ-সংস্কৃতির উত্তরীয়।

নতুন করে সভ্যতার অঙ্গরাগ হয় নাগরিকতার নবরূপায়ণে। একটা নতুন শহরপত্তনিতে নবীন মনীষা এবং সবুজ সম্ভাবনা যুগলবন্দী হয়ে আগামী যুগের ভৈরবীরূপে হয় আশার অগ্রদূত। সেই প্রভাতী পূর্বালীর অরুণাভাকে যাঁরা চিনতে পারেন বা গ্রহণ করতে পারেন তাঁরা নতুনের অভিযাত্রী হন নতুন শহরে নবীন মনীষা ও সবুজ সম্ভাবনার ভূমিতে! সুতানটি গোবিন্দপুর কলিকাতা প্রভৃতি নিয়ে যে কলকাতা, যে কলকাতায় যবচার্ণক সাহেব গাছতলায় বসে গড়গড়া টানছেন—সেখানে হল নতুন যুগের নতুন সভ্যতার পত্তন, নাগরিকতার নবীন উষার উদয়ী দিগন্তের উন্মোচন।

নতুন নগরে বসতি পাতলেন নানা অঞ্চলের মানুষ নানা ভাব ও ভাষার, নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির। কেউ এসেছেন মহারাষ্ট্র থেকে, কেউ এসেছেন কেরল-অন্ধ্র-তামিলনাড়ু থেকে, কেউ-বা পাঞ্জাব-রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশ থেকে, কেউ-বা আসাম-বিহার-উৎকল থেকে, কিন্তু লক্ষ্য তাঁদের শহরের প্রাণসংস্কৃতিতে যার সৌরভ অনাঘ্রাত জীবনে উদ্বেগ জাগিয়েছে। অর্থ আর পরমার্থ দুই যেন প্রাপ্তি ঘটে এখানে। বাংলার গ্রাম-গ্রামান্ত থেকেও তেমনি শিক্ষিত এবং বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবজনের সমাবেশ ঘটতে লাগলো শহর কলকাতায়। একদিন ভারত সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শকহুনদল পাঠান-মোগল একদেহে হল লীন' বা 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে' অথবা 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে'···ইত্যাদি। স্মরণাতীত কালের মিলনের ভাব ও ভাবনায় গঠিত হয়ে আসছে ভারত সংস্কৃতি ও সভ্যতা যা আজও অব্যাহত। কলকাতায় সেই চেতনার এক পরিমণ্ডল আজকের পরিভাষায় বলা যায় 'মিনি' আকারে রচনা হয়ে এসেছে পত্তনের আদি যুগেই।

একটা মিশ্র সংস্কৃতি, একটা মিশ্র সভ্যতার আলোক ছিল তাই কলকাতায় বিচরণশীল। মৌলিক সংস্কৃতি যা একান্ত বাঙালিরই ঐতিহ্যে পুষ্ট তারই ওপরে যেন নতুন অঙ্গরাগ বর্ণাঢ্য দীপ্তিতে। আরব্য, পারস্য, চৈনিক, পার্শি, ফরাসী, ইংরেজ—নানা দেশের মানুষের যে মহামিলন হল নাগরিক জীবনে, যে সংস্পর্শ লাভ হল একটি নতুন শহরের পত্তনে তাতে আদব-কায়দায়, আচার-ব্যবহারে একটা নতুনের হাওয়া বইতে থাকলো। তখন তাঁর ফেলে আসা পুরোনো শহরের চিরায়ত রেওয়াজ থেকে, রীতি থেকে, রুচি থেকে—অনেক অনেক দূরে যেন হেঁটে এসেছেন। একটা পোশাকী সাজপরা মানুষ তাঁরা হয়েছেন, তাঁদের আর সেই যে ঢিলেঢালা আটপৌরে ভাবটি তা আর নেই। কলকাতার অভিজাত বাঙালি ঘরের যে ফিটফাট পরিচ্ছন্ন পারিবারিক পরিবেশ তাই তো সকলের হল আকর্ষণীয় সহবত বা একেই হয়তো বলা যায় অনুকরণীয় সদাচার।

অন্তরঙ্গে এতদিনের যে বাঙালি-ঐতিহ্যে পুষ্ট তা আটপৌরে কিন্তু তা আছে দেহে মেদরক্তের মতোই—ওপরে শুধু আস্তরণ নতুন সংস্কৃতির নতুন যুগের। যেমন দেশী-বিদেশীর মিলন তেমনি গ্রামীন-নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও মিলন ঘটেছে কলকাতার শহুরে জীবনে। এখনো অনেক বাড়িতে ঢেঁকিশাল আছে পৌষ মাসে পার্বনের জন্যে বা বিয়ের সময় মেয়েলী প্রথাবদ্ধ আনুষ্ঠানিকতার জন্যে। এখনো গঙ্গার বুকে কলাগাছের পেটোয় তৈরি জাহাজ ভাসানোর পার্বন হতে দেখা যায়, এখনো দেওয়ালীর দিনে সাঁঝের বেলা চৌদ্দ প্রদীপ জ্বলে এবং শ্রীপঞ্চমীর পর ষষ্টিতে পান্তা ভাতের পাতে গোটা সিদ্ধ হয়—এমনি আরো কত কত রকম গ্রামীণ-জীবনের প্রাচীন প্রথার নীরব অনুস্থিতি কলকাতার দীর্ঘ নাগরিক জীবনেও চালু। আবার ওদিকে হুকো গড়গড়া বা চুরুট-টোবাকো-পাইপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া তুলছে। ঝাড়লণ্ঠনের ঝলমলানি থেকে নিয়োন আলোর নীল ভরিয়েছে বৈঠকখানা। পিঁড়ি-আসন থেকে বিদেশী ধাচে এসেছে টেবিলে খানার খানদানি রেওয়াজ।

চুনুট-করা দেশী ধুতি আর গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরণে বাবুও যেমন রয়েছেন তেমনি আবার সেরোয়ানি-চুরিদার পাজামা বা বিলেতী স্যুটের সুসজ্জিত বাঙালি সাহেবও রয়েছেন। অতুলপ্রসাদ সেন গেয়েছেন—'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখি মিলন মহান'। 'কারণ বহিরঙ্গের রূপ যাই হোক অন্তরঙ্গে চিরন্তন বাঙালি শাশ্বত ঐতিহ্যেরই, শুধু নবীন প্রচলনের প্রজাত। বসতি গ্রামে হোক বা শহরে হোক। প্রাচীন শহরে হোক বা নবীন শহরে হোক—একান্ত শিষ্টাচার-মার্জিত ঐতিহ্য পুষ্টিতেই এখানের জাতীয় ঐশ্বর্য।

কলকাতায় শিয়াল-ডাকা-রাত কবে চলে গেছে। হয়তো এই নতুন নামে চিহ্নিত করার সময়, সেই রাত যে পোহাবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। সে দিনের পরিবেশ পরিস্থিতি এমন ছিল না যে হঠাৎ আমূল কিছু পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে। গ্রামীণ পরিমণ্ডল পাশাপাশি উত্থান পতনের সাক্ষী থাকতে থাকতে ভাবতে পারে মাত্র বড়দরের শহরমাত্র হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু কালের রাখাল কি সুরে যে বাঁশি বাজিয়ে ছিল, কে জানে; সমস্ত জাতিরই চেহারা পাল্টে গেল গাঙ্গেয় পলিমাটিতে গড়া এই গ্রাম সমষ্টির বুকে নতুন শহর পত্তনের পর থেকে। এই শহরকে কেন্দ্র করেই নতুনের বৃত্ত রচনা হল। গ্রামের মেটো বাড়ি গিয়ে শুধু পাকা বাড়ি আর পাকা রাস্তা, পয়ঃপ্রণালীর আধুনিকতম অদৃশ্য আয়োজনই নয় এসে গেছে ভূগর্ভ পথ। ঘোড়ায় টানা ট্রামের দিনও পুরোনো স্মৃতিমাত্র বিদ্যুৎ ট্রাম উল্লেখ্যই নয় এখন প্রতীক্ষা ভূগর্ভ রেলের ঝড়ের গতি। কারণ আধুনিকতার চলোর্মি শহরে বিজ্ঞান ও বুদ্ধির, বিদ্যার আর বিবেকের চলবে সমান অগ্রগতি। গঙ্গার ধারের বাবুঘাট, মল্লিকঘাট প্রভৃতির প্রাচীন বাণিজ্য নেই, এসেছে দমদমের উড়োজাহাজি বাণিজ্য; হাওড়া বা শিয়ালদার ভিড় উপচে পড়চে প্রতিদিনের কলকাতামুখী মেয়ে পুরুষের ঘড়িঘরে সময় জানতে। স্বদেশী যুগের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি গুপ্তবিপ্লবে বোমার আওয়াজ; আজাদ হিন্দের 'জয়হিন্দ' বা 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ' শুনতে শুনতে ধ্বনিত হল 'দুনিয়ার মজদুর এক হোক'। অকৃটরলনি মনুমেন্ট হল শহীদ মিনার—মেহনতী মানুষের মিছিল এসে মিললো। তবু পূর্বভারতের সংস্কৃতির তীর্থভূমি কলকাতা—এখনো নাচে, গানে, যাত্রায়, নাটকে, সিনেমায়, প্রদর্শনীতে আর সম্মেলনে প্রাণবন্ত। রাজনীতি আর সমাজনীতি, ধর্মনীতি আর শিল্পরীতি—এখানে যেন গাঁটছড়া বেঁধেছে। কালের রাখাল কালোত্তীর্ণ হয়ে যেন নবীন দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করছেন কলকাতাকে আধুনিকতার অগ্রণী করে। রূপসী কলকাতা হচ্ছে কল্লোলিনী কলকাতা।

একটা শহরের আধুনিকতা শুধু তো সীমিত থাকে না সেই শহরের গণ্ডির সীমানাটুকুতে—তা ছড়িয়ে যায় আশেপাশের ছোটোখাটো শহরতলীতে আগে, তারপর কালক্রমে গ্রামেগঞ্জে। তাই বাঙালির সমগ্র জীবনেই জোয়ার আনলো কলকাতার নাগরিক জীবনের চিন্তাচেতনা, রুচিরীতি। যার ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য অঞ্চলের থেকেও বাঙালি হয়ে উঠলেন এক আধুনিক সভ্যতার

অগ্রণী গোষ্ঠী। আবার এর চরমরূপ বা মূলাধার কলকাতাবাসীকে নিয়েই সব বাঙালিরই চললো অনুকরণ আর অনুসরণ।

পাঠান বা মোগল বাদশাহের দরবারী কৌলিন্য ছিল প্রাক্-বৃটিশ ভারতে। অন্যভাবে বলা যায় কোনো রাজ-শাসিত রাষ্ট্রের রাজ আনুকূল্যের প্রভাবিত সমাজ এক রাজকীয় আভিজাত্য আয়ত্ত করে নিয়ে সেই রাজ্যের অগ্রণী সমাজে পরিণত হন। তখন সেই রাজ্যের আচার-আচরণের আদব-কায়দার অগ্রদূত রূপে তাঁরা সবার অনুকরণীয় ও আদরণীয় হয়ে ওঠেন। ভারতে বৃটিশ গোড়াপত্তনের অর্থাৎ 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে' যে শহরে—সেখানের অধিবাসীরাই প্রথম নতুন ভোরের আলো দেখলেন, প্রথম নতুন দেশের আধুনিকতম সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলেন এবং ব্যবহারিক জীবনকে, সামাজিক জীবনকে আর রাষ্ট্রীক জীবনকে সমন্বয়ী বোধির আলোকে উজ্জীবিত করে তুললেন। মন্দির মসজিদ আর গির্জার, শশ্মান-গোরস্থান আর কবরখানায়, ভাত পরোটা আর রুটিতে—চললো সহ-অবস্থান এবং সহবতে সমন্বয়। আহারে-বিহারে আসনে-বসনে স্বভাবে সৌজন্যে একটা প্রয়োজনীয় পরিমার্জিত একান্ত আবশ্যকীয় আচরণে অভ্যস্থ সামাজিকতার প্রাদুর্ভাব ঘটল। শহর কলকাতায় রয়ে বসে চলার দিন চলে যায়নি কখনও তবু কাজের কাজ যেমন ছিল তেমনি না-কাজের কাজিও ছিল যথেষ্ট। একদিকে অকাজ, অনেকে বলবেন কুকাজও ছিল তখনও, অথচ অর্থ ও প্রতিপত্তির জন্যে উদ্যম ও উদ্যোগ থাকলো। পরমার্থেও গেল কিছু অর্থ। ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসার সহজ পথ পেয়ে গেলেন তখনকার কলকাতার বাসিন্দারা, পেয়ে গেলেন অর্থের বিপুল অধিকারও। যার ফলে একদিকে বিলাস হয়েছে যেমন অঢেল অর্থে তেমনি মানসিকতাকেও করেছিলেন তাঁরা উর্ধমুখিন। যার ফলে তাঁরা কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থে কোনো তুচ্ছ লোভে নিম্নমুখিন পথের ব্যবসায় বা অর্থের উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নামতে পারলেন না। যে উচ্চকোটিতে হৃদয় বীণার তন্ত্রীগুলি বাঁধা ছিল তা কোনো বেসুরে সঙ্গতে বেতালা হতে স্বভাবতই নারাজ।

বিশ্ব নিয়মে কোথাও ফাঁক থাকে না। এক পদার্থের স্থলে আর এক পদার্থ আসে। কলকাতার ব্যবসায়ী হাটে এলো তাই মালিকানার পালা বদল। বনেদী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ঝাপটুকু ফেলতে লাগলো ঐশ্বর্যের অমরাবতীতে বসে। যার অবধারিত ফল হল প্রতিযোগিতায় নতুন ব্যাপারীরা কলকাতার আসর বেশ জমিয়ে ফেললে। আদি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে ক্রমে নতুন আগন্তুকের হাতে চলে গেল, কলকাতা পত্তনি-কালের যত নতুনরা সব পুরোনো হয়ে গেলেন। সমকালের নতুনের ভিড় জমলো।

কিন্তু যে মন্দিরে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নীতির আর ন্যায়ের রুচি-পরিশীলিত রীতির আর রূপের সেখানের শ্রী সৌন্দর্য, সেখানের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য—সবই রইল; শুধু রইল না সাগরের বুকে ভাসানোর মতো নীতির জাহাজ। রইল না মন্দিরের পতাকা বহন করার মতো দণ্ড—যা

নতুন দেশের নতুন বন্দরে দেবে পাড়ি। আর ফিরে আসবে যা সমৃদ্ধির রত্নরাজিতে ভরপুর হয়ে দেশের মন্দিরমালায় মালঞ্চরচনা করতে।

কালের অমোঘ নিয়ম নদীর একপার ভাঙ্‌ছে আর এক পার গড়ছে। কিন্তু ভাঙাপারের যে অংশটুকু অক্ষত থাকে তার পলিমাটির আস্তরণও উর্বরা—তা শ্যামল, শোভন ও সমৃদ্ধির। সারা ভারতের রাজধানীর ঠাঁই বদল হল। রাজধানী দিল্লীতে গেল। আবার ইংরেজ আমলে কিন্তু কলকাতা ঠিকই রয়েছে দেখি তবু কলকাতাতেই। ধর্ম, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, স্বাদেশীকতা—সব কিছুই ব্যক্তিগতভাবে হোক বা সমষ্টিগত ভাবেই হোক কলকাতার জনজীবন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ভাগ্যাকাশকে করলো উদ্ভাসিত। ধন ও মানের জুড়িঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে ছিল সেদিনের কলকাতা। তাঁদের দান ছিল মান ছিল, এসেছিল সেদিন পুরোনো সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে নবীন জ্ঞানের বৈজয়ন্তী। তাই নবভারতের পাঞ্চজন্যও ধ্বনিত হল যুগ থেকে যুগান্তরে কাল থেকে কালান্তরে কলকাতার গাঙ্গেয় কূলে।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ, অথবা বিদ্যাসাগর থেকে চিত্তরঞ্জন—কত মনীষীর ধারা, কত মননের বিচিত্রগতি বিভিন্ন বিভাগে বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনায় —যা অবাক করা, যা অভাবনীয় আজও। কলকাতার সজীব পারিপার্শ্বিকতাই দিয়েছে সেই নবোন্মেষী চৈতন্যের জাগৃতি। খুব ভালোর ছেলের দল থেকেই অনেক-আলোর ঝল্‌মেলানির সম্ভাবনা বেশি থাকে। অনেক ভালোর মধ্যে থাকতে থাকতে সামান্য কালোও নিজেকে আলোকিত করতে চায়। একই সতীর্থ গোষ্ঠীর সদস্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা ভোলানাথ চন্দ্র পেয়ে যান শীর্ষভূমির সংক্ষেত্র। শোভাবাজারের দেবপরিবার আর বড়বাজারের মল্লিক পরিবার কলকাতার নাগরিকতায় দিলে অনুকরণীয় বর্ণালী। অনেক আলোর বর্ণাঢ্য হল ঠাকুর পরিবার আর সিংহ পরিবারে বা ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বৈশ্য সমাজভুক্ত বনেদীয়ানায়। স্বদেশী যুগে আবার কেউ প্রকাশ্যে কেউ প্রচ্ছন্নে করলেন পৃষ্ঠপোষকতা-যার নিদর্শন রইল জনগণের দেওয়া রাজ উপাধিতে। শুধু বিলাস নয় পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল এবং প্রতিযোগিতার না হলেও সম্মান ও সম্ভ্রমের তাগিদ-যার ফলে সেদিনের কলকাতায় একক চেষ্টায় যেমন মতিশীলের কলেজ বা গৌরমোহন আঢ্যের কলেজ ছিল তেমনি বহু দানবীরের দানে অঞ্চলে অঞ্চলে বিদ্যাপীঠের পত্তন হয়। এক দীপ থেকে জ্বল্‌লো অনেক দীপ। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এখানেই, এখানেই তাই গাঙ্গেয় কূলে কলকাতায় ভালোর দলে অনেক আলো জ্বল্‌লো। দীপাবলীর সুসজ্জিত জাহাজ ভাসলো জ্ঞান-গঙ্গোত্রী ধারায়।

কলকাতার নির্ভেজাল নিখাদ নাগরিক মনের ছবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে লেখা ২৬ জুন ১৮৯২ সালের পত্রে যেমন ভাবে ব্যক্ত করেছেন তার চেয়ে আর ভালো করে বলার ভাষা না খুঁজে শুধু সেইটুকুই এখানে উদ্ধৃত করছি—'আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে সত্যপথে চলি তা হলে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোনো দরকার নেই।'

যাঁরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পেরেছেন তাঁরা এবং যাঁরা অব্যক্ত থেকেছেন তাঁরা—সকলেরই মনের নীতিস্থিতি এখানেই। এই মানসিকতাই মৌল গ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন—'মনে যদি কোন কারণে অসন্তোষ এসে পড়ে সেটাকে যতই পোষণ করবে ততই সে অন্যায় রূপে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে—সেটা যে কিছুই নয় এই রকম ভাবতে চেষ্টা করা—তার যতটুকু প্রতিকার করা আমার সাধ্য তা অবশ্য করব—যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে এছাড়া যথার্থ সুখী হবার আর কোন উপায় নেই।' এই মননীল চৈতন্যের বিশেষ প্রস্তুতি প্রয়োজন। কলকাতায় বহু ধর্ম সংস্কৃতির ধারায় স্নাত মননে যেমন এক ব্রহ্মের উপাসনা এসেছে তেমনি সমন্বয়ী সভ্যতার নৈকট্যে উপনীত হয়ে গড়ে ওঠে একটা জ্যোতির্বলয়কে লাভের অভিলাষিত মানস। দিব্য জ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' পরিক্রমান্তেই একটা বোধ ও বোধির বৈচিত্র্য বিস্তার।

কলকাতার সুসজ্জিত সাহেবী কায়দায় বাড়িঘর বাঙালিগৃহস্থ নিজের রুচি ও রীতিতে গ্রহণ করে গৃহের শ্রী ও সৌন্দর্য বিধানে তৎপর হয়। সেই ঢেউ কলকাতার বন্দর ছাড়িয়েই ছুটলো শুধু বাংলার শ্যামলশোভার ছোট শহরগুলীতেই নয় সারা ভারতের শহরের পর শহরে। যার চরম পরিণতি, এবং সার্থক পরিণতিও বলা যায় হায়দ্রাবাদের সালারজঙ্‌ সংগ্রহশালা। একটা পরিমার্জিত পরিশীলিত সুন্দরবোধের উদ্‌বোধিত মানসিকতা দৃশ্যে পরিবেশিত হয়ে নান্দনিক পরিমণ্ডল রচিত করে, সূচিত করে রূপ থেকে রুচি এবং শ্রী থেকে শুচি। মনের ছবি ধরা রইল গৃহের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে একটা অভিজাত অলিন্দে উপনীত করে। জীবনযাত্রার নাগরিকতা আবার সমসাময়িক আধুনীকতার দ্বারাই অনেকাংশে প্রভাবিত এবং প্রচলিত। কাল ভেদে তাই নবরূপায়িতও।

সাজানো গোছানো, মানানো বানানো এবং রুচিতে রাঙানো পরিবেশ কলকাতার বহিরঙ্গের ঔজ্জ্বল্য। অন্তরঙ্গেও সেই মার্জিত রুপোলী আলো মনমুগ্ধকর মৌখিক কথার আর কাজের, আস্থার আর আশ্রয়ের—যার সম্পদে ছড়ানো দাতব্য ও জনহিতকর কীর্তি ও কার্যাবলী। কলকাতার শৌখিন মেজাজেও তখন মহৎ ও বৃহৎ কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে এক অভাবনীয় কালাতীত অক্ষয় উপকারের উৎসরূপে। বেড়ালের বিয়ের বাজনা যেমন বেজেছে কলকাতায় তেমনি আবার স্বদেশী মেলায়ও গান গেয়েছেন কলকাতার কবিকণ্ঠ। এই নাগরিক কলকাতার ভালোর আলোটুকু চিরন্তনের গ্রাহ্য কালোর কালিমাটুকু নয়। তাই স্বদেশ জাগৃতির জ্যোতি বিকীর্ণ অথচ নবাগত উন্নত বিদেশীয় মহৎ আধুনিকতায় সুস্নাত কলকাতার সংস্কৃতি—যা দেশে দেশে পরিচিতি বহন করছে বাংলার ঐতিহ্য স্বরূপেই।

লাবণ্য যেমন দেহসৌন্দর্য-অতিরিক্ত একটা শ্রী—যা ঠিক বস্তুবিশ্বে বিধৃত হয়েও বদ্ধ নয়, তেমনি কলকাতার সংস্কৃতিও অন্য অঞ্চলের বাঙালির থেকে বিশিষ্ট হয়েও তা বস্তুবিশ্বের নয়—

এমন একটা বোধ। যার কেবলমাত্র অনুভূতিতেই যেন একটা আভিজাত্য। যাকে ঠিকমতো করে বলা যায় না, ধরা যায় না অথচ একদিন-না-একদিন তা আত্মসাৎ করা হয়ে যায় কলকাতায় দুটি বা তিনটি প্রজন্মের বসতিতেই। একটা আটপৌরে সাজ চলে যায়, একটা পোশাকী সাজ এসে যায়, একটা মোলায়েম মন কার্যকরী হয়ে ওঠে অথচ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হতে থাকে বাঙালি-ঐতিহ্যের বুদ্ধিদীপ্ত রজত গঙ্গোত্রীধারা।

যাকে বলতে পারা যায় কলকাতা নাগরিকতার লাবণ্য।

যা বাঙালি-ঐতিহ্যে পুষ্ট কিন্তু কলকাতা-সংস্কৃতির অবদান।

এস, দূষণ মুক্ত রাখি মাকে

মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায় (দুর্গাপুর)

[redacted]নে পৃথিবী আমাদের জননী, ধাত্রী -
[redacted]ই মাখা অন্ন, ফল, জল-বায়ু নিয়ে
আমাদের এই ছোট্ট সুন্দর জীবন-নদী
'কুলুকুলু' সুরে স্বপ্ন দেখে সারা দিন রাত্রি।

আজ দূষিত বাতাসে জলে মন অপবিত্র—
এ দেহ-মন্দিরে কোনে কোনে দুরন্ত কামনা,
রক্ত কণিকারা শীর্ণকায়…পীতবর্ণ হচ্ছে,
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখি কলঙ্কিত চিত্র।

দূষিত হয়েছে সাগর-নদী-মাটির জল,
কারখানা ও গাড়ীর ধোঁয়া নিত্য ঢালে বিষ,
সবুজ ছেলে-মেয়েরা হয়েছে অকালে পক্ক,
ধূমপান ও 'ড্রাগে' মানুষ নিত্য হীনবল।

হিংসা-লোভ-কামনা ক্ষিপ্ত সহস্র দুর্যোধন
ভারতের দিকে দিকে গড়ে তোলে কুরুক্ষেত্র।
বে-নিয়ম, ব্যাভিচার দেখে প্রকৃতি কাঁদছে…
বাতাসে বাড়ছে সুখে জানি কার্ব্বন-ড্রাগন।

প্রকৃতির অঙ্গে হানে কুঠার কোন্ সন্তান ?
মায়ের-ই প্রাণে বিষ ছড়ায় কোন্ সন্তান ?
মাকে রুগ্ন করলে কেউ হবে কি আয়ুষ্মান !
কোথায় যাবে ? কে বলবে না যদি থাকে প্রাণ !

সত্য-ন্যায়, শৌর্য্যে-বীর্য্যে মনকে এবার গড়ি,
ভুল ভাঙ্গার….ঘুম ভাঙ্গার এই তো সময়—
মায়ের দেয়া অন্ন-জলে-ই হাসছে জীবন
এস, দূষণ মুক্ত রাখি মাকে – শপথ করি।

গায়ত্রীদেবীর তপস্যা

(উপন্যাস)

জগন্ময় মিশ্র (বীরভূম)

পর্ব—১

ছ্যারাপানি গ্রামের পঁচিশ কক্ষের বিবর্ণ ত্রিতল বাড়িটি এখন জমিদারী পুরাতন ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সিংহ দরজা হতে প্রায় দশটি দরজা পেরিয়ে ত্রিতলের উপর রাধা গোবিন্দের মন্দির। এতবড় বাড়ীর বর্তমান ওয়ারিশ গায়ত্রীদেবী। চল্লিশোর্দ্ধ এই ভদ্রমহিলার গেরুয়া বসনের সঙ্গে গাত্রবর্ণের আশ্চর্য মিল! গেরুয়া রং তাঁর দেহের সঙ্গে একাত্ম শরীরের বাঁধন বয়স অনুমানের মাপকাঠিকে অতলে ডুবিয়ে রেখেছে। এই মন্দিরটিতে যখন বৎসরে একবার বৈষ্ণব মহোৎসব হয় তখন গায়ত্রীদেবীকে ঠিক বৈষ্ণবীর মত লাগে। মন্দিরটিকে বৈষ্ণবের আখড়া মনে হয়। কিন্তু ঐ দু-চারদিন তারপর এখানে আর সাধু সমাগম হয় না, তবে একেবারে যে হয় না তা নয়। বৎসরে অন্যান্য সময়ে দুচারজন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সমাগম ঘটে, তাদের সেবার দায়িত্ব গায়ত্রীদেবী নিজের হাতে নেন। এ তাঁর বিচিত্র খেয়াল, এই খেয়ালেই তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। এ খেয়াল তাঁর কি জন্য সে কথা তার একান্ত কাছের লোক অচলাও জানে না। শুধু অনুমান করে একজন, তাঁর পিতার অনুগত নায়েব সত্তর বছরের বৃদ্ধ রামচরণবাবু।

ময়ূরাক্ষীর তীরে এই গ্রামটি প্রায় অর্দ্ধ কিমিঃ উত্তরে সরে এসেছে তার পূর্বের অবস্থান হতে। প্রায় দেড়শত বৎসর আগে এক ভয়াবহ বন্যায় গ্রামটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে বিরাট দহের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তখন থেকেই এই "দহ"টির নাম "ছ্যারাপানির দ" দুর্দান্ত প্রতাপশালী তৎকালীন অত্যাচারী জমিদার রাজনারায়ণ রায় ছিলেন গায়ত্রীদেবীর পূর্বপুরুষ। এইখানেই ছিল তার সুসজ্জিত দ্বিতল বাড়ী, গরীবের রক্তচোষা অর্থে এবং বহুজনের ধনসম্পত্তি হরণ করে আকাশচুম্বী ত্রিতল গৃহটি নির্মিত করেছিলেন রাজনারায়ণ বাবু। পুণ্য সলিলা ময়ূরাক্ষী নদী এটাকে বোধহয় সহ্য করতে পারেনি। এক বিধ্বংসী বন্যায় আপন বক্ষে প্রায় চার মাইল বয়ে এনে উলটিয়ে স্থাপন করে যেন রাজনারায়ণ বাবুর কৃতকর্মের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু থেমে থাকেন নি। এখান হতে প্রায় আধকিমিঃ দূরে আর একটি ত্রিতল সুসজ্জিত বাড়ি মনের মত করে নির্মান করে ছ্যারাপানি গ্রামটি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁকে

অনুসরণ করে গ্রামের সকলেই এখানে বসতি স্থাপন করে সেই আগের মতই গ্রামটিকে গড়ে তুলেছিল। বর্তমান এই বাড়িটির অনেকে নাম দিয়েছে নিবংশ ভিটে। বিশ্বনিয়ন্তা অত্যাচারী জমিদারী রক্তের বিলোপ ঘটাতে বোধহয় এটাকে নিবংশ ভিটেয় পরিণত করেছেন। প্রথম তলে প্রায় সব ঘরগুলো দখল করেছে বেশ কিছু বাস্তহারা মানুষ, কালি ও ঝুলে ভর্তি পলেস্তার খসা দেওয়ালগুলো. দরজার কাঠগুলোতেও উই ধরে গেছে, কোনটা বা স্থানচ্যুত হয়েছে। তার পরিবর্ত্তে স্থান পেয়েছে ছেঁড়া চট। গায়ত্রীদেবী কিছু বলেন না। সংসার তার কাছে অসার। কি হবে তার মৃত্যুর পর ? হয়তো এ বাড়ীতে ইঁদুর আর বাদুড়ের আবাস স্থল হবে।

পিতার আমলের নায়েব রামচরণ বাবুর কিন্তু দৃষ্টিশূল এইসব ভঞ্জালরা। কথায় কথায় তাদের বাস তুলিয়ে উচ্ছেদ করতে চান্ এখান হতে। না হলে ওরা আস্তে আস্তে সব গ্রাস করবে।

কিন্তু ভাগ্য যাকে গ্রাস করেছে রামকাকা তাকে তুমি কিভাবে বাঁচাবে। আর তো কটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। বল মহোৎসবের কথাটা। কি কি যোগাড় হলো ?

হারানপুর মহাল হতে এবার একটা পয়সাও আসবে না দিদি। ওখানকার ঐ ভগীরথ বায়েনও নাকি পঞ্চায়েত সদস্য। ওই নিষেধ করেছে সকলকে। আমাদেরকে ফসল না দিতে। কাছাড়ী বাড়িটাও একজন দখল করেছে। ওখানকার প্রধানকে বলে দেখেছো ?

না বলিনি। দেখা করে বলব। তবে লাভ বিশেষ হবে না। আজকালকার পঞ্চায়েতে আমাদের মত লোকদের স্থান নেই। এটা ওদের জন্যই।

যুগের হাওয়াকে তো মানতে হবে রামকাকা।

রাখ তোমার যুগের হাওয়া। টাকায় পাথর কেটে এসেছে। হাইকোর্টে কেশ ঠুকতে হবে। কালই যাব কলকাতায় আমাদের উকীলের কাছে।

বর্তমানে কেশটেস এর কথা ছেড়ে আমার মহোৎসবের জোগাড়টা করো। ওসব পরে যা হয় হবে।

ঐ পরে পরে করতে গিয়ে সব খোয়াবে তুমি দিদিমনি।

তুমি, বাবা, মিলে আমার সব খোয়াতে কি বাকী রাখলে রামকাকা।

ওঃ সব সময় ওকথা বলো না দিদিমনি। তার জন্য স্ত্রী পুত্র হারিয়ে শাস্তিও কম পাইনি আমি। রামচরনের চোখ দুটো অশ্রু সিক্ত হয়ে ওঠে।

তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য বলিনি রামকাকা। মাঝে মাঝে অন্তর থেকে আপন হতেই বেরিয়ে আসে। যাক ওসব ছাড়। হারানপুর মহালে একবার যাও। ওখান হতে কি আসে দেখ। আমি চলি, রাধা গোবিন্দের পুজোর জোগাড় করিগে। চলে যান গায়ত্রীদেবী।

গায়ত্রীদেবী অচলাকে সঙ্গে নিয়ে যান 'ছ্যারাপানির দ' এ স্নান করতে। এটা তার একটা বাতিক। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময় সকালে ও সন্ধ্যায় স্নান এখানে সমাধা করেন। এই দহের

জলে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মিশিয়ে তিনি যে কার পূজায় মগ্ন তা অচলাও জানে না। অচলা শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকে বোকার মত। দহের ঘাটটা গায়ত্রীদেবী ভাল করে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। সেটাও কয়েক বছর হল দহ তার আপন গর্ভে ধারণ করেছে। বর্তমানে সেটাকে নতুন করে বাধানো সম্ভব হয়নি। মাটি ফেলে উঁচু করে ঘাটে নামার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দহে মাছ জন্মে প্রচুর। দহের পাড়ে আজ কয়েকজন মৎস্য শিকারী মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত। গায়ত্রীদেবী স্নান সেরে একজনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তার ছিপে একটি মাছ গেঁথেছে। প্রায় মিনিট পনের পরিশ্রমে মাছটিকে ডাঙ্গায় তোলে লোকটি। এ দৃশ্যে গায়ত্রীদেবীর মনে পড়ে যায় তার জীবনের শুরু এই দহে আবার শেষও এই দহে। এই অভিশপ্ত দহে এলে তার অশ্রু ঝরে, আবার না এলে এখানে আসার জন্য অশ্রু ঝরে। তাই প্রতিদিন দুবেলা তার এখানে আসা।

পর্ব—২

ময়ূরাক্ষীর বন্যায় আর আগের মত তাণ্ডব লীলা নেই, তিল পাড়ায় বাঁধ পাড়ায়। ময়ূরাক্ষী তার অজস্র ফনা সঙ্গে নিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে প্রায়ই আসে না, তবে আসে না এমন নয়। দু-পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর আসে।

অচলা কাঁদতে দেখে বলে দিদি তুমি কেন কাঁদছ, বলবে না। যন্ত্রণা বুকে চাপা রাখতে নেই। সব বললে মন হাল্কা হবে, কিছুটা শান্তি পাবে।

চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে গায়ত্রীদেবীর। নিজের কথা আস্তে আস্তে বলতে থাকে—জানিস অচলা এই ছ্যাড়াপানির "দ" কত ইতিহাস বুকে লুকিয়ে রেখেছে, শুনলে অবাক হবি। মায়ের কাছে শুনেছি। আমার দাদুর আমলে এই দহে কত লাশ যে গায়েব হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সব পাপের বোঝা এই দহ বুকে নিয়ে আছে। ওই যে নদীর ওপারের গ্রাম হরিশপুর। ওখানকার জমিদার প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতাপশালী অত্যাচারী আর নারী লোভী ছিলেন। মোহনপুরের একটি নতুন বৌ সেবার পুজোয় এই গ্রামে তার মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে। প্রাণকৃষ্ণবাবুর চোখ পড়েছিল মেয়েটার উপরে, জমিদারের দুইজন লোক গিয়েছিল বার্তা নিয়ে মেয়েটার মামার কাছে। মামাতো সব শুনে ভয়ে অস্থির। জমিদারের রোষানল এড়াবার জন্য সেদিন রাতেই ওদের এখান হতে দুজনকে বাড়ী পাঠাবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে নদীর গা বরাবর হাঁটছিলেন মেয়েটি ও তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। জমিদার খবর পেয়ে তাঁর লোক পাঠিয়ে ওদের ধরে আনেন। মেয়েটার স্বামী ও মামাকে বেশ করে ধোলাই এর ব্যবস্থা করে মেয়েটাকে প্রমোদ কক্ষে নিয়ে সারারাত কাটান। মামা ও স্বামী নিরুপায় হয়ে হা-হুতাশ করতে করতে বাড়ী ফেরার তিনদিন পর মেয়েটা ছাড়া পায়। কিন্তু মেয়েটি আর ঘরে ফেরেনি, মেয়েটির স্বামী পাগল হয়ে তাকে খুঁজে বেরিয়েছিল, কিন্তু কোথাও খুজে পায়নি। দিন কয়েক পর মেয়েটার পচা গলিত মৃতদেহ

এই ছ্যারাপানি দহে ভেসে উঠেছিল। মেয়েটার স্বামীও নাকি এই দহের জলেই গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরে ছিল। আর একবার সে ঘটনার কথা মনে পড়লে আজো গাটা শিউরে ওঠে। হারানপুর মাহালের একজন গরীব গৃহস্থ আমাদের নায়েব ঐ রামকাকাকে কি যেন অপমান সূচক কথা বলেছিল। কোন অন্যায় বলেনি লোকটি। প্রজারা সেবার খাজনা দিতে পারেনি। ওই লোকটি নেতৃত্ব নিয়ে এসেছিল খাজনা মুকুবের জন্য। সেই অপরাধে তার উপর দণ্ড নেমে এসেছিল। রামকাকা অনুরোধ করেছিল বাবাকে তাকে না মারলে মহাল চালাতে অসুবিধা হবে। বাবা তখন মদের নেশায় বুঁদ। সঙ্গে সঙ্গে রায় দিয়ে বলেছিলেন ওকে মেরে ছ্যারাপানির দহে লাশ সামলে এস। আমার তখন সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান হয়নি। মা খবর পেয়ে বাবার কাছে লোকটির প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবাকে টলাতে পারেননি। লোকটির দেহ তিন টুকরো করে বস্তায় ভরে ওই ছ্যারাপানির দহে লাশ সামলে এসেছিল। এমনি কত শত ঘটনা এই দহে শেষ নিবৃতি ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। অচলা আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানিস—আমাদের এত প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস হওয়ার কারণ বোধ হয় সেই সঞ্চিত পাপ। তাইতো একটু শান্তির আশায় ঈশ্বরের নাম গান করে, মানুষের সেবা করে সেই পাপের কিছুটা যদি প্রায়শ্চিত করতে পারিতো দেখি।

ওসব তোমার ভুল কথা দিদি। বিধির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। তুমি তো কোন পাপ করনি। তবে কেন সোনার যৌবন এভাবে ছারখার হল।

চুপ করে যায় গায়ত্রীদেবী। বলেন চল, এবার ঘরে চল। ঘরের দিকে রওনা দেন অচলার সঙ্গে।

পর্ব—৩

রাস পূর্ণিমায় মহোৎসব হবে। পুরানো জমিদারের বসত বাটি এখন আখড়া। সেই আখড়ায় বহু স্থান হইতে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা আসতে শুরু করেছে। দোতলায় আশ্রয় নিয়েছে তারা। প্রতি বছর আসে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একদিন আগে হতে আসতে শুরু করে। এবার জিনিষপত্র বিশেষ আদায় হয়নি। এ নিয়ে নায়েব রামচরণবাবুর আক্ষেপ। দিদিমণি এবার যে হারানপুর মহাল থেকে কিছুই আসেনি। বিলাসপুর মহাল হতে এসেছে গত বারেরও অর্দ্ধেক। বাড়ী হতে খরচ করতে হবে এবার।

তাই হবে রামকাকা তুমি তাই জোগাড় কর।

তা না হয় করছি কিন্তু এভাবে কিছুই না দিলে মহাল তো আর থাকবেই না। বাবু বেঁচে থাকলে ওদের পিঠের ছাল চামড়া তুলে দিতেন।

তা দিতেন। আর সেই পাপের বোঝা বইতে হত এই আমাদের, তার আর দরকার নেই। যা আছে এতেই হবে। তুমি আয়োজনের ত্রুটি রেখো না যেন।

গায়ত্রীদেবী গলবস্ত্র হয়ে কৃষ্ণের শতনাম পাঠ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর শত নাম পাঠ শেষ করে গড় হয়ে রাধামাধবকে প্রণাম করেন। তারপর অচলাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতলে নেমে আসেন, অতিথি আপ্যায়নের জন্য। প্রত্যেক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর কাছে এসে তাদের পরিচয় ও কুশল জিজ্ঞাসা করেন। অনেকের কাছে বৈষ্ণব হওয়ার ইতিহাস সংগ্রহ করেন। প্রতিবছর এই ইতিহাস শুনে শুনে তার জীবনবেদের পাতা ভারী হয়ে ওঠে। সকলের জ্বালার কথা শুনে তার মনও কিছুটা শান্ত হয়, এই মহোৎসবের দিনে। তাই প্রতি বছর আপন হাতে একদিন এদের সেবা করে গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করেন গায়ত্রীদেবী। অচলাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে এসে এক বৈষ্ণব দম্পতিকে দেখে তাঁর মনে বিরাট কৌতুহল জাগে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের কাছে বসে পড়েন। পরিচিতি জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাদের কাছে প্রশ্ন রাখেন এই বয়সে এই পথে কেন এলে।

জীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি দিদি।

কিসের প্রায়শ্চিত্ত ভাই।"

"উশৃঙ্খলতার"—জীবনের প্রাপ্তি আর প্রত্যাশা ছিল অনেক, কিন্তু আর পেতে চাই না। সব পাওয়া হয়ে গেছে।

কি পেলে ?

এখনও পাইনি, পাবার আশা নিয়ে এ পথ ধরেছি। জানেন আমি বর্ধমান ইউনিভারসিটির প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। তখনকার সমাজের যন্ত্রণা আমার মনের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলত। এই সমাজের প্রতি ঘৃণায় সমাজ বদলের আশা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, নকশালী আন্দোলনে। সাময়িক ঝোঁকে, দলীয় নির্দেশে বহু মানুষের মুণ্ডকে ধর হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম আমরা কয়েকজনে, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। আমাদের নির্দেশ থাকত কাকে পৃথিবী হতে সরাতে হবে। সে নির্দেশে আমাদের রওনা হতে হত গ্রাম বাংলার দিকে। এই যে দেখছেন আমার বৈষ্ণবী এও এক পাড়া গ্রামের মেয়ে। এর বাবা এক বড় সমাজসেবী বিপত্নীক ডাক্তার। আমাদের দলনেতার ঘৃণ্য চক্রান্তে বের হল ওর বাবার মৃত্যু পরোয়ানা। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। ওকে এনে এক আমগাছের সঙ্গে বাঁধা হল। সংসারে ওর আপন বলতে একমাত্র মেয়ে। তখন ঠিক সাবালিকা হয়ে ওঠেনি। বাবার ঐ অবস্থা দেখে ও ছুটে এসে আমার হাতে পায়ে ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল। আমার মনে সে মিনতি স্পর্শ করেছিল কিন্তু স্থানীয় নেতা এবং দলের নির্দেশকে অমান্য করার সাহস হয়নি সেদিন, হলে হয়ত আমারই স্বর্গ লাভ ঘটত। লোকটাকে তাই পারিনি রক্ষা করতে। আমারই হাত দিয়ে ওকে গুলি করে হত্যা করিয়েছিল। আত্মধিক্কারে আর বিবেকের আঘাতে আমার সমাজ বদলের নেশা কেটে গেল সেদিনই। আমি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমি প্রায় বছর দুয়েক থানায় বন্দী রইলাম। বিচারে হল দু বছর জেল। বাবা মায়ের আমি একমাত্র সন্তান ছিলাম। আমাকে মানুষ করার

উচ্চাশা তাঁদের দুজনের মধ্যে বর্তমান ছিল। সে আশায় আঘাত দেওয়ায় আমার প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে আমার কোন খোঁজ করেন নি। এত আঘাত সইতে না পেরে বছর খানেক মধ্যে দুজনে পাড়ি দিলেন শান্তির রাজ্যে। জেল হতে ফিরে আমিও ভেবেছিলাম আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। এই রকম মনোভাবের মধ্যে দিন কাটছিল। আমার শেষ কুকর্মের জন্য মনটা সব সময় হায় হায় করছিল। তাই ইচ্ছে হল একবার গিয়ে দেখে আসি অনাথ মেয়েটাকে, তার কি হল। ওখান গিয়ে খবর পেলাম মেয়েটি এখন অনাথা। অপরের বাড়ীতে ঝি বৃত্তিতে তার ক্ষুন্নি বৃত্তি হয়। ঝিয়ের কাজ শেষ করে সবে বাড়ী ফিরেছে মেয়েটি অর্থাৎ কমলা। আমি আমার পরিচয় দিই। আমার সব দোষ স্বীকার করে কমলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাকে গ্রহণ করতে পারি একথাও দিই। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধের পরিবর্তে আমার প্রতি অনুকম্পা পোষণ করে কমলা বলে সেই ভাল। এখানে থাকলে আমি আমার ইজ্জত হারাব। সেদিনই ওকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর একটা বৈষ্ণবের আখড়ায় ওর সঙ্গে আমার মালা চন্দন হল। সেইখানেই থাকি আমরা। মাঝে মাঝে বৈষ্ণব মেলায় যাই। যেমন এখানটায় এলাম। আর কিছু পাই আর না পাই, মনে মনে সান্ত্বনা আমি যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা কে জানে।

কে বললে হবে না। হরি নামের গুণে সব হয় ভাই। বেশ কাল সকালে আবার দেখা হবে। অনেক রাত হল বিশ্রাম কর। অচলাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন গায়ত্রীদেবী। তারপর তার ক্লান্ত শরীরটাকে পালঙ্কে বিছিয়ে সৃষ্টি কর্ত্তার অপূর্ব লীলার কথা চিন্তা করতে থাকেন।

পর্ব—৪

অতি প্রত্যুষে ছ্যারাপানির দহে স্নানপর্ব সমাধা করে রাধামাধবের সামনে বসে কৃষ্ণের শতনাম সুর করে পাঠ আরম্ভ করেন গায়ত্রীদেবী। অচলা প্রতিদিনকার মত আজও ঘন্টা বাজানোর দায়িত্বটা পালন করে। এই নাম গান মন্দির চত্বরে এক মধুময় পরিবেশ লাভ করে। প্রায় আধ ঘন্টা পর সে পর্ব্ব সমাধা হয়। গায়ত্রীদেবী অচলাকে নিয়ে নিচে নেমে এসে স্বহস্তে মহাপ্রভুর প্রসাদ রন্ধনে লিপ্ত হন। প্রতি বছর তিনি স্বহস্তে রন্ধন সেরে স্বহস্তে পরিবেশন করে সাধু ফকির হরিজন সেবা করান। এটাতে তার পরম পরিতৃপ্তি। এই পরিশ্রম তাকে এতটুকু ক্লান্ত করে না। অন্যান্য বারের মত এবারেও শ'ছয়েক লোক হয়েছে, এই মহোৎসবে অংশ নিতে। সকালে বহু শ্রীখোলের শব্দে ছ্যারাপানির গ্রাম মুখর হয়ে ওঠে। হরিনামের মাদকতায় গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার অন্তর ভরিয়ে নাম গান চলে। তারপর সকলে রাধামাধবের প্রসাদ গ্রহণের পর বিদায়ের পালা আসে। আস্তে আস্তে সকলে বিদায় নেয় গায়ত্রীদেবীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে।

তরুণ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীটিও যায় বিদায় নিতে। গায়ত্রীদেবী ছলছল চোখে তাদের বিদায় দেন। তারা চলে যায়। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

গায়ত্রীদেবী অচলাকে জিজ্ঞেস করেন, অচলা তুই কাউকে ভালবেসেছিস ?

হ্যা গো জীবনে সে সুযোগও এসেছিল। আমরা তখন গোকুলপুরের আখড়াতে থাকতাম। তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছি। মা-বাবা দুজনেই আমাদের ঘরে রেখে মাধুকরীতে বেরুতেন। আমাদের আখড়ার বড় গোসাঁই, তার বয়স ষাটের উপর। বছর দুয়েক আগে তার বৈষ্ণবী কবর নিয়েছে। আমার দিকে সে এমন ভাবে ড্যাবা চোখে তাকাত আমার ভয় করত। একদিন মাকে জানিয়ে ছিলাম একথা। মা সেদিন বিশ্বাস করেনি। বলেছিল তোর সঙ্গে ঠাট্টা করে।

তারপর একদিন মা বাবা দুজনে বেরিয়েছে মাধুকরীতে। ঘরে একা আমি। বাগান হতে ফুল তুলে এনে মালা গাঁথছি। বড় গোসাঁই এসে বল্লে "মালা আমার জন্যে গাঁথ অচলা। আমি চন্দন আনছি।" বলেই সে ক্রমশঃ আমার দিকে এগোতে থাকে। সেদিন আমি কোনমতে তার ভোগ লালসার শিকার না হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাই। বাবা মা বাড়ীতে এলে তাদেরকে সব কথা বলি।

বাবা এটাকে সহজ ভাবে মেনে নেন। বলেন কি আর খারাপ কথা বলেছে বড় গোসাঁই। মালা, চন্দন করে বৈষ্ণবী করবে এতে দোষের কি।

মা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন—ওই বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে মালা চন্দন হবে।

আরে আমাদের বৈষ্ণবের আখড়ায় এতো হামেশায় হয়। তাছাড়া বড় গোসাঁই যখন ধরেছে তখন আর উপায় নাই।

উপায় আছে। না হয় এই আখড়া হতে চলে যাব আমরা। ঐ গোকুলের সঙ্গে মালা চন্দন করিয়ে.....।

গোকুলের বাবা রাজী হবে।

হ্যাঁ হবে। মা বাবাকে ধমকে উঠেছিল।

বাবা আর কোন কথা বলেনি। গোকুল ছোট বেলা হতে আমার খেলার সাথী। এই সুত্রেই আমাদের মনের বিনিময়। তবে মালা চন্দনের প্রস্তাব হবে এটা ভাবিনি। মা আমার মনের কথা বুঝে সব ব্যবস্থা করে ফেলে। সেদিন রাত্রে 'গোকুল' এল আমাদের বাড়ী। মাঝে মাঝে আসে তার মনের তাগিদে। মা প্রথম কথাটা তুললে। জান গোকুল বড় গোসাঁই কি কাণ্ড করেছে জান।

কই না তো কি করেছে আবার।

আমার অচলার সঙ্গে মালা চন্দন করবে বলেছে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে গোকুল। এ্যাঃ কিন্তু···

আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো। তুমি আজই অচলাকে নিয়ে চলে যাও। কোন অধর্ম হবে না। মালা চন্দন তোমরা পরে করে নিও। মায়ের কথায় রাজী হয়ে গেল গোকুল। বাড়ীতে কিছু না বলে একটা থলেতে জামা কাপড়গুলো ভরে নিয়ে রাতের অন্ধকারে রওনা দিল আমাকে নিয়ে। বড় গোসাঁই কিন্তু সব খবর রেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আখড়ার আর দুজন গোসাঁইকে নিয়ে আমাদের দুজনকে ধরে নিয়ে আসে আখড়ায়। গোকুলকে প্রচণ্ড মারধোর করে। সকলের সামনে আমাদের বিচার হয়। আখড়ার সকলেই বড় গোঁসাই এর দিকে। বড় গোসাঁই এর দোষের কথা কেউ বলে না। এমনকি আমার বাবাও। মা, আমি মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। বিচারে গোকুলের মা বাবা এবং গোকুলকে আখড়া হতে বের করে দেওয়া হল। বড় গোসাঁই দু-একদিনের মধ্যেই তোমার বাবার কাছে আমাকে মিথ্যা ব্যভিচারিনী সাজিয়ে বিচার চাইলেন। তোমার মা সেবারই মারা গিয়েছিলেন। তোমার দেখাশুনার জন্য একজন মেয়ে খুঁজছিলেন তোমার বাবা। বড় গোসাঁই এর পরামর্শে রামকাকা আমাকে রাখার মনস্থ করলেন। সেই হতে আমি এখানে রয়ে গেলাম। আমার মা ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারলে না।

তুই এতদিন বলিসনি কেন অচলা।

বলতে নিষেধ ছিল দিদি। তাই বলতে পারিনি।

তবে আজ বললি কেন ?

আজ বলে আমার কিছু লাভ হবে বলে বললাম।

হ্যাঁরে তোর গোকুল কি বেঁচে আছে ?

তা জানিনে দিদিমনি। তবে শুনেছি তার পরদিনই সকলকে ছেড়ে গোকুল কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।

তুই গোকুল পেলে সুখী হবি ? আমি তাহলে খোঁজ করব।

না দিদি। কুড়ি বছর পর আর খোঁজ পেয়ে লাভ নেই। তোমার কাছে সারা জীবন কাটাব।

তুই এত চাপা অচলা !

এতো তোমার কাছ থেকে শেখা দিদি। প্রতিদিন দেখি তোমার চোখ হতে জল ঝরতে। কিন্তু আজ কুড়ি বছরেও তোমার মনের কথা বললে না।

পর্ব—৫

দিন চারেক হতে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। যাকে বলে আশ্বিনের ঝড়। নদীর দুপাশে সন্তপ্রসবে ভারাক্রান্ত ধানগাছগুলি ভূমিতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষীর জলস্রোত। উত্তাল গতিতে দুপাশের বাঁধের দুর্বল অংশ ভেঙে পড়ছে।

চারিদিকে মৃত্যুর আর্তনাদ। এই আর্তনাদ গায়ত্রীদেবীর কানে আসে। তার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি রামচরণবাবুকে ডাকতে থাকেন—ও রামকাকা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রামচরণবাবু আসেন। গায়ত্রীদেবীকে জিজ্ঞেস করেন, কিছু বলছিলে দিদিমনি।

হ্যাঁ রামকাকা ঐ শোনো চারিদিকে মৃত্যুর আর্তনাদ। আমি বলি কি আশে পাশের মানুষদের খবর দাও। ওরা এখানেই থাকবে। দু'তলায় এবং তিনতলায় খালি ঘরগুলোতে তো অনেক লোক ধরবে। তাছাড়া ছাদের উপর ত্রিপল টাঙিয়ে বেশ কিছু লোক থাকতে পারবে।

তুমি পাগল হয়েছো দিদিমনি। একবার এলে আর উঠবে না। দেখছো তো নীচের তলায় কি অবস্থা। যারা বসেছে তাদের ওঠাতে পারছ ? যুগ খারাপ, ওসব চিন্তা ছাড়।

এসব ছেড়ে আর কি চিন্তা করব রামকাকা, বাবা তুমি আমার চিন্তাকে কেড়ে নিয়েছো।

তা বলে তুমি নিজের এতবড় সর্বনাশ করবে।

আমি তো আগেই বলেছি রামকাকা এই সংকটময় মুহূর্তে এলাকার মানুষের দু'চার জনেরও জীবন যদি বাঁচাতে পারি তবেই তোমাদের পাপের কিছুটা লাঘব হবে। আমি তারই চেষ্টা করে যাব।

দিদিমনি তুমি ভাল করে চিন্তা করে দেখ। তোমাকে কেউ করুণা করবে না। দু-দুটো মহাল থেকে এক রকম উচ্ছেদ করেছে। তোমার জীবনের অনেক বাকী।

যাঁর নাম নিয়ে পড়ে আছি বাকী জীবনের ভার তাঁরই রামকাকা। আমার জন্য তুমি চিন্তা করো না। মায়ের গহনার বাক্সে যত গহনা আছে সব বিক্রি করে এখানে যারা আসবে তাদের পুর্ণবাসন করা পর্যন্ত সব ব্যয় ভার বহন হবে। তুমি তারই ব্যবস্থা করো।

দিদিমনি তুমি আর একবার ভেবে দেখো। এই বুড়োর কথা শোন। ভুল পথে পা বারিয়ো না।

কোনটা ভুল কোনটা ঠিক এ সব বাবার আর তোমার কাছে হতে শেখা। বাবার অত্যাচারে যখন নিরীহ নির্দোষ মানুষ পা ধরে কাঁদত, তখন মা আমায় বলতেন গায়ত্রী আমাকে বিষ এনে দে, এ আর দেখতে পারছি না। তার চোখ জলে ভরে উঠত। তাইতো আমার মনে হয় যদি কোন মানুষের চোখের একফোটা জলও মোছাতে পারি তাহলে যেন আমার মায়ের চোখের জল মোছানো হবে। মা যে চোখের জল দিয়ে সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছে রামকাকা। যাও আর দেরি করো না। অচলা ততক্ষণে চা নিয়ে এসেছে। রামচরণবাবু করুণ বদনে তা পান করে বেরিয়ে পড়েন, নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বন্যাপীড়িত মানুষদের এখানে আনতে। মনে মনে চিন্তা করতে থাকেন আমার কি নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। গায়ত্রীদেবীর বাবার আমলে যেমন ছিল না, গায়ত্রীদেবীর কাছেও নেই। চিরদিন যেন আজ্ঞা বইতে জন্ম। পরক্ষণেই মনকে সান্ত্বনা দেন তাহোক, এই বাড়ীতে নায়েবগিরি করেই সে সব করে ছিল। কিন্তু ভগবান তা সহ্য করলেন না। এতে তো মানুষের করার কিছু নেই।

প্রায় ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই অনেক গৃহহারা মানুষ এসে দ্বিতল এবং ত্রিতলের খালি কক্ষগুলো ভর্ত্তি করে ফেলে। ছাদের উপর ত্রিপল টাঙিয়ে অস্থায়ী আস্থানা করে ফেলে।

আর্ত্ত মানুষদের আবাসনের ব্যবস্থা করে গায়ত্রীদেবীর কিছুটা আত্মতৃপ্তি ঘটে। কয়েকদিন কেটে যায় এবং বন্যাও কমে এসেছে। বেশ কিছুদিন পরে সকলে আপন গ্রামে গিয়ে আস্থানা গড়ে। রামচরণবাবু তাঁর মনিব মাতার গহনার বাক্স তালা বন্ধ করেন। প্রায় ভরি ত্রিশেক সোনার মধ্যে কয়েক ভরি মাত্র সম্বল রেখে বাক্সটা এনে গায়ত্রীদেবীর হাতে দেয়। এই নাও রেখে দাও, এতে আর বিশেষ কিছু নেই।

তা না থাক। গহনার বাক্স খালি হলেও, পূণ্যের কড়িতে অন্তর যে পূর্ণ রইল রামকাকা।

পূণ্য সেটা অনেক পরের কথা দিদিমনি। আজ যারা তোমার আশ্রয়ে ছিল কাল যে তারা তোমার সর্বনাশ করবে। আর করেছেও তো। এই গ্রামের যে লোক তোমাদের খেয়ে সারা-জীবন পুষ্ট তারাই তো তোমাদের সব আস্তে আস্তে গ্রাস করেছে।

তা করুক ওদের জিনিস তোমরা এতদিন গ্রাস করেছিলে। কয়েক দিন পর ওরা না হয় সেগুলো ফিরিয়ে নিয়েছে তাতে আর এমন কি হয়েছে। যাকগে ও নিয়ে আর কথা নয়।

তোমাকে আমি আমার আপন মেয়ের মত মনে করি। তাই বলছিলাম আমি আর ক'দিন। তোমার কিভাবে কাটবে।

আমার চিন্তা আমার রাধামাধবকে দিয়ে দাও। শুনেছি নাকি মন প্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাকলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ওটা তত্ত্ব কথা দিদিমনি। বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই।

যারা এই হিসেব জানে তারাবাস্তবে মিল ঠিক খুজে পায় রামকাকা। তুমি তোমার কাজে যাও। ফুলের বাগানটায় কিছু নতুন ফুলের চারা লাগানোর ব্যবস্থা করো। গাছগুলোয় তেমন ফুল ধরে না।

রামচরণবাবু চলে যায়।

অচলা গায়ত্রীদেবীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

গায়ত্রীদেবী অচলাকে বলে ওঠেন তুই কি দেখছিস এমন করে।

দেখিনি গো ভাবছি। এই বাড়ীর মেয়ে হয়ে তুমি এমন কি করে হলে।

কেন হতে নেই বুঝি!

না তা নয়। আম গাছে বেল ফলে না।

আমি আমার মাকে জানি। তাঁর অন্তরে আমার অন্তর গড়া।

অচলা আর কথা বাড়ায় না, ফুলের সাজি হাতে ফুল আনতে যায়।

গায়ত্রীদেবী উঠে পড়েন আপন ঘরে দিকে।

বিধ্বংসী বন্যায় রুদ্রাণী ময়ূরাক্ষী নিজের খেয়ালে দুপাশের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, এককুল ভেঙে আর এককুল গড়ে পুরাতনের অবসান ঘটিয়ে। কিন্তু ছ্যারাপানির 'দ' এ বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। শুধু বাঁধানো ঘাটটি দহ আপন গর্ভে স্থাপন করে দুপাশে আয়তনে বৃদ্ধি ঘটিয়ে নদীর জলজ প্রাণীদের আবাস স্থলের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। বেশ কিছুদিন গায়ত্রীদেবী এই দ'হে অবগাহন সারতে পারেননি। পাশে নদীতে বাধ্য হয়ে সে পর্ব সমাধান করেছেন।

তাই কিছুদিনের মধ্যেই মাটি পাথর দিয়ে রামচরণের কাছে সুপারিশ করিয়ে শ্রমিক দিয়ে আবার ঘাটটি তৈরী করিয়েছেন। বেশ কয়েক বছরের মধ্যেই ময়ূরাক্ষী তার দুপাশের অঞ্চলকে শস্য শ্যামলে ভরিয়ে আগের ক্ষতির ক্ষতি পূরণ দিয়েও আরো বেশী কিছু দিয়েছে। এই ময়ূরাক্ষীর এই এক খেলা। যা নেয় তার থেকে দেয় বেশী। তাই এখানকার মানুষ এত বন্যা সত্বেও বাসস্থান পরিবর্তন করে না। এই নদীর দুপাশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না। ছ্যারাপানির এই "দ" এর তীরে এক মৌনি সাধু এসে ত্রিপল খাঁটিয়ে আস্তানা গেড়েছে। দীর্ঘ ছ'ফুট, গৌরবর্ণ, গেরুয়া বসন. মুখভর্ত্তি দাঁড়ি বড় মানান সই। সূর্যোদয়ের আগে হতেই নদীর জলে তর্পণ করেন তারপর আশ্রমে এসে আপন যাগযজ্ঞে সময় নিয়োগ করেন। তারপর স্বহস্তে রন্ধন পরিপাক করে দিনের শেষে আহার পর্ব্ব সমাধা করেন। এখানকার অনেকে তার গুণে মুগ্ধ হয়ে বর্ত্তমানে তাঁর ভক্তে পরিণত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়ে মাঝে মাঝে নাম সংকীর্ত্তন করিয়ে বেশ কিছু হরিজনকে প্রসাদ বিতরণও করানো হয়।

এই কর্মে এলাকার মানুষ তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে অকৃপণ হস্তে দান করে এই উৎসবের আরও বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। অনেক দুর দুরান্ত হতে লোকজনের আসা যাওয়া শুরু হয়েছে।

সেদিন অচলা ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাগানে ফুল তুলে রাধাগোবিন্দের মালা গাঁথতে ব্যস্ত। গায়ত্রীদেবী মহাপ্রভুর মুর্ত্তিকে স্নান করাতে মগ্ন এমন সময় অচলা বলে ওঠে দিদি "দ" এর ওদিকটায় একটা সাধু আস্থানা গেঁড়েছে। চলোনা একদিন দেখে আসি।

হ্যাঁ শুনেছি তবে চাক্ষুষ হয়নি। একদিন গেলেই হল।

মাস এগার তো হয়েই গেলো। এবার কোন দিন হয়তো চলে যাবে।

যাব একদিন। মালা দুটো দে।

মালা দুটো হাতে দেয় অচলা। সেই মালা রাধামাধবের গলায় পড়িয়ে অশ্রু সিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের শত নাম সুর করে গাইতে থাকেন। অচলা ঘন্টা বাজাতে থাকে।

রাধামাধবের ভোগের শেষে দুজনে আহারে রত –অচলা জিজ্ঞেস করে, দিদি এত চোখের জল তুমি কার জন্য জমা করে রেখেছ? আমার তো তোমার মত অশ্রু ঝরেনা।

তা হলে তোমারও কি আমার মত অবস্থা

হ্যাঁ অচলা……

জানিস তখন ময়ূরাক্ষী এখনকার মত অত অগভীর ছিল না। বছরে প্রায় আট মাস নৌকো চলত। আমি প্রায় বিকেলে নৌকা নিয়ে বেড়াতে যেতাম। সঙ্গে কোনদিন থাকতেন বাবা আবার কোনদিন রামকাকা না হয় আমার বুড়ো ঝি বিদ্যামাসী। সেদিন ভাদ্র মাসের বিকেল। সে দিনটা আজও মনে পড়ছে। আমি বিদ্যামাসীর সঙ্গে নৌকায় ছ্যারাপানি "দ" এর পাশ দিয়ে নৌকা বিহারে চলেছি। একটি সুদর্শন যুবক ছ্যারাপানির দহে ছিপে একটা বিরাট মাছ গেঁথেছে। আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতে আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনি। মাঝিকে নৌকা থামাতে বলি, মাঝি তীরে নেমে নৌকা ধরে দাঁড়ায়। আমি ঐ মাছটা তোলা দেখতে লাগলাম। আসলে মাছ তোলা দেখিনি। ওকে দেখেছিলাম. বিরাট এক রুই মাছ বহু কষ্টে ডাঙ্গায় তুলল ছেলেটি। ছেলেটিকে আমার খুবই ভাল লাগল। বেশ ছিমছাম চেহারা, আমি ঝিকে দিয়ে কাছে ডাকলাম। মাছটা কিনবার অছিলায় ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। জানিস অচলা মানব জীবনে প্রথম দেখায় কে কার মনে শিকড় গাড়ে তা কেউ টের পায় না। প্রথম দেখাতেই ভালবাসার শিকড় গেঁথে গেল আমার মনে। ওর নাম বলল গোলক। তার সঙ্গে দুটো কথা বলার আছিলায় বললাম মাছটা বিক্রি করবে।

গোলক বলল না।

শ্বত টাকা চাও দেব।

মাছ ধরা আমার নেশা। তাছাড়া বাড়ীতে প্রয়োজন। বিক্রি করি না।

সেদিন আর কথা বাড়াইনি। বুকের মধ্যে ভালবাসার যন্ত্রণাকে প্রথম উপলব্ধি করতে করতে বাড়ী ফিরলাম। পরের দিন বিকেল বেলায় বিদ্যামাসীর সঙ্গে নৌকায় এসে দেখি ছেলেটি মাছ ধরছে। নৌকা থামিয়ে ওর কাছ থেকে একটু দূরে বসে ওকে আড় চোখে নিরীক্ষণ করতে থাকি। সেদিন যেন আরও ভাল লাগল ওকে। তাই কথা বলার লোভ সংবরণ করতে না পেরে ওকে বলি আমাদের নৌকাটা একটু চড়ে আটকে গেছে একটু চড়া ছাড়িয়ে দেবে।

ছিপটা তুলে ডাঙ্গায় রেখে আমাদের নৌকার কাছে এসে নৌকার মাঝিকে বলে কই কোথায় আটকিয়েছে।

মাঝি তো হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকাতে থাকে। আমার দুষ্ট হাসিতে ও বোকা বনে বললে—কোনদিন পালে বাঘ পড়া হবে।

তাহলে আমি কিন্তু আপনার নাম ধরে চিৎকার করব।

আপনার চিৎকার আমার কানে আর আসবে না।

দেখব আসে কিনা।

দৃষ্টি বিনিময়ের পর মিষ্টি হাসি হেসে সে আপন স্থান দখল করে ছিপের ডোর জলে ফেলল।

আমার আচরণে বিন্তামাসীর মুখ শুকিয়ে গেল। বাবাকে ওর প্রচণ্ড ভয়। জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না। আমি অভয় দিই যা হয় আমার হবে। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। সেদিন আর আমাকে এখানে বেশীক্ষণ বসতে দেয়নি বিন্তামাসী। পরের দিন অনেক বুঝিয়ে বিন্তামাসীর সঙ্গে এখানে আসি। এভাবে আমরা পরস্পর একান্ত আপন হয়ে উঠি। কতদিন গোলক ছিপে মাছ গেঁথে আমাকে ছিপটা ধরিয়ে দিয়ে মাছ ডাঙ্গায় তোলাত। অহরহ আমার ধ্যান ছিল গোলক। মন সব সময় তাকে কাছে পেতে চাইত। এভাবে প্রায় বছর খানেক কাটল।

বাবা বিয়ের প্রস্তাব চালাতে লাগলেন। একটা অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ এল। মা বছর তিনেক আগে দেহ রেখেছেন। তাই আমি বাবাকেই সব কথা জানালাম। ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠলেন তিনি, তোমার এত সাহস এল কোথেকে। আর ঐ ছোকড়াটার সাহসও কম নয়, দেখছি বলে দ্রুত বেরিয়ে এসে রামকাকাকে ডাকলেন। তারপর কি যেন পরামর্শ হল। আমার বাইরে বেরুনো বন্ধ হল। একদিন বিন্তামাসী কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল কি হবে এবার গায়ত্রী। বাবুর লোক গোলককে আর গোলকের বাবা মাকে আজ সন্ধ্যেয় বেঁধে এনেছে। আমার কি হবে কে জানে। বাবার নিষ্ঠুর কাজকর্মে পিছপা হতেন না। আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম। কি শাস্তি দেবে কে জানে।

দিন কয়েক পর খবর পেলাম গোলক আর ওর মা বাবাকে হাত পা বেঁধে গলায় পাথর বেঁধে ছ্যারাপানির "দ" এ ফেলে দেওয়া হয়েছে। কথাটা বিন্তামাসীর কাছ হতে শুনে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠি। সে কান্না শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে গোটা ঘর ছড়িয়ে পড়ে। আমি সঙ্গা হারালাম। দুদিন পর জ্ঞান হলে দেখি শিহরে বিন্তামাসী। ঐ হারান ডাক্তার বাবা আর রামকাকা। সে আঘাত সহ্য করতে এক মাস বিছানাগত ছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে বাবাকে বলেছিলাম বাবা তুমি গোলককে খুন করে আমাকে খুন করেছো। আমার বিয়ের আর চেষ্টা করো না।

বাবার পাষাণ হৃদয় না গলে বেরিয়ে এসেছিল, বিয়ে তোমার সামনের মাসেই ঠিক করেছি। আমার মত মর্যাদা সম্পন্ন ঘরে তোমার বিয়ে হবে।

আমি সেদিন আর কোন কথা বলিনি, চুপ করে আপন ঘরে অশ্রুজলে বুক ভাসাতে লাগলাম।

বিয়ের দিন এগিয়ে এল। আমি আমার পথ ঠিক করে ফেলি, ঐ ছ্যারাপানির "দ" এ জীবন বিসর্জন দেব। গোলক যেভাবে আমার অন্তরে গেঁথে ছিল কোনদিন তাকে ভুলতে পারব না। তার চেয়েও অনুশোচনা (গোলক) আমার কাছে প্রথম আসেনি। আমিই যেচে ওর সঙ্গে প্রেম করেছি। তার পরিপেক্ষিতে ওকে জীবন দিতে হল। এ অপরাধ-বোধ নিয়ে আর কারো সঙ্গী

হতে পারব না। বিয়ের আগের দিন রাত্রে সকলের অজান্তে বেরিয়ে পড়লাম। স্রোতসিনী ময়ূরাক্ষীর এই ছ্যারাপানির দহে ঝাঁপ দিয়ে প্রেমের পূজায় নিজেকে সমর্পন করলাম।

কিন্তু ঈশ্বর যাকে তার পায়ে নেবেন না তাঁর ইহজগত ছেড়ে যাবার তো কোন রাস্তা নেই অচলা। আমার মৃত্যু হল না। গঙ্গার ধারে একজন আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে ওদের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে সুস্থ করে তোলে। বাবা খবর পেয়ে আমাকে ঘরে আনল। বিন্তামাসীকে আমাদের ঘর হতে বরখাস্ত হতে হল আমার মেলামেশাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। সেই হতে আমি আর আত্মহত্যার চেষ্টা করিনি। সেদিন বুঝেছিলাম মৃত্যুক্ষণ না হলে মৃত্যু হবে না। তাই আজও নিস্প্রাণ দেহটা বয়ে নিয়ে ঐ ছ্যারাপানির দ'হে দুবেলা অশ্রু ঝরিয়ে গোলকের পূজা করি। একদিনও না গিয়ে থাকতে পারি না।

দিদি কি শোনালে তুমি।

হ্যাঁরে আপন বাড়ীর কথা কাউকে যে শোনাতে নাই ভাই, তাই তো বলিনি। তুই যখন নকল কথা আমাকে বললি, তাইতো আমার কথা তোকে দীর্ঘ বাইশ বছর পরেই বললাম। চলরে এবার একটু ঘুরে আসি ওখান হতে, বেলা বোধহয় আর বেশী নেই। দুজনে রওনা দেয় ছ্যারাপানির দ'হের দিকে।

পর্ব—৭

মৌনি বাবার আশ্রম গত কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ সুসজ্জিত হয়েছে। একতলা পাকা বাড়ী এক মাড়োয়ারী ভক্তের কৃপায় মাথা উঁচু করেছে সেখানে। বর্তমান সমাজের মানুষ জীবন্ত প্রতিমার প্রতি যতই অবহেলা করুক না কেন নিস্প্রাণ পুত্তলিকার উপর অগাধ ভক্তি এখনও নিঃশেষ হয়নি।

আজ একশত আট শ্রীখোল সহযোগে নাম সংকীর্ত্তন হবে। বিরাট আয়োজন অন্নমহোৎসব হবে। এলাকার বিভিন্ন স্থান হতে নানান ভক্তের দ্বারা আহারের সামগ্রী এসেছে। কিছু লোক বিরাট লোহার কড়াইএ রন্ধনে ব্যস্ত। গত রাত্রে হতে চলছে নামগানের গৌরচন্দ্রিকা। ক্রমশঃ নাম সংকীর্ত্তনের দল জুটেছে। বহু লোকের সমাগম। নাম সংকীর্ত্তন শুরু হয়েছে। হরিনামের অমৃতমন্ত্রে মুখর হয়ে উঠেছে চারিদিক। এর কি এক মাদকতা। কারো চোখে অঝরে জল ঝরছে কারো বা চোখ ছলছল। কেন ঝরছে, তা লিখে প্রকাশের সাধ্যাতীত। শুধু উপলব্ধির মাপ—কাঠি বুঝে নিতে হয়।

মৌনিবাবা স্বহস্তে প্রসাদ পরিবেশনে প্রথম সূচনা করেছেন। বেলা দুটো অবধি প্রসাদ বিতরণ চলতে থাকে। বিরাট আটচালার ভিতর নাম সংকীর্ত্তন চলছে। এবার হবে গ্রাম পরিক্রমা। দেড়-দুই হাজার কীর্ত্তণীয়া সারিবদ্ধভাবে ছ্যারাপানি গ্রাম পরিক্রমা করে চলেছে। নাম সংকীর্ত্তনে

মত্ত হয়ে। সকলের সামনে মৌনিবাবা। পিছন পিছন কীর্ত্তনীয়ার দল। গায়ত্রীদেবী, অচলা, রামচরণবাবু প্রত্যেকে তাদের গৃহের সিংহদরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মৌনিবাবা দীর্ঘকায়া, পাকা কাঁচা দাড়ি, দাড়ির সঙ্গে লম্বা মাথার চুল, দীপ্তিপূর্ণ নয়নের দিকে তাকিয়ে গায়ত্রীদেবীর মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। চোখ দুটি যেন অতি পরিচিত। এক অজানা সংশয় গায়ত্রীদেবীর অন্তরকে গ্রাস করে। অচলার সঙ্গে গায়ত্রীদেবী মৌনিবাবার পিছু নেন। এক সময় গ্রাম পরিক্রমা শেষ হয়। মৌনিবাবা আশ্রমের দিকে রওনা দেন। নাম সংকীর্ত্তনের দলও সেই পথ অনুসরণ করে। গায়ত্রীদেবী অচলাকে নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে গৃহে ফেরেন। দুজনে কোন কথা হয় না। ততক্ষণে সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। বৈশাখ মাসের শেষ। ক্ষীণধারা ময়ূরাক্ষীর বালিতে নেমে আসছে শীতলতার পরশ। গায়ত্রীদেবী অচলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বিকেলে স্নান সারতে ছ্যারাপানির "দহে"র দিকে। স্নান সেরে অচলাকে বলে অচলা চল মৌনিবাবার আশ্রম হতে ঘুরে আসি।

—আজ নয় বরং কাল সকালে যাব।

না. অচলা আজই চল।

কি হল দিদি তোমার ! তোমাকে যেন কেমন ঠেকছে।

তুই ঠিক ধরেছিস। মৌনিবাবা যেন আমার অতি পরিচিত রে। ওর দিকে তাকিয়ে এটাই যেন মনে হয়েছে আমার।

এটা তোমার মনের ভুল দিদি। তাছাড়া সাধুরা, অনেক কিছু জানে। হয়তো কোন তুক করেছে তোমাকে।

কে জানে কি করেছে। চল দেখে আসি।

সংকীর্ত্তনের দল চলে গেছে। মৌনিবাবা এবং বেশ কয়েকজন ভক্তসহযোগে তাঁর আসনে আসীন।

গায়ত্রীদেবী আশ্রমে গিয়ে প্রণাম সারে মৌনিবাবাকে।

মৌনিবাবা আসন হতে উঠে ঠাকুরের প্রসাদ এনে হাতে দেয়, অচলা ও গায়ত্রীদেবীকে।

গায়ত্রীদেবী ও অচলা সে প্রসাদ গ্রহণ করে। বাবার দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন গায়ত্রীদেবী। বাবা মস্তক স্পর্শ করে মনে মনে কি যেন বলে ওঠেন। মৌনিবাবার চোখ দুটো যেন ছলছল করে ওঠে।

আর দাঁড়ান না গায়ত্রীদেবী ওখানে। মনটা আশ্রমে বন্ধক রেখে আপন গৃহে যেতে যেতে অচলাকে বলেন—অচলা এক গড়নের মানুষ কি একের বেশি থাকে ?

এমনটি দেখিনি দিদি। তবে তুমি বোধহয় মৌনিবাবার তুকে পড়ে গেছ। ওসব সাধুরা মেয়েদের বশ করতে জানে। তুমি আর যেওনা ওখানে।

অচলা আমি ভ্রষ্টা হতে চলেছি। দীর্ঘ বাইশ বছরের সংযম যেন হারিয়ে ফেল্‌ছি।

মানুষের যে এমন হয় দিদি। একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের এভাবে ভালবাসা হয়। সেটায় মগ্ন হলে মন আর শাষন মানে না।

তাই কি হয়: কেন ভাল লাগে? এর পিছনে কি কোন কারণ নেই!

না দিদি, মানুষের মন এমনি জিনিষ, যে দিকে ঢল পায় সেদিকে গড়ায়। এরই মধ্যে তারা আপন গৃহে পৌঁছায়। অতি সংক্ষেপে মন্দিরে আরতি সেরে আপন শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন গায়ত্রীদেবী।

রামচরণবাবু বলতে থাকেন দিদি বিলাসপুর মহালের তিরিশ বিঘে জমি মাস খানেকের মধ্যেই দখল করবে পঞ্চায়েত হতে। বিলির কাজ শুরু হয়েছে শুনলাম। এই সময় কলকাতা গিয়ে আমাদের উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করে কেস দায়ের করার ব্যবস্থা করতে হবে।

একরকম খেঁকিয়ে ওঠেন গায়ত্রীদেবী—তোমাকে বলেছি না রামকাকা, ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

একি বলছ দিদিমনি! জমি জায়গা একবার বে-দখল হলে সে যে আর ফেরে না। বন্যার বছরে সোনা দানাগুলো শেষ করলে। জমি ক'বিঘে তাও যাবে। একি ভীমরতি ধরল তোমার। কেস করলে জমি ফিরবেই। এ বুড়োর কথা শোনো।

বেশ পরে চিন্তা করব, এখন যাও।

রামচরণ কথা না বাড়িয়ে আপন মনে সব গেল, সব ছারখার হল, বলতে বলতে বেড়িয়ে আসে ঘর থেকে।

রাত্রে ভোজনপর্ব্বের ব্যবস্থা করে অচলা। রামচরণকে খাইয়ে ডাকতে আসে গায়ত্রীদেবীকে, চল দিদি খাবে।

আজ শরীরটা ভাল নেই।

গায়ত্রীদেবীর গায়ে হাত দিয়ে দেখে অচলা, বলে কই কিছু তো হয়নি।

অচলা আর জ্বালাস নে। মনটা একদম ভাল নেই।

কিন্তু কেন? সেটা কি আমি জানতে পারব না।

না পারবি না। জানানোর কথা নয়, এ যে কলঙ্কের কথা। রাধাকৃষ্ণের নাম নিয়ে পড়ে আছি আজ বাইশ বছর, কই কোনো দিন তো এমন হয়নি। এ আমার কি হল!

কিছু হয়নি তোমার। শয়তান সাধুটা তুক করেছে। দেখলে আমাদের দরজায় এসে তোমার পানে কেমনভাবে তাকালে, ও ব্যাটা ভণ্ড সাধু। ওসব কথা মনে স্থান দিও না। কাল আমি ওর মুখোশ খুলে দিয়ে আসব সকলের সামনে. শয়তান।

না কোথাও যেতে হবে না। আমি আজ খাব না। তুই খেয়ে আয়। একটু বিরক্ত হয়ে চলে যায় অচলা, গায়ত্রীদেবী ভারাক্রান্ত মনে চিন্তার সাগরে ডুব দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অচলা এসে তার পাশটিতে শুয়ে পড়ে এবং একসময় ঘুমিয়ে যায়।

শুক্ল পক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে। ময়ূরাক্ষী তীরের চার পাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা একটানা ডেকে চলেছে। বালু তীরে জোনাকীরা রচনা করেছে আলোর মায়াজাল। অদূরে এক বৃদ্ধ বটবৃক্ষে একটা নিশাচর পাখী একটানা ডেকে চলেছে। রাত্রি প্রায় বারোটা। গ্রামের দু-একটা কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। একটা নারীমূর্ত্তি অন্ধকারের মধ্যেই চলেছে ছ্যারাপানি 'দহে'র কাছাকাছি আশ্রমের পথ ধরে। মৌনিবাবা আশ্রমের উঠানে দড়ির খাটিয়ার উপর সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি মেটাতে ব্যস্ত। ভক্ত বৃন্দরা গভীর ঘুমে অচেতন। নীচে কম্বল পেতে, গ্রীষ্মের দিনে শীতল হাওয়া কিছুক্ষণেব জন্য তাদের শান্তির রাজ্য নিয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব। নারীমূর্ত্তিটি ছ্যারাপানির 'দহে'র উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে অবলোকন করতে থাকে মৌনিবাবার আশ্রম। কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা দেয় আশ্রমের দিকে। অতি সন্তর্পনে মৌনিবাবার পদযুগল স্পর্শ করে। মৌনিবাবার ঘুম ভেঙে যায়। নারীমূর্ত্তিটি ছুটে পালিয়ে আসে। মৌনিবাবাও পিছনে ছুটতে থাকে। কিছুটা দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে ওঠে। এক সময় মৌনিবাবা নারীমূর্ত্তিটা ধরে ফেলে। নারী-মূর্ত্তিটা তাঁর কাছ হতে জোড় করে ছাড়াতে চায়। কিন্তু নাছোড়বান্দা মৌনিবাবা। দু-হাত ধরে তাঁর মুখ অবয়ব অবলোকন করতে থাকেন। দহের উঁচু বাঁধটায় নৈশ প্রহরী কুকুরটা ততক্ষণে তার পিছু ধাওয়া করেছে। নারী মূর্ত্তিটি এক ঝটকায় মৌনিবাবার হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে তার আসার পথ ধরে। চিৎকার করতে করতে কয়েকটা কুকুর তাঁর পিছন ধরে। নারীমূর্ত্তিটা এদের এড়াতে আরও জোর দৌড়তে শুরু করে ছ্যারাপানি গ্রামে। কুকুরের চিৎকারে জেগে ওঠে বৃদ্ধ রামচরণ বাবু। ত্রিতলের জানালা দিয়ে তাকায় রাস্তার দিকে, নজর পড়ে নারীমূর্ত্তিটার উপর। ব্যস্ত হয়ে বিছানা হতে উঠে বন্দুকটা নিয়ে নিচে নেমে আসেন। নারীমূর্ত্তিটা সিংহদরজা বন্ধ করে তাদের ঘরের ভিতর ঢুকে আসছে। দ্বিতীয় দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়ায়। রামচরণবাবু চিৎকার করতে থাকেন চোর চোর……

গায়ত্রীদেবী চিৎকার করে বলে ওঠে—রামকাকা আমি গায়ত্রী।

তুমি এত রাত্রে ?

এই চিৎকারে অচলাও নীচে নেমে এসেছে। জিজ্ঞেস করে কি হল দিদি।

গায়ত্রীদেবী উত্তর দেয় না। কিছু না বলে উপরে তার কক্ষে চলে আসে। তখনও গায়ত্রীদেবীর দৌড়ানোর শ্বাস কষ্ট যায় নি। রামচরণবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন—দিদিমণি এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে ?

রাত্রে ঘুম আসেনি। তাই একটু বাইরে পায়চারি করছিলাম।

কিন্তু এভাবে অচলাকে সঙ্গে না নিয়ে।

অনর্থক ওর ঘুম নষ্ট করে কি লাভ।

কিন্তু যদি আমি গুলি করতাম, আর তুই কিরে অচলা, গায়ত্রী মরে গেলেও তুই টের পাবি না।

মরে গেলে বোধহয় ভাল হত। অচলার কি দোষ, আমি তো ডাকি নি। বেচারা সারাদিন আমার সেবা নিয়ে ব্যস্ত। ওকে কিছু বলো না রামকাকা।

না কিছুই বলব না। তোমার উপর হয়ে তো কোনদিন কিছু বলতে পারিনী দিদি। তবে একটা কথা বলব তুমি যেন এই বংশে কালি লেপন করো না।

তুমি আমাকে এই ভাবলে রামকাকা।

দিদি রাতের অন্ধকারে তুমি নিশ্চয় চুরি করতে বেরোয়নি। এতদিন ধরে তোমাকে দেখছি, তোমার সাহসও জানি, তাই তো সন্দেহ হয় তুমি কারো প্রতি আসক্ত। আর একদিনে ধরা পড়নি, আগে কত দিন গিয়েছো তুমি কে জানে। তার চেয়ে বল কে সেই ব্যক্তি। আমি নিজে হাতে তোমার সংসার পাতার ব্যবস্থা করে দেব।

ছিঃ রামকাকা একথা তুমি বলতে পারলে।

দিদিমনি তোমার বাবা বেঁচে নেই। সে দায়িত্বটুকু আমিই পালন করছি বলেই বললাম কথাটা।

রামচরণবাবু আর দাঁড়ায় না। নিজের কক্ষে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে এই সমস্যার সূত্র আবিস্কারে মগ্ন হয়।

গায়ত্রীদেবী শুয়ে পড়েন। অচলা পাশে শুয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে জিজ্ঞাসা করে - সত্যি করে বলতো দিদি তুমি কোথায় গিয়েছিলে। জীবনের মায়া পর্যন্ত তোমার হল না।

গায়ত্রীদেবী অচলার চোখ শাড়ীর আঁচল দিয়ে মোছাতে মোছাতে বলেন "জীবনের ছন্দ যাদের হারিয়ে গেছে তাদের জীবনে কি লাভ অচলা।"

বেশ তো ছিলে। হঠাৎ কি যে হল তোমার। তবে তুমি ভুল করছ দিদি।

হয় তো তাই। প্রমাণ দু-একদিনে পাওয়া যাবে। নে আর কথা বলিস না। ঘুমিয়ে পড়।

অচলা আর কিছু বলতে সাহস পায় না। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে এক সময় নিদ্রাদেবীর কাছে আশ্রয় নেয়।

গায়ত্রীদেবীর কিন্তু ঘুম আসে না। একি দেখলেন তিনি। রাধামাধব একি খেলায় মত্ত করালেন তাকে। কেন তিনি এমন দেখলেন। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে এক সময় রাত্রিটা শেষ হয়ে এল।

ভোর হতেই অচলাকে ডেকে মুখহাত ধুয়ে শুদ্ধ বস্ত্র পড়ে প্রতিদিনকার মত আজও বেরিয়ে পড়েন বাগানের দিকে পুষ্প চয়নের জন্য। সে পর্ব সমাধা করে মন্দির প্রাঙ্গণে বসে অশ্রুজলে পুষ্পগুলো সিক্ত করে মালা গাঁথতে থাকেন অচলাকে সঙ্গে নিয়ে।

অচলা অবাক হয়ে বলে, তুমি কাঁদছ কেন দিদি।

তুই একদিন বলেছিলি না এত চোখের জল কার জন্য জমা করে রেখেছো। আজ আর জমা রাখব না সব শেষ করে দেব। চল স্নানটা সেরে আসি।

এ হেঁয়ালী অচলার বোধগম্য হয় না। দুজনে বেরিয়ে আসে স্নানের জন্য।

পর্ব—৮

সকাল হতেই রামচরণবাবু নায়েবী চালে তার বিলাসপুর মহালের দেখা শুনার লোক শশীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়া হন। গায়ত্রীদেবীর সম্পত্তির এককণা নষ্ট হলে তাঁর বুকে ঘা পড়ে। এই মহালের ত্রিশ বিঘে জমি বিলি হবে শোনার পরদিন হতে তিনি যেন হতাশায় ভুগছেন। যেন তাঁরই সর্বস্ব চলে যেতে বসেছে। অথচ গায়ত্রীদেবীর মগজে বিষয়বুদ্ধি কোনদিন ঢোকাতে পারলেন না তিনি।

শশিভুষণ তার মনিবকে দেখেই বলে ওঠে—আসেনবাবু, আসেন। আর বোধহয় ভুঁইগুলো দখলে রাখতে পারবো না। পঞ্চায়েত প্রধান গৌরবাবু বলে গেছেন যে ভুঁইগুলো এবার ছাড়তে হবে।

রামচরণবাবুর মেজাজ সপ্তমে ওঠে। চিৎকার করে ওঠেন, তুই ব্যাটা নচ্ছার মর্। ফসলের অধিকাংশ ভোগ করছিলি, অত সাধু সেজে থাকলে তোরই যাবে। শালা ভীতু, অপদার্থ, রাগে গজগজ করতে করতে ওখান হতে উঠে পড়েন রামচরণবাবু, সোজা পঞ্চায়েত অফিসের দিকে।

পঞ্চায়েত প্রধান গৌরবাবু অফিসে কর্মরত। বয়সে রামচরণবাবুর চেয়ে অনেক ছোটো। রামচরণের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ে প্রধান সাহেবের উপর। অফিসে ঢুকে বিনা অনুমতিতেই একটা চেয়ার দখল করে প্রধান সাহেবের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন—কি গৌরভাই একে একে সব নিয়ে আমার দিদিমনিকে ভিক্ষা করাবে নাকি।

নায়েব মশাই বিলাসপুর মহালের ত্রিশ বিঘে জমি বিলি হবে।

তা করবে বৈকি। দুটো মহালের জমি নিয়েও তোমরা খাস্ত থাকলে না। দিদিমনির সংসার কি করে চলবে সে চিন্তা তোমাদের নাই।

আপনারা তিনজন লোক, অত জমি নিয়ে কি করবেন।

তোমরাও ত চারজন লোক। জমি আপন হালে চাষ করছ। চাকরী করছ, তোমরাই বা কি করবে।

একটু থতমত খেয়ে যান গৌরবাবু।

না মানে সিলিং এর বাইরের জমি তো দিতেই হবে।

হ্যাঁ তা দিতে হবে বৈকি। তিরিশ বিঘে জমি থেকে বছরে একশ টিন ধান পেতাম বাকী সব লোকেই খেত। সেটাকে বন্ধ করবে বৈকি।

আপনারা একদিন ঐ জমি সুদের সুদ তস্য সুদ বা হিসাব ভুল করে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে ছিলেন, শোষণ আর অত্যাচারের শেষ ছিল না।

তা ছিল না স্বীকার করি, তবে এখনও নাই সেটাও বলতে পারি না।

শোষণ আর অত্যাচার কোনদিন দেশ থেকে বিদায় দিয়েছি তার ঠিক নেই। এখন অবহেলিত অত্যাচারিত মানুষ অন্ততঃ মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারে।

তুমি হাঁসালে গৌর। এখন আগের সবই আছে শুধু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

কি যা তা বলছেন নায়েব মশায় অফিসে বসে।

যা বলছি ঠিকই বলছি। দেখ নেতাগিরিতে কম পয়সা লুটছে না। এটাকে কি বলব ভাই। এটা শোষণ নয় ?

কার পয়সা কে লুটছে। সে রকম নেতাকে আমরা নিই না।

একটা কথা বলব গৌর, রাগ করো না, তুমি নিজের কথা চিন্তা করো। তোমার কি ছিল আর কি করলে। একটা চাকরী শুধু ছিল। তার দ্বারা কোন মতে সংসার নির্বাহ হ'ত, আজ পনের বছর পর তোমার কি নাই বলতে পারো। গাড়ী, বাড়ী, জমি এর হিসেব কোন আয় থেকে দেবে ভাই।

একেবারে চুপসে যান গৌরবাবু। সাদা মুখে নিমেষের মধ্যে রক্ত জমে ওঠে। ঝাঁঝিয়ে ওঠেন—যান এখান থেকে। সুদখোর জমিদারের জাত আপনারা। সাধারণ মানুষদের একদিন জুতো পেটা করতেন। যান্ ওখান হতে জমি বিলি হবে একমাসের মধ্যেই। এ নিয়ে কোর্টের আশ্রয় নেবেন না। নিলে জমি হতে একচুল ফসল পাবে না।

আমার দিদিমনি যে ফসলের কাঙাল নয় গৌর। সেবারের বন্যায় গায়ের গহনা বিক্রি করে আর্ত্ত মানুষদের তিন মাস পুষেছিল। তোমার শাসন ক্ষমতায় থেকেও যা পারনি। সামান্য একটা টাকা হারালে তার বেদনাও কম নয়। তুমি নিজে হারিয়ে তা উপলব্ধি করতে পার, তাই বলি একটা মানুষের কাছ হতে সর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়ার আগে একটু চিন্তা কর। এ চিন্তা একদিন আমার ছিল না। ধন সম্পত্তি রক্ত নিয়ে মনিব তুষ্ট করে ধন সম্পত্তি বাড়িয়ে ছিলাম, সেই অভিশাপে আমি সব হারালাম, কেন হারালাম একটু চিন্তা করলেই এর উত্তর পাবে।

যান যান এখান থেকে, বাজে বকবেন না। আমার কাজ আছে।

আমিও অকাজের লোক নই গৌর আমারও কাজ আছে। একটা কথা জেনে রাখ হয়কে নয় করতে যেও না। তাহলে তোমারও একদিন নয় হবে। এ আমার সারাজীবনের উপলব্ধি।

ওখান হতে বেরিয়ে পড়েন রামচরণবাবু। আপন ঘরের দিকে। তখন প্রায় সূর্য তাদের জমিদারীর মত মুখ্য গগন হতে ঢলে পড়েছে। সমুদ্র গর্ভে নিজেকে আত্মগোপন করতে।

CENTRAL LIBRARY

ছ্যারাপানি এবং আশে পাশের গ্রামে রটে গেছে মৌনিবাবার রহস্যজনক অন্তর্ধান। প্রধান চ্যালা গোবিন্দ আশ্রমে জোড় হাতে গুরুবন্দনায় ব্যস্ত। তিনি নাকি চাক্ষুস করেছেন। মৌনিবাবার শরীরটা হঠাৎ ধোঁয়ার আকার ধারণ করে আকাশে উড়ে গেছে।

পাড়ার অলি গলিতে শুধু মৌনিবাবার কথা। পারুল পুকুর ঘাটে বেশ কয়েকজন পড়শীর সঙ্গে স্নান সারতে সারতে বলে—দেখলি মৌনিবাবার মহাত্ব। সাক্ষাত দেবতা। আর চেহারাটা কি।

কে একজন টিপুন্নি কাটে তা যা হবে হোক ওই গায়ত্রী ছুড়িটার কাণ্ড দেখলি।

অমন দেবতার পাড়া লোকের উপর চোখ পড়েছিল। ওই পাপে বোধহয় মৌনিবাবা উধাও হলেন। ওরা ভগবানের অংশ মানুষকে ধরা দেবে কেনে।

আর একজন এর প্রতিবাদ করে তোর সব সময় ঐ কথা, ঐ সব কথা মুখে আনাও পাপ।

যা সত্যি তাই বলছি, পাশের বাড়ী মেনকা, ও সব শুনেছে। গায়ত্রী কাল রেতে বেরিয়েছিল। নায়েব রামচরণ ওকে হাতে নাতে ধরেচে।

প্রতি উত্তর করেন মহিলাটি—যাক ভাই ওসব কথা মুখে এনে আর পাপের বোঝা বাড়াব না।

প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা পড়ে। স্নান সমাপ্তান্তে যে যার ঘরে ফেরে।

গায়ত্রীদেবীর কানেও মৌনিবাবার অন্তর্ধানের কথাটা উঠেছে। এ সংবাদ তাকে শয্যাগত করেছে। মন্দিরে আজ ঘন্টা বাজেনি।

অচলা বলে—দিদি চল স্নানে যাবে না।

নারে আজ আর যাব না।

সেকি তোমার শরীর খারাপ নাকি।

হ্যাঁরে।

কই গায়ে তো জ্বরটর কিছু নেই। গায়ে হাত দিয়ে বলে অচলা।

কে জানে জ্বর আছে কিনা।

না নেই, তুমি ওঠতো। চল স্নান সেরে আসি। মন্দিরে পূজোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

না আর পূজা করব না অচলা, কি দিল আমাকে ঠাকুর।

তুমি কি চেয়েছিলে দিদি। একজন মৃত মানুষকে কাছে পেতে চেয়েছিলে। সে দেওয়া কি কোনদিন সম্ভব।

ঠাকুর কেন তাকে ভোলাচ্ছে না। আমাকে পাগল করছে না কেন।

সংসারে কোন কিছুই যে চিরস্থায়ী নয় দিদি, যে হারিয়ে যায় সে কোনদিন আর ফেরে না, তুমি মনকে সুস্থ কর। চল স্নান সেরে আসি।

এক রকম জোর করেই নিয়ে যায় অচলা তাঁকে ছ্যারাপানির দহে স্নান করাতে।

গায়ত্রীদেবী 'দহে'র পাড় হতে নির্নিমেষ নয়নে আশ্রমের দিকে চেয়ে থাকেন। গণ্ড বেয়ে অঝরে অশ্রু ঝরতে থাকে, বার বার তাঁর বিবেক তাকে খোঁচা দেয় কেন সে রাত্রে মৌনিবাবাকে দেখার জন্য গিয়েছিল হয়তো সেজন্যই উনি এখান হতে চলে গেছেন। তাঁর ইচ্ছা জাগে চোখ দুটোতে আঘাত হেনে অন্ধ হতে। পাপ চোখ না থাকলে হয়তো এ ঘটনা ঘটত না। তবু লোকটাকে একবার করে দেখা যেত। গত কালের কৃতকর্মের জন্য এই চোখ দুটোকে সে দায়ী করে। আঙ্গুলের খোচা দিয়ে একটা চোখে সজোরে আঘাত হানে, চোখ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। অচলা ছুটে আসে।

"তুমি পাগল হয়ে গেলে দিদি"। দুহাতে তাঁর হাত দুটোকে ধরে বলতে থাকে।

সেই ভাল, ঠাকুরের কাছে আমার এইটুকু কামনা। আঘাতে চোখের কোনায় একটু কেটে গেছে। সে স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকে।

অচলা শাড়ীর আঁচল দিয়ে সে স্থানটা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে দিদি তুমি শান্ত হও। মনকে আর অশান্তির আগুনে জ্বালিয়ো না, ও ব্যাটা সাধু নয়। ও নিশ্চয় তুক জানে, তোমাকে তুক করেছে, আজই আমি ওঝা ডেকে আনব। একটু ঝাড় ফুক করে দিলেই ঠিক হবে।

চোখের ক্ষতটা হতে রক্তঝরা বন্ধ হয়েছে। সামান্য একটু ফুলে গেছে। অচলা একহাতে গায়ত্রীদেবীকে ধরে আনে। নিজের হাতে কাপড় বদলিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

মন্দিরের স্তোত্র পাঠ আজ অচলা সমাধা করে। তাড়াতাড়ি রান্না সেরে গায়ত্রীদেবীর কাছে এসে বসে। মাথায় হাত বুলোতে থাকে। বেলা গড়িয়ে গেছে। গায়ত্রীদেবীকে অনেক সাধ্য সাধনা করেও এখনও আহারে বসাতে পারেনি অচলা।

এমন সময় চেঁচাতে চেচাঁতে রামচরণ বাবু হাজির হন। বলতে থাকেন -দিদিমণি বিলাসপুর মহালের ত্রিশ বিঘে জমি গেল। গৌর প্রধান আজ স্পষ্ট জানিয়ে দিলে।

শোনামাত্র ঝাঁঝিয়ে ওঠেন গায়ত্রীদেবী, তোমাকে কত দিন বলেছি রামকাকা জমি নিয়ে মাথা ব্যাথা আমার নেই, সব যাক। তোমাকে শেষ কথা বলছি আর কোনদিন তুমি জমির ব্যাপারে কোন কথা বলবে না।

এ কি বলছ তুমি! তা বললে চলে?

হ্যাঁ চলবে। এক কথা হাজার দিন কেন তোমাকে বলতে হবে। জমি যায় যাবে, আমার যাবে তাতে তোমার কি?

তোমার আমার আলাদা, এত বড় কথা বলতে পারলে দিদিমণি।

হ্যাঁ তুমি বলতে বাধ্য করালে। যাও এখান হতে।

ক্ষুণ্ণমনে আপনকক্ষে প্রস্থান করেন রামচরণ বাবু। গায়ত্রীদেবীর কথাটায় আঘাত পেলেন তিনি। স্ত্রী ছেলে মারা যাবার পর হতে আপন মনে মেয়ের মতই দেখে এসেছেন তিনি। মনে

করাটা হয় তো ভুল হয়েছে তাঁর এটাই আজ উপলব্ধি হল। অচলা খাবার জন্য ডাকে। রামচরণবাবু অভিমানে মধ্যাহ্নে খাওয়া বন্ধ করেন। মনে মনে ঠিক করেন এখানে আর তিনি থাকবেন না।

সেদিনকার মধ্যাহ্ন বাড়ীর প্রত্যেকের অনশন অবস্থায় কেটে যায়। গায়ত্রীদেবীকে অনেক সাধ্য সাধনায় রাত্রে আহারে বসাতে প্রবৃত্ত করে অচলা। কিন্তু রামচরণবাবু পোটলা বেঁধে ঠিক করে ফেলেছেন সকালে এখান হতে চলে যাবেন। অচলা জানায় কথাটা গায়ত্রীদেবীকে।

গায়ত্রীদেবী আস্তে আস্তে উঠে রামচরণের কক্ষে গিয়ে হাত দুটো ধরে বলতে থাকেন—আমার মাথার ঠিক নেই রামকাকা। সকালে তোমাকে কথাগুলো বলে আমার মনটা ভীষণ খারাপ, চল খাবে চল।

অভিমানে একেবারে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠেন রামচরণবাবু। না আর খাব না, অনেক খেয়েছি তোমাদের।

ছিঃ রামকাকা, তুমি আমার বাবার মত। একটা কথা বলে ফেলেছি বলে তুমি কি ক্ষমা করবে না ?

রামচরণবাবু এবার ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠেন, তাহলে আমি জমির জন্য কেস্ করব। ঐ জমি আমি কিছুতেই ওদের হাতে তুলে দেব না। দেখাব ওদের, আমাদের ক্ষমতা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

বেশ তাই দেখাবে। জমির ব্যাপারে তুমি যা ভাল বোঝ তাই করবে। চল খেয়ে নেবে।

আস্তে আস্তে উঠে যান আহার কক্ষের দিকে। অচলা খাবার এনে দেয়।

একে একে সকলের অনশন পর্ব্ব কাটে।

সকলে নিদ্রাদেবীর সাধনায় মগ্ন। গায়ত্রীদেবীর কাছ হতে নিদ্রাদেবী গতকাল হতেই বিদায় নিয়েছে। অচলা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সান্ত্বনা দিতে থাকে, দিদি কাল শ্যাম ওঝাকে ডেকে আনব। বলা যায় না কার শরীরে কখন প্রেত ভর করে থাকে।

না ওসব করিস নে। পাঁচটা লোকে পাঁচ কথা বলবে।

কার বলায় কি যায় আসে। আমি কাল ওকে ডেকে আনব এখানে! তোমাকে তো বাঁচাতে হবে।

যদি বাঁচি এমনিই বাঁচব অচলা, ওসব আমি বিশ্বাস করিনে।

নানান্ কথায় রাত্রি বারোটা পার হয়, এক সময় অচলার দেহটা শয্যায় ঢলে পড়ে নিদ্রাদেবীর রাজ্যে। গায়ত্রীদেবীর মন নানা স্মৃতির বেড়া জালে বেষ্টিত হয়ে অন্যরাজ্যে পাড়ী দেয়। কিছুতেই ঘুম আসে না। ঘন্টা তিনেক পর এক সময় তার চোখ দুটো বন্ধ করে নিদ্রাদেবী তাঁকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে যান।

পর্ব—১০

মৌনিবাবার অন্তর্ধানের প্রায় বৎসর খানেক পার হতে চলেছে। মৌনিবাবার অসীম লীলা এখন ভক্তবৃন্দের দ্বারা প্রচারের ফলে আশ্রমটা আরও জম জমাট হয়ে উঠেছে। বিগত বৎসরে কত নতুন

নতুন সাধু সমাবেশ ঘটেছে এখানে। কিছুদিন থাকার পর আবার প্রস্থান করেছে। গায়ত্রীদেবী ছ্যারাপানির দহে স্নান সেরে প্রতিদিন আশ্রম দর্শন করে যান। এ তার নতুন খেয়াল। বর্তমানে ছ্যারাপানির দহ আর আশ্রম দুটোতেই তাঁর আকর্ষণ।

অচলা কিছু বুঝতে পারে না। ভাবে তার দিদিমনি পাগল হতে চলেছে। আজ স্নান সেরে আশ্রম হতে বাড়ী ফিরছে অচলা ও গায়ত্রীদেবী। বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখে এক অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে রামচরণবাবুর প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা চলছে। রামচরণবাবু বলে চলেছেন—কেন, আমাকে কি আপনার বিশ্বাস হয় না। আমাকে বাদ দিয়ে দিদিমনি কিছুই বলবে না।

না না সে কথা নয় গো, হামি ওনাকে দুচার কথা শুধাবো। টাকা দেব হামি আর হামার জিনিস বুঝে নেব না। তা কি করে হয়।

আরে না হলে আপনি পথ দেখুন। আপনার মত কত খদ্দের আসবে।

হ্যাঁ তা আসবে বটে। তবে নায়েববাবু সকলেই যেচে লেবে, টাকা পয়সার ব্যাপার রইছে না।

আমার থেকে আমাদের দিদিমনি বেশি জানেন না। আপনি যা জিজ্ঞেস করার আমাকে জিজ্ঞেস করুন।

না তা হোবে না। আসল মালিকের কাছে হামার কিছু জানার আছে।

আপনি যান এখান হতে। আমার কাজ আছে।

না না হামি বাগান বাড়ি কিনতে এসেছি। যেতে আসি নাই।

ততক্ষণে গায়ত্রীদেবী ভিজে কাপড়ে জানলা হতে দু'জনের কথোপকথন শুনছিলেন। মীমাংসা না হতে দেখে জানালা হতে জিজ্ঞেস করেন কি হল রামকাকা, কি বলছে লোকটা।

লোকটা গাঁয়ের বাইরে ঐ বাগান বাড়ীটা কিনতে চায়। তোমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছুতেই কিনবে না। ঢের ঢের লোক দেখেছি এমন বাতিকগ্রস্থ লোক দেখি নাই।

আমি যাচ্ছি। তুমি ওকে বসতে বল।

রাধামাধব মন্দিরে স্তব গান শেষ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়ত্রীদেবী নীচে নেমে এসে লোকটিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করতে থাকেন—দীর্ঘ ছ'ফুট লম্বা, পরনে পা-জামা পাঞ্জাবী, মাথায় পাগড়ী, চোখে তার কালা চশমা আটা। দাড়ি থাকলে পাঞ্জাবী বলে মনে হত।

ক্রেতা ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন না। গায়ত্রীদেবীকে দেখেই বলে ওঠেন আপনি মাইজি আছেন।

স্বরটা শুনেই চমকিয়ে ওঠেন গায়ত্রীদেবী। কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁ বলুন।

হামি গাঁয়ের বাইরে ঐ বাগান কিনব ভেবে এসেছি। হামি ওখানটায় একটা ফ্যাক্টরি বসাব, তা কত দাম হোবে।

দামটা নায়েব মশায়ের সঙ্গে ঠিক করে নেবেন। আপনার আর কিছু বলার আছে?

হুঁ হুঁ জরুর আছে।

কি বলুন।

হামি তো এখন ঘর বানাতে পারব না। তা যত দিন ঘর বানাতে না পারি ততদিন যদি এই ঘরে একটা কামরা দিতেন তবে হামার খুব ভাল হত। কারণ ফ্যাকটরিতো একদিনে হোবে না।

তা থাকবেন, অনেকেই তো থাকে।

রামচরণবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে—রামকাকা দোতলায় যে ঘরটা ফাঁকা আছে ওটা ওনাকে দিও। আর বিষয়ের বিষের হাঁড়ি আর রেখে দিও না, বিক্রি করে দিও।

তা কি আর বলতে দিদিমনি। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখছি।

তা শেঠজি বল কত দাম দেবে।

আর হামাকে শেঠজি বলবেন না, হামি পাঞ্জাবি আছি।

ওঃ আচ্ছা, তা বাগানটার দাম কত দেবে বল।

হাজার বিশেক দোব হামি। আপনি হামাকে বাগানটা করিয়ে দ্যান।

অত কমদামে কি হয়। ষাট হাজার লাগবে।

দামটো বেশী বললেন, হামি শহরে থেকে এখানটায় এসেছি, শহরে তো ঐ দামে অমনি জায়গা পাওয়া যা'বে।

আচ্ছা দেখি, তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। তবে এত কম দামে হবে না।

জরুর হবে আপনাদের মাইজি বহুত ভাল লোক আছেন ঠাহর হল। আর বেশি লিয়ে হামাকে ওটা ঠিক করে দিতেই হবে লায়েব মশাই।

ততক্ষণে দুজনে পৌঁছে গেছে দোতলায় খালি কামরাটার সামনে। রামচরণবাবু এসে শিকল খুলে ঘরটা দেখিয়ে দেন। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি তার পোটলা খুলতে শুরু করে। ঘরে পাতা চৌকির উপর কম্বলটা বিছিয়ে ফেলে।

রামচরণবাবু গায়ত্রীদেবীর কক্ষে গিয়ে বলতে থাকেন—দিদিমনি বাগানটার দাম বিশ হাজার উঠেছে কি করবে।

সে তুমি যা ভাল বোঝ কর রামকাকা। বিষয় সম্পত্তিগুলো যা আছে যত শীঘ্র পার বিক্রি কর, তা না হলে আর কিছুই থাকবে না।

আমি পঁচিশ হাজার বলব। যদি আরো কিছু বেশি হয়।

তা তাই বলবে। আর হ্যাঁ ওকে এবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা অচলাকে দিয়ে করেছি। তুমি খাবারটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসো।

আরে ধ্যাৎ তোমার একটু বেশি বেশি। কোথা হতে এসেছে কে জানে। ওর খাবার ভার আমরা কেন নেব।

তা হোক তুমি খাবারটা যেন পৌছে দিও।

তা যখন বলছ তখন দিতে হবে। তবে এক অজ্ঞাত কুলশীল লোককে এভাবে চিন্তা ভাবনা না করে ঘরে ঢোকানো ঠিক হয়নি। তোমার বিষয় বুদ্ধি একবারে নেই দিনিমনি। এরকমটি আর করো না, আপন মনে বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে কক্ষ হতে আপন কক্ষের দিকে রওনা দেন রামচরণবাবু।

গায়ত্রীদেবীর পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের স্বরটা চেনা চেনা লেগেছে। কোথায় যেন শুনেছে এ স্বর। শরীরের আদলটা যেন কেমন ঠেকছে। অনেক ভাবনা চিন্তা করেও এর কোন হদিশ করতে পারে না।

দেখতে দেখতে দিনের আলো নিভে সন্ধ্যে আসে। নায়েবমশায় বাগান বাড়ীর দাম ঠিক করে ফেলেন। তার বিশেষ বিষয় বুদ্ধির দ্বারা জায়গার দাম ঠিক করে তার দিদিমনির কাছে সাবাস আদায় করতে চান, তা পানও। তারপর নৈশভোজন সমাপান্তে আপন আপন কক্ষে আশ্রয় নেন।

গায়ত্রীদেবীর পাশে অচলা ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ত্রীদেবীর ঘুম আসেনি, শুধু আজ বলে নয়, প্রায় আসে না। মৌনিবাবার অন্তর্ধানের পর হতে। আজও আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের গলার স্বর। এ স্বর যেন চেনা। কিন্তু কার এটা সে ঠিক করতে পারে না। চিন্তা করতে করতে একসময় মনে হয় তাঁর, তিনি মানসিক রোগাক্রান্ত। এ তার মনের ভুল। তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা, তার দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ হয়। চমকে ওঠেন তিনি। জিজ্ঞেস করেন কে ?

চাপা ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে আসে, গায়ত্রী দরজা খোল আমি গোলক।

কথা শুনে চমকে ওঠেন। সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর। একি স্বপ্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই হতভম্ভ হয়ে ওঠেন গায়ত্রীদেবী।

আবার শোনা যায়, কি হল গায়ত্রী খোল।

গায়ত্রীদেবী চিন্তা করতে পারেন না। আস্তে আস্তে উঠে এসে দরজার খিলটা খুলে দেন।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি ঘরে ঢুকে কালো চশমা আর পাগড়ী খুলে ফেলে বলতে থাকেন আমাকে চিনতে পারছ গায়ত্রী।

গায়ত্রীদেবী আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে বিহ্বল হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলতে থাকে গোলক।

হ্যাঁ গায়ত্রী আমি গোলক, আমি সেই মৌনিবাবা।

আমি ঠিক চিনেছিলাম। তাইতো সেদিন রাত্রে তোমার কাছে গিয়েছিলাম, সন্দেহের সংশয় কাটাতে। তোমার পায়ের দাগটা পরখ করে জানতে তুমি গোলক কিনা? কিন্তু হঠাৎ জেগে পড়ায় সেদিন আর সম্ভব হল না।

তোমার পাশে শুয়ে মেয়েটা জেগে উঠবে না তো। উঠতেও পারে, তবে ভয় নেই। ও একান্ত আমার। কথাগুলো শেষ হতে না হতে সত্যিই জেগে ওঠে অচলা।

বিছানা ছেড়ে উঠে হকচকিয়ে যায়, বলতে থাকে দিদি, হ্যাঁরে অচলা, আজ পেয়েছি, আমার ঠাকুর মরা মানুষকে কাছে এনে দিয়েছে। এই আমার গোলক।

অচলা আর দাঁড়ায় না ওঘরে, একরাশ হাসি হেসে পাশের ঘরে খিল আঁটে দুজনকে পুরানো দিনে ফিরে যাওয়ার জন্য।

কালকের মৌনিবাবা আজকের গোলক, দুষ্টমি ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে গায়ত্রীর দিকে বলে—তোমার যৌবন তো এতটুকু টসকায়নি।

কপট ধমকে বলেন গায়ত্রীদেবী কোন দিকে চোখ দেখ, গোলককে হাতে ধরে আপন বিছানায় বসায় গায়ত্রী, তারপর বলতে থাকে—জান গোলক তোমাকে যে পেলাম একমাত্র আমার মায়ের পূণ্যের জোরে। তাঁর আশির্বাদ তোমাকে কাছে এনেদিল।

হয় তো তাই, গায়ত্রীদেবীর হাতটা আপন হাতে তুলে নেয় গোলকবাবু। নিমেষের মধ্যে গায়ত্রীদেবীর শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। কথায় জড়তা আসে। তার মাথাটা গোলকের কোলে এলিয়ে দিয়ে বলে জান গোলক আমার জন্য তোমার মৃত্যু হল এই বোধটাই আমার অন্তরে তোমার শূন্যতা বেশী পীড়া দিয়েছে।

আমিও যে অনেক কেঁদেছি গায়ত্রী। কিন্তু আমার জন্য মা বাবার শাস্তি হল এই অপরাধ বোধেই তোমার কাছে ফিরিনি। তা নইলে হয়তো জীবন তুচ্ছ করেও তোমার কাছে আসতে ভয় পেতাম না।

গায়ত্রীদেবীর গেলককে দেখা যেন শেষ হয় না। বিহ্বল নয়ন মেলে গোলকের পানে চেয়ে থাকে।

গোলক তা বুঝতে পেরে ফোড়ং দেয় তোমার যৌবনটুকু তুমি এখনও আমার জন্য ধরে রেখেছো গায়ত্রী। আমার ধর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

এতদিন এত লোকে ভক্তি করে এসেছে আজ তারা তোমায় চিনতে পারলে ঘৃণা করবে।

করুক গে। আমি কাউকে তাবিজ কবজ দিইনি, কাউকে দীক্ষা দিইনি। এতে আমি কোন রকম ভণ্ডামী করেছি বলে মনে করিনা।

তা করনি, কিন্তু ভ্রষ্টা সাধুদের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, তা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে।

সেটা তখন চিন্তা করা যাবে। তাছাড়া এখন আর কেউ আমায় চিনতে পারবে না।

বেশ তা না হয় হল, কিন্তু তোমার না মৃত্যু হয়েছিল ?

হ্যাঁ গায়ত্রী মৃত্যু শাস্তি দিয়েছিলেন তোমার বাবা।

কিন্তু কি ভাবে বেঁচে উঠলে, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারার কথা নয় গায়ত্রী। বাবা মা আর আমাকে তোমাদের লোকেরা আধমরা করে হাত পা বেঁধে গলায় পাথর বেঁধে দহে ফেলে দিয়েছিল। যখন জ্ঞান হল তখন গঙ্গার ধারে আমি এক সাধুর আশ্রমে। কিছুদিন বাদে সুস্থ হয়ে বাবা মাকে খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। তখন থেকে আমি সেই সাধুর আশ্রমেই থেকে গেছি। গত বৎসর সাধুবাবা দেহ রেখেছেন। তাই একা আর ভাল লাগল না ওখানে। ছদ্মবেশে এখানেই আশ্রম গড়লাম পিতা মাতার অন্তেষ্টি ক্রিয়ার জন্য। পাছে চিনতে পারে এই ভেবে কারও কাছে মুখ খুলিনি। এখানে এসে সে কর্মের শেষদিন তোমার দর্শন পেলাম। অনেক ভাবলাম আর ফিরব না। কিন্তু তোমাকে দেখে আবার ফেরার ইচ্ছা হল তাই চলে এলাম।

গায়ত্রী এবং গোলকের স্বপ্নের রাত্রি কিভাবে যে শেষ হল তা তাঁরা টের পায়নি। গায়ত্রীদেবীই প্রথম জানালার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন সকাল হয়ে গেছে। তিনি গোলকবাবুকে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুতে বলে নিজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

গোলকবাবু মুখ হাত ধুয়ে এসে চায়ের প্লেটে চুমুক দিতে আরম্ভ করেন।

রামচরণবাবু অচলার কাছে খবরটা শুনে গায়ত্রীদেবীর সঙ্গে গোলকের কাছে এসে বলতে থাকেন—তুমি গোলক ! কিন্তু এভাবে এলে কেন ? আমার যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ নায়েবমশায় আমি গোলক। তারপর পূর্বের কথা বলতে থাকেন।

সব শুনে রামচরণবাবু গোলককে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন গোলক আমি যে আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছি স্ত্রী পুত্র হারিয়ে। সংসারে এসে একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম মানুষ এ জন্মের অপকর্মের ফল এ জন্মেই পায়, তার আর জন্মান্তর লাগে না। চোখের দু'কোণে জল টলটল করে তাঁর।

গোলক চুপ করে থাকে।

কি ভাই তুমি কিছু বলছ না। আমাকে পুলিশে দাও, আমি সব দোষ স্বীকার করব। আজ আর স্বীকার করতে কোন কষ্ট হবে না। শুধু শাস্তি চাই আমি আমার কৃতকর্মের। চল আমাকে থানায় নিয়ে চল।

সাজা দেবার আমি যে মালিক নই নায়েবমশায়। তাছাড়া আমি যে আর কিছু চাই না, তাই বিগত দিনের কথা মনে রাখিনি। শুনেছি মা বাবার অন্তেষ্টি ক্রিয়া না হলে তাদের আত্মার মুক্তি

ঘটে না। তার জন্যেই এখানে আসা। একবৎসর ছদ্মবেশে ময়ূরাক্ষীর জলে প্রতিদিন তর্পণ করে সে কর্ম শেষ করেছি। আমার কাজ শেষ, কাল চলে যাব এখান হতে।

আমার দিদিমনিকে কোথায় রেখে যাবে ভাই। তোমার ধ্যানে সে আজ তেইশ বছর কাটিয়ে দিলে।

গোলক গায়ত্রীর দিকে তাকায়, দেখে গায়ত্রীর চোখ দুটোতে অসহায় আর্ত্তি ফুটে ওঠেছে। বলে আমি তো বাউণ্ডুলে, ও যদি আমার সঙ্গে থাকতে চায় আমার আপত্তি নেই।

গায়ত্রীর মুখটা খুশীতে ভরে ওঠে।

গোলক বলে গায়ত্রী একদিন মাছ ধরতে যাব ছ্যারাপানির 'দহে'।

একদিন কেন, আজই চল। এই বাড়ীর নীচের তলায় দাশু থাকে ওর মাছ ধরার খুব নেশা। ওর মাছ ধরার সব সরঞ্জাম আছে। অচলা তুই বলে আয় তো দাশুকে।

না আমার জোগাড় আমাকেই দেখে নিতে হবে তা নলে চারায় মাছ আসবে না। ওখান হতে অচলার সঙ্গে চলে আসেন গোলকবাবু তারপর দাশুকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরা সরঞ্জাম জোগাড় করেন, উই পোকার ডিম, বাগান হতে লম্বা লম্বা কেঁচো।

দহে' ছিপ ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বেশ বড় মাছ ধরা পড়ে।

দাশু অবাক বিস্ময়ে গোলকবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে—দাদাবাবুর মত এতবড় মেছোল আমি জীবনে দেখি নাই।

মাছ কি সহজে চারে আসে। এমন চারা কোনোদিন করেছিস্।

না, তা করিনি।

তবে, চল দিন দুই বেশ খাওয়া যাবে। গায়ত্রী তোমাকে নিজের হাতে রান্না করতে হবে কিন্তু।

আমি রান্না করতে ভুলে গেছি। তেইশ বছর মাছের সঙ্গে কারবার করিনি।

এবার সবই পেলে মাছের স্বাদও পাবে, চল।

গোলকবাবু বাড়িতে গিয়ে মাছ কুটতে বসেন। দীর্ঘ তেইশ বছর পর এ বাড়ীতে মাছ রান্না হয়। বেশ আনন্দের মাঝে রাত্রের ভোজন পর্ব সমাধা হয়। গোলকবাবুকে পাশের কক্ষে সুন্দরভাবে বিছানা পেতে দেন গায়ত্রীদেবী। গোলকবাবু মৃদু প্রতিবাদ করেন—এখানে কেন, তোমার কাছে দেবে না।

দেব তবে বিয়ের আগে পর্যন্ত নয়।

দীর্ঘ তেইশ বছরের সাধনায় কোন পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না গায়ত্রী।

হ্যাঁ পারবে, আগে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই তারপর। তা পাঞ্জাবী মশাই বাগান কেনার কি হবে?

আর হবে না পয়সা ফুরিয়ে গেছে।

তাহলে থানায় দেব এবার।

কার থানায়, তোমার থানায়।

হ্যাঁ মশায় হ্যাঁ, চুপ করে শুয়ে পড়, আমি আসব রাত্রি বারোটায়। অনেক কথা আছে।

আর কথা বাড়ান না গোলকবাবু। বিছানায় রাত্রি বারোটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

সকলে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে. নিঝুম প্রকৃতিও তাতে বাদ পড়েনি, কোন দিকে কোন শব্দ নাই।

দরজায় এসে ঠোকা মারেন গায়ত্রীদেবী। গোলকবাবু দরজা খুলে দেন, গায়ত্রীদেবী ঘরে ঢোকেন, ফিসফিস করে বলতে থাকেন – গোলক তুমি না বলেছিলে ফ্যাকটরী বানাবে বাগানে, তার জন্য টাকা চাই, এস আমার সঙ্গে। গোলককে হাত ধরে নীচের তলায় নিয়ে আসেন। এক ছোট কুঠরীর তালা খুলে বলেন এসো। গোলকব'বু তার পিছনে পিছনে আসেন। গায়ত্রীদেবী একটা টর্চ জ্বালে। গোলকবাবু দেখেন একটা ইন্দারা।

গায়ত্রীদেবী বলতে থাকেন এই দেখছ ইন্দারা এই ইন্দারায় এক কলসী মোহর আছে। আমার মা মারা যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তুলব কিভাবে।

তুলতে হবেই, এস দড়ি বালতি আছে। এটার সাহায্যে সব জল তুলতে হবে।

কিন্তু এত জল কক্ষে তো ধরবে না।

তারও রাস্তা আছে। ঘরের ঈশান কোনে একটা ড্রেন আছে এটাকে খুলে দিলেই জল গিয়ে মাঠের জলের সঙ্গে মিশে যাবে, কেউ আর টের পাবে না, গায়ত্রীদেবী ড্রেনের ইটটা সরিয়ে দেন।

গোলকবাবু জল তুলে ড্রেনের পাশটিতে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে জল নিকাশ হয়ে যায়। দীর্ঘ দু-ঘন্টা পর ইন্দারার জল নিঃশেষ হয়। টর্চ ফেলে গায়ত্রীদেবী কিন্তু কিছুই দেখতে পান না।

গোলকবাবু কথাটা বিশ্বাস করতে না পেরে বলেন ধ্যুৎ।

গায়ত্রীদেবী দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠেন – মা নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলবেন না। নিশ্চয় আছে, আমি নীচে নামছি তুমি আমাকে আলো দেখাবে আর দড়িটা ধরে থাকবে।

গোলকবাবু একটু ঘাবড়ে যান আর যদি উঠতে না পার।

তা হলে ভালই হবে, তুমি আবার বিয়ে করবে।

না গায়ত্রী তোমাকে নামতে হবে না। আমিই নামব।

না তা হয় না। তোমাকে টেনে তোলার সাধ্যি আমার হবে না কিন্তু আমাকে তোলার সাধ্যি তোমার হবে। কাজেই আমি নামি।

দড়িটা কোমড়ে বেঁধে দড়ি শক্ত ভাবে হাতে ধরে আস্তে আস্তে ইন্দারার নীচে নামতে থাকেন গায়ত্রীদেবী। নীচে নেমে টর্চটা দেখাতে বলেন।

গোলকবাবু টর্চটা দেখান। বেশ কিছুক্ষণ হাতড়ানোর পর কলসীর কানা হাতে ঠেকে। অনেক কষ্টে সেটাকে মাটির তলা হতে তুলে গোলকবাবুকে বলতে থাকেন গোলক কাজ হাঁসিল, এবার টান।

গোলকবাবু প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে ওপরে তোলেন গায়ত্রীদেবীকে। গায়ত্রীদেবী কলসীর ভিতর হতে দু-চারটে মোহর বের করে দেখান গোলকবাবুকে দ্যাখতো, এগুলো কিসের।

গোলকবাবু টর্চ জ্বেলে দেখেন, বলেন সোনার।

চল এবার এখান হতে যাই।

কুঠরীতে তালা দিয়ে গোলকবাবুর কক্ষে আসেন দুজনে, ফিস ফিস করে বলতে থাকেন কালই তুমি কলকাতায় রওনা দেবে, এগুলোকে নিয়ে বিক্রির জন্য।

কিন্তু এগুলো এক সঙ্গে বিক্রি করব কি করে। লোকে যে সন্দেহ করবে।

তুমি কি করে যে ছদ্মবেশে সাধুগিরি করলে কে জানে। বুদ্ধির ঘট কি শূন্য, আরে দশটা থলি দেব, দশটা দোকানে বিক্রি করবে। তারপর যে ফ্যাকটরী গড়বে সেই ফ্যাকটরীর সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এস, ঐ বাগানে ফ্যাকটরী হবেই।

তুমি কি বলছ গায়ত্রী আমি ফ্যাকটরী করব। তেইশ বছর সাধুর কাছে কাটিয়ে টাকার ধান্দা আমার দ্বারা হবে না।

তাহলে ব্যাঙ্কে ডিপোজিট দিয়ে এস। আর যদি কোন অসুবিধায় পড় আমাদের হাইকোর্টের বাঁধা ব্যারিস্টার অসীমবাবু আছেন ওনার কাছে আমার নাম করলেই উনি সব ঠিক করে দেবেন। দাঁড়াও আমি কতকগুলি ছোট ছোট থলি গড়ি, নিজে সুচ সুতো আর কাপড় নিয়ে আসেন। দশটা থলি সেলাই করেন, মোহরগুলো দশটা থলিতে পুরে বলেন তুমি এবার বেরিয়ে পড় রাত্রি চারটে বাজে, সারে পাঁচটায় ট্রেন। এখান হতে সোজা ষ্টেশনে চলে যাবে।

গোলকবাবু তৈরী হয়ে নেন।

গায়ত্রীদেবী ততক্ষণে চা তৈরী করে এনে গোলকের হাতে দিয়ে বলতে থাকেন সাবধানে যেও কিন্তু।

গোলকবাবু একদৃষ্টে গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিতে থাকেন। আর উপলব্ধি করতে থাকেন গায়ত্রীদেবীর ভালবাসার গভীরতা, চায়ের প্লেট নামিয়ে গোলকবাবু রওনা দেন স্টেশনের দিকে।

পর্ব—১২

দুদিন পর গোলকবাবু কোলকাতা হতে গ্রামে ফেরেন। অচলা ফিরতে দেখে তাড়াতাড়ি খবর দেয় গায়ত্রীদেবীকে।

গায়ত্রীদেবী মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেন—কি হল পাঞ্জাবীবাবু আপনার ফ্যাকটরী হচ্ছে তো?

নিশ্চয় হবে, তবে লোহা লক্করের নয়। ধান, আলু, গম ইত্যাদি উৎপাদনের কারখানা।

সেই ভাল, তাহলে কারখানা কবে হতে চালু হতে চলেছে ?

ট্রাকটারের চেসিস বুক করে এলাম। দিন পনের পর আসবে।

বাঃ বেশ হবে। অচলা তুই হাঁ করে দেখছিস কি, দাদাবাবুর জন্য শরবৎ নিয়ে আয়। ব্যাবসাদার লোক শহর হতে এসেছে। কথাগুলো বলে মুখ টিপে হাসতে থাকেন। অচলা পাল্টা হেসে চলে যায়।

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করেন, 'দাম কত হল' ?

প্রায় পাঁচ লাখ। তার মধ্যে দেড় লাখ দিয়ে চাষের সরঞ্জাম আনানোর ব্যবস্থা করেছি। ঐ বাগানটায় এবার সোনা ফলাব। শ্যালো বসিয়ে চাষ আবাদ শুরু করলে ফ্যাকটরি থেকে আয় অনেক বেশী হবে। আর এই নাও ব্যাঙ্কের পাশবুক দুটো, ব্যাঙ্কে জমা রেখে এসেছি বাকি টাকা।

ও তোমার কাছে থাক, বিয়ের যৌতুক। মা তার জামাই এর জন্য রেখেছিলেন।

গায়ত্রী আমি তোমার যোগ্য কি হতে পারব।

যোগ্য বলেই তো এতদিন অপেক্ষা করে আছি।

অচলা শরবৎ-এর গ্লাস ও জল খাবার নিয়ে এসে গোলকবাবুর হাতে তুলে দেয়।

গায়ত্রীদেবী আজকের রান্নার ফর্দটা মনে পড়িয়ে দেন অচলাকে।

অচলা আর দাঁড়ায় না, রান্না ঘরে গিয়ে গায়ত্রীদেবীর কথা মত ব্যঞ্জন রন্ধনে মগ্ন হয়।

একটু পরেই রামচরণবাবু হাজির হন। গোলককে দেখেই বলে ওঠেন—কি গোলক ভাবলাম আবার ভেগে পড়লে কি না, আর এখান হতে কোথাও নড়া হবে না বলে দিলাম। আর দিদিমনির ২৮শে অগ্রহায়ণ বিয়ের দিন ঠিক করে এলাম। খুব ধুমধাম হবে কিন্তু বিয়েতে।

গায়ত্রীদেবী বললেন সে পরে চিন্তা করবো খন, এবার সম্পত্তিগুলো রক্ষা করতে হবে, তার জন্য যেটুকু করার করবে।

এই না হলে জমিদারের মেয়ে। তুমি নিশ্চিন্তে থাক দিদিমনি, মরা শরীরে মগজের দাম এখনও কত তা দেখাব এবার, বেশ যাই, খেয়ে আবার ছুটতে হবে বিলাসপুর মহলে।

হ্যাঁ যাও রামকাকা।

প্রায় মাস খানেক গত হয়। ট্রাকটার নিয়ে নতুন ড্রাইভার আসে। গোলকবাবু ট্রাকটার চালানো শিখে নিজেই জমি চষতে শুরু করেছেন। প্রায় পঁচিশ বিঘে বাগান বাড়ির গাছগুলো শ্রমিক দিয়ে কেটে ট্রাকটারের সাহায্যে সমান করে ফেলেছেন, দুটো ডিপটিউওয়েল বসিয়ে চাষ করে ধান রোয়া পর্ব সমাধান করেছেন।

একদিন অচলা গায়ত্রীদেবী গোলকবাবুর সঙ্গে বাগান বাড়ীতে আসেন। দেখেন সত্যিই কারখানা বানিয়েছেন গোলকবাবু। তারিফ মনে মনে করেও ক্ষান্ত হন না গায়িত্রদেবী একসময় প্রকাশ করে ফেলেন। গোলক সত্যিই নতুন কারখানা এ লোহা লক্কর থেকে অনেক দামী। তবে প্রথম বছর সব ফসল কিন্তু আমাদের বিয়েতে খরচ হবে। জান গোলক আমার মা দুঃস্থ কাঙালদের খাওয়াতে ভালবাসতেন।

বেশ তো তাই হবে। এতো তোমারই দান গায়ত্রী।

কে বলেছে আমার দান। দান তোমার মাটিকে ভালবাসার।

তুমি ঠিক বলেছ গায়ত্রী সত্যি মা মাটিকে আমি সমান চোখে দেখি, আমি মায়ের মতই মাটিকে ভালবাসি, জান গায়ত্রী বাবা আমায় বলতেন—মাটি কোনদিন বেইমানি করতে জানে না।

বেশ আনন্দে মাস চারেক কাটে, বিবাহের দিন আগত হয়। প্রচুর ধান ফলেছে জমিগুলোতে, সেই ধানগুলো বিয়েতেই খরচা হবে। গোটা এলাকা নিমন্ত্রিত। বিয়েতে প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ হাজির হয়েছে। বিয়ের সানাই বেজে চলেছে। অচলা গায়ত্রীদেবীকে গেরুয়া বসন ছাড়িয়ে বেনারসী শাড়ি পড়িয়ে প্রতিমার মত সাজিয়ে বয়সের মাপ কাঠিকে অনেক নীচে নামিয়ে ফেলেছে।

বিয়ের আসরে বর সেজে এলাকার অতিপ্রিয় মৌনিবাবা সকলের চোখে ধুলি দিয়ে গোলকবাবু সেজে বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। রামচরণবাবুরও আনন্দের শেষ নেই আত্মীয় পরিজন আপ্যায়ণ করতে করতে বলতে থাকেন—এ আমার গায়ত্রী মায়ের তপস্যা। বহু তপস্যার দ্বারা এ সম্ভব হল। মা আমার সাক্ষাৎ সাবিত্রী।

ছন্নছাড়া

কেশব ভট্টাচার্য্য (হাওড়া)

ছন্নছাড়া জীবনের আবার কি হিসেব চাও তুমি ?
মিল যেখানে নেই, অনবরত সংশয়—
পোড় খাওয়া জিনিসের মত অপলক।
ঝড় উঠলে এক ঝটকায় আলো ফালো
নিভে একাকার।
অহংটা আমার তবুও যায়না
কেন যে ও বদ্ধ তা আমিই জানিনা।

পানপাত্র পূর্ণ, মদির পেয়ালায়
আকণ্ঠ নিমজ্জিত
তোলপাড় করছি শুধু বিফল প্রত্যাশায়
আসলে
আমার জীবনই ছন্নছাড়া
সে অনবরত বয়ে চলে
উজানের টানে বা বিপরীতে।

হামাম মঞ্জিলের হিন্দু মন্দির

এ. কে. সেন

রাজস্থানের মরুভূমি, পশ্চিম দিগন্তে জয়শলমীর রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে, সিন্ধুপ্রদেশের ভিতর ঢুকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপরে ধীরে, ধীরে, তার রুক্ষ প্রকৃতি বদলে যেতে সুরু করলো। হঠাৎ সিন্ধুনদীর অববাহিকার পূর্ব্বপ্রান্তে প্রায় একশ, দেড়শ মাইল কিংবা, তারও কিঞ্চিৎ বেশী দূরে এসে থমকে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে রুক্ষ মরুভূমি যতই সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তী হতে লাগলো, ততই সবুজ গাছপালা, শস্য শ্যামলা হয়ে উঠতে লাগলো। সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রান্তে, প্রকৃতি শস্য শ্যামলা সবুজ প্রান্তর প্রায় দেড়শ মাইল কিংবা তারও কিঞ্চিৎ বেশী বিস্তৃত ভূখণ্ডের পর আবার ধীরে ধীরে প্রকৃতি রুক্ষ ধূসর মরুভূমিতে পরিণত হলো। যতই পশ্চিমে অগ্রসর হবে, ততই প্রকৃতি রুক্ষ, ধূসর বালুকাপূর্ণ ও গভীর হতে গভীরতর মরুভূমিতে পরিণত হল, বেলুচিস্থানের সীমানার ভিতরে। রাজপুতনার মরুভূমির আর বেলুচিস্থানের মরুভূমির প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও, দৃশ্যগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য চোখে পড়ে। বেলুচিস্থানের বালির উপরে অজস্র মসৃণ উপলখণ্ড বিছানো যেটা রাজস্থানের মরুতে বিশেষ দেখা যায় না। আর একটা বৈচিত্র্য দেখা যায় যে রাজপুতনা মরুভূমির বুকে উটের খাদ্য—এক প্রকার কাঁটাগাছের ঝোপ, যদিও বেলুচিস্তানের মরু হতে অনেক কম। মাইলের পর মাইল শুধু বালি আর পাথরের নুড়ি। লোকজনের সংখ্যা খুবই কম, তাও যেখানে প্রকৃতির নিয়মে সামান্য জলের ব্যবস্থা আছে, তাকেই ঘিরে ঐ জলের চারিদিকে কিঞ্চিৎ গাছপালা আর মাটীর ঘর, উট আর গাধা—ছোট্ট একটি গ্রাম বা জনপদ গড়ে উঠেছে। বেলুচিস্থানের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পশ্চিমের দিকে যতই এগোনো যাবে, প্রকৃতি ততই কঠিন রুক্ষ। বেলুচিস্থানের পশ্চিমে ইরান। হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশ মোটামুটীভাবে ইরান ও বেলুচিস্তানের মধ্যে সীমানা রেখা বলা চলে। ঐ পর্ব্বতমালার উভয়পার্শ্বে প্রকৃতির খেয়ালে কিঞ্চিৎ বেশীমাত্রায় জলের ব্যবস্থা থাকায়, লোকজনের বসতি দেখা যায়। আবার দক্ষিণে আরব সমুদ্রের তীর হতে পঞ্চাশ ষাট মাইল পর্য্যন্ত ভূমির প্রকৃতি সামান্য ভিন্ন। উত্তরে আফগানিস্থান ও হিন্দুকুশের উচ্চ জটামালায় ঢাকা। উত্তর অংশে মধ্য এশিয়ার হিমপ্রবাহ হিন্দুকুশের অজস্র রন্ধ্র দিয়ে এই অঞ্চলে এসে রুক্ষ রুদ্র প্রকৃতিকে শান্ত ও শীতল করে। এই অঞ্চলের গরমকালের তাপমাত্রা ১০০°-১০৫° ডিগ্রী মধ্যে থাকে। বর্ষাকাল বোলে কিছু নেই। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মাইনাস পাঁচ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হতে দেখেছি। অজস্র তুষার পাত এবং সারা অঞ্চল বরফে ঢেকে যায়। যতদূর দেখেছি, এই অঞ্চলটা প্রায় দেড়শ মাইল চওড়া। বেলুচিস্থানের মধ্যভাগ মরুভূমি। বেলুচিস্থানের প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত। সারা বেলুচিস্তানে বসতি নেই। বোধহয়

সেই সময়—পনর কুড়ি লক্ষ'র অধিক লোকের বাস ছিল না। গ্রীষ্মকালে ঐ বরফ গলে গিয়ে জমি আদ্র হয়ে উঠত এবং তখন অজস্র গোলাপ গাছের ঝোপ ফুলে, ফুলে ভরে উঠতো। যেদিকে তাকাও সেদিকেই গোলাপ গাছ। ঐ বন্য গোলাপ ফুলের নির্য্যাস বের কোরে আতর তৈরী করা, ওদিককার লোকেদের একটা বড় অংশের ব্যবসা ছিল। আর ছিল অজস্র আঙুরের ক্ষেত। আর অজস্র ডালিমের গাছ (আনার)। ডালিমের ফুলে চারিদিক লালে লাল। আর আছে বড় বড় জর্দ্দালুর (পীচ্) গাছ। গাছে অজস্র ফল। তরমুজ, সর্দ্দা, খরমুজা ক্ষেত। গ্রামাঞ্চলে মাইলের পর মাইল এই দৃশ্য। কোয়েটা ও চমনের ফলের বাজার তখন বিশ্ববিখ্যাত ছিল। চমন কোয়েটা হতে প্রায় ষাট মাইল পশ্চিমে, তখনকার ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমানার শেষ জনপথ। ছোট্ট শহর কিন্তু বিরাট ফলের বাজার। কান্দাহার অঞ্চলে যত ফল, সব চমনে এসে জমা হতো। আর বেলুচিস্তানের ফল নিয়ে কোয়েটা হয়ে ট্রেনে সেই ফল লাহোর দিল্লী হয়ে কোলকাতা পর্য্যন্ত আসতো। সপ্তাহে তিনদিন ফলের স্পেশাল ট্রেন ছিল। তখনো এয়ারকণ্ডিশন ট্রেনের ব্যবস্থা চালু হয়নি। তাই ঐ ফল সংরক্ষণের জন্য চাঁই চাঁই বরফের স্তূপ প্রত্যেক ফলের কামরা গুলিতে দেয়া হতো। প্রত্যেক বড় স্টেশনেই বরফ দেবার ব্যবস্থা ছিল। মনে রাখা দরকার যে এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই ছিল ফলের মরশুম। আর সে সময় উত্তর ভারতের প্রচণ্ড গরম, লোহার কামরা বন্দী ফলের বাক্সগুলি রক্ষা করতে কী পরিমাণ বরফের প্রয়োজন হতো—সেটা সহজেই অনুমান করা যায়—মনে রাখতে হবে চমন হতে কোলকাতা আড়াই হাজার মাইলের উপর আর উত্তর ভারতের গ্রীষ্মকালীন গরমের ভিতর দিয়ে ঐ ফলের ট্রেনগুলিকে যেতে হতো। রেল কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ফল যাতে কলকাতা পর্য্যন্ত প্রায় আশী ঘণ্টার রাস্তা টাটকা অবস্থায় থাকে, সেজন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করতেন।

কোয়েটা হতে একটি ব্রড্‌গেজ্ লাইন্ চমন পর্য্যন্ত চলে গেছে। এই লাইনটিও একটি ইন্‌জিনীয়ারিং বিস্ময়, কারণ কোয়েটা হতে চমনের মাঝ পথে, হিন্দুকুশের তিন হাজার ফুট উঁচু এক পাহাড়কে অতিক্রম করতে হবে এবং এই দুরূহ কর্ম্ম ষাট মাইলের ভিতরে করা সহজ কথা নয়—ইন্‌জিনীয়ারিং বিদ্যাপ্রয়োগের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেকগুলি টানেল এবং জায়গায় জায়গায় দুইখানা ইঞ্জিনের সাহায্যে এই ট্রেনটি কোয়েটা—চমন,—কোয়েটা যাতায়াত করতো।

আর একটি লাইন কোয়েটা হতে সিধে পশ্চিমে নুস্কি হয়ে জাহিদান পর্য্যন্ত চলে গেছে প্রায় আড়াইশত মাইল রাস্তা। পথে গুটি কতক ষ্টেশন মাত্র। জনমানবহীন রুক্ষ ধূসর মসৃণ উপলখণ্ড বিছানো প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ট্রেন যেত। মধ্যে মধ্যে, দুই একটি জনপদের আভাস পাওয়া যেত। কিছু সবুজ শ্যামলতাও চোখে পড়তো কিন্তু তাও কদাচিৎ। জাহিদান তখনকার ভারতবর্ষ ও ইরাণের সীমারেখার প্রায় উপরে অবস্থিত। —বোধহয় ইরাণের সীমানার পাঁচ ছয় মাইল ভিতরেই ছিলো। যাতায়াতের কোন বিশেষ বাধা নিষেধ ছিলো না। এদিককার

ট্রেনগুলির সাথে পরিচিত আমরা, কোয়েটা—নুস্কি—জাহিদান বা কোয়েটা চমনগামী ট্রেনগুলির অবস্থা কল্পনাই করতে পারবো না, গাড়ীগুলিতে দু'চারজন লোকমাত্র—তখনকার ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, থার্ড ক্লাস গাড়ী থাকা সত্ত্বেও, ক্লাসের কোন বিভেদ সেখানে ছিল না। নুন্যপক্ষে ছয়ফুট উঁচু পাঠান বেলুচি, স্যালোয়ার কামিজধারী, জরীর কাজওয়ালা ওয়েষ্ট কোট, মাথায় বিরাট পাগড়ী, হাতে রাইফেল, যার যে কামরায় খুশী, উঠে বসতো। ষ্টেশন ছিল কিন্তু ওদের টিকিট কাটবার বালাই ছিল না। চেকার, টেকার গাড়ীতে থাকতো না। স্বাধীন প্রকৃতির লোক। যথেচ্ছ স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অভ্যস্থ বেলুচি পাঠান; ইংরেজদের নিয়মশৃঙ্খলা বা তার ট্রেনগাড়ীর বাধা নিষেধের ধার ধারতো না।

বেলুচিস্তানে তিন জাতীয় লোক আমার চোখে পড়েছে। তার উত্তর অংশে বেলুচিপাঠান—সবাই নিঃসন্দেহে আর্য্যগোষ্ঠি সম্ভূত। বেশভূষা আমাদের পরিচিত কাবলীওয়ালার মতন প্রায়। গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, উচ্চনাসা, ঘাড়ছাটা বাবরীচুল, চোখে সুরমা আর হাতে রাইফেল অথবা বন্দুক, নিদেন পক্ষে লোহা বাঁধানো দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। ওদিকে বাঁশ দেখি নাই। ভারতের অন্যান্য স্থান হতে, ঐ বাঁশের লাঠি সরবরাহ করে, অনেক ব্যবসায়ী হয়ত বা ধনী হয়েছেন। অন্য একটি গোষ্ঠী দেখেছি—যারা নিঃসন্দেহে মঙ্গলজাতি উদ্ভূত। উঁচু চোয়ালের হাড়, ঈষৎ থ্যাবড়া নাক, চেরা চোখ, স্বল্প দাঁড়ি গোপ—এদের চিনিয়ে দেয়। এই গোষ্ঠীর লোক কিন্তু তখনকার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের—বর্ত্তমান পাকতুনীস্থানে, চোখে পড়েনি। আর একটি গোষ্ঠীর লোক দেখেছি যারা প্রায় দেখতে আমাদের মতন, তাদের ভাষা "ব্রুহী"—পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়) যে এই ভাষার সাথে তামিল ভাষার যথেষ্ঠ সাদৃশ আছে।

বেলুচিস্তানে শতকরা আটানব্বই অংশ মুসলমান হলেও, প্রত্যেক গ্রামে, গঞ্জে বা সহরে হিন্দু বেলুচি তখনও বাস করতো। এদের জীবিকা ছিল চাকরী দোকানদারী। ব্যবসা বাণিজ্য আর সুদের কারবার। এদের সবাই বলতো শেঠ, এবং তারা মুসলমান বেলুচিদের সাথে স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে নিরাপদেই থাকতো। এদের ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্র পার্থক্যও ছিল না। না বললে বোঝাবার উপায় ছিল না হিন্দু কি মুসলমান।

এরকম এক হিন্দু বেলুচি ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে বেলুচিস্তানে অনেক হিন্দু দেবস্থান নানাজায়গায় ছড়িয়ে আছে। সে সব জায়গায়—দেবস্থানে সিন্ধু, রাজপুতনা, গুজরাট, পাঞ্জাবের অনেক হিন্দু তখনও তীর্থ করতে যেতেন। তার মুখেই হিংলাজের কথা শুনেছিলাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমায় বললেন যে নুস্কি হতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে একটি হ্রদ আছে, এবং সেই হ্রদে বোধহয় ভেরা নামে একটি নদী এসে মিশেছে। সেই সঙ্গমস্থলে একটি বহু প্রাচীন দেবস্থান আছে, যেখানে তখনও অনেক হিন্দু যাত্রী তীর্থ করতে যেতেন।

শুনে আমার কৌতূহল বড় হ'ল। আমার বাঙ্গালী বন্ধু-বান্ধব দু'চারজনকে এই দেবস্থানের কথা বললাম এবং আমার সহযাত্রী হতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু কেউই সেই অজানা, অচেনা দুর্গম অঞ্চলে আমার সহযাত্রী হতে রাজী হলেন না, তাই একদিন দুর্গা বোলে জাহিদানগামী ট্রেনে একাই চেপে বসলাম। সময়টা ছিল এপ্রিল মাস—ইষ্টারের ছুটি।

কোয়েটা হতে নুস্কি প্রায় সত্তর আশী মাইল রাস্তা। বেলা এগারোটা নাগাদ ট্রেন নুস্কির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে প্রায় বৈকাল পাঁচটায় নুস্কি পৌঁছাল। পথে মধ্যে মধ্যে ষ্টেশন ছিল বটে কিন্তু সে সব ষ্টেশনকে আমাদের পক্ষে ষ্টেশন ভাবা মুস্কিল। ষ্টেশন মাষ্টার, লাইনস ম্যান, ষ্টেশন ঘর, সিগন্যাল ইত্যাদি রেলষ্টেশনের যাবতীয় বস্তুই আছে কিন্তু আমাদের পরিচিত কোলহল ইত্যাদি কিছুই নাই। পান, বিড়ি ফেরিয়ালা, পানিপাড়ে ইত্যাদি কিছুই নেই। জনবিরল মাঠের মাঝে ষ্টেশন—দু'চারজন পাঠান বেলুচি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে—হয়ত বা দু'চারজন যাত্রী ওঠানামাও করেছে কিন্তু সবই যেন মৃত বা স্বপ্নপুরীর মত। জায়গায় জায়গায় মাইলের পর মাইল সবুজ প্রান্তর। সেখানে মেয়ে পুরুষ ক্ষেতে কাজ করছে। ভেড়া, উট, গাধা চরছে। বড় বড় জরদালুর গাছ—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দূরে কিন্তু ধূসর স্যাড়া পাহাড়—তৃণগুল্মহীন। তারপরেই হয়তো ধূ ধূ করছে গাছ-পালা শূণ্য জনমানবহীন, মাইলের পর মাইল বিশাল প্রান্তর। বালি আর পাথরের নুড়ি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। মধ্যে মধ্যে উঁচু নীচু পাহাড়। কিছু বাদ বাদ লাইনের পাশ দিয়ে দেখা যায় সারিবদ্ধ উট পরস্পরের সাথে দড়ি বাঁধা—পিঠে মালের বস্তা, আর তার সাথে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। ছোটবেলায় মরুভূমির বুকে সার্থবহ দলের যে ছবি দেখেছি ঠিক সেইরকম।

নুস্কি ওদিককার একটি বড় বস্তি। প্রায় হাজার বিশ পঁচিশ লোকের বসতি। রেলষ্টেশন, পুলিশ ষ্টেশন, পোষ্টাফিস ইত্যাদি সবই আছে। মোটামুটি একটা বড় গওগ্রামের চেহারা। সরকারী বাড়ীগুলি ছাড়া প্রায় সব বাড়ীই মাটির দেওয়াল ও মাটির ছাদ। সবই ঝকঝকে, তকতকে। সরকারী দিকটাতে পাথরের নুড়ি বিছানো রাস্তা। গ্রামের ভিতরে কাঁচা পাকা রাস্তা। ষ্টেশনে নেমে আমি রেলওয়ে ওয়েটিংরুমে আশ্রয় নিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার ভদ্রলোক—পাঞ্জাবী মুসলমান—অতি সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ওয়েটিংরুমের দরজা খুলে লোকজন ডেকে কোথা থেকে একটি নেয়ারের খাটিয়া জোগাড় কোরে, ওয়েটিংরুমে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং যতদিন ইচ্ছা, ততদিন এখানে থাকতে পারি সে কথাও জানিয়ে দিলেন। নিজের বাড়ী থেকে, বিছানাপত্র এনে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং যতদিন থাকবো, ততদিন ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতেই খাবার ঢালাও নিমন্ত্রণ কোরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম। একটু বাদেই এক পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলেন এবং আমার নাম ধাম গোত্র আসবার উদ্দেশ্য ইত্যাদি

সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। বাঙ্গালী জেনে আরও উৎসাহের সাথে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি কৌতুকভরে যথাযোগ্য উত্তর দিচ্ছিলাম আর ফাঁকে ফাঁকে তার সাথে গল্প করছিলাম। ভদ্রলোক উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি সব সময় বলেছিলেন যে তিনি কর্ত্তব্যের খাতিরে এইসব প্রশ্ন করছেন। আমি অবশেষে আমার ইনডিয়ান আর্মি আইডেনটিফিকেশন কার্ড ও আসবার সময় বেলুচিস্তানের এজেন্ট জেনারেলের দপ্তর হতে যে পরিচয় পত্রখানি সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলি ঐ পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দিলাম। ভদ্রলোক সেই কাগজ দু'খানি দেখে সলজ্জভাবে আমায় ফেরৎ দিয়ে বললেন, যে আগে ভাগে দেখালে, তাঁকে এত কথা জিজ্ঞাসা করতে হতো না। আমি তাকে বললাম যে তার সাথে আলাপের জন্যই আমি আমার পরিচয় পত্রাদি আগে দেই নাই। এতে লাভ হলো যে তার মত একজন সজ্জন ভদ্রলোকের সঙ্গ পাওয়া গেলো। এখন আমরা দুজনেই পরস্পরের "দোস্ত" হলাম। তিনি আমাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তার নাম ছিল, সইয়ফুদ্দিন কিজিলবাস —উত্তর পশ্চিম এবং পাঞ্জাব সীমান্তের তক্ষশীলার (Taxila) অধিবাসী। তিনি আমার আসবার কারণ শুনে, আমি যাতে সেখানে যেতে পারি, তার বন্দোবস্ত ও উপযুক্ত সঙ্গীর ব্যবস্থা কাল সকালেই করে দেবেন একথা বলেই, বার বার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন।

ওদিকে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে বাঙ্গালীর উপর ওদিককার জনসাধারণের একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অতি, অতিরঞ্জিত হয়ে ঐ সব দুর্গম অঞ্চলের জনসাধারণের কানে পৌঁছেছিল। ওদের ধারণা ছিল যে বাঙ্গালী মাত্রেই বন্দুক পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এবং সাহেব দেখলে গুলি করে। আমি কয়টি সাহেব মেরেছি—এ প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে অনেকবার হতে হয়েছে এবং ভাষাজ্ঞানের অভাবে প্রশ্ন বুঝতে পারি নাই এই ভান করে এড়িয়ে গেছি। কলকাত্তাইয়া লোকের উপর ওদের জনসাধারণের কি শ্রদ্ধাই না ছিল—সেটা না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না।

এখানে বলে রাখা দরকার যে কোয়েটা—চমন, বা কোয়েটা—মুস্কি—জাহিদান রেলপথ দুটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়নি। কোয়েটা বোলান গিরিবর্ত্তের মাঝখানে ইংরাজরা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সেখানে একটা বড় সৈন্যনিবাস স্থাপন করেছিল। চমন খোজাক গিরিবর্ত্তের মুখে। খোজাক—গিরিবর্ত্ত দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে গেলে কোয়েটা ছাড়া পথ নাই তাই কোয়েটায় বড় রকমের সৈন্য ছাউনী ইংরেজরা তৈরী করেছিল। ঐ পথ দিয়ে বহিরশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা ইংরেজদের সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত করে রাখতো। উত্তরে স্বাধীন আফগানীস্থান, পশ্চিমে স্বাধীন পারস্য অর্থাৎ ইরান। কোনটাই প্রবল নহে কিন্তু ঐ উভয় দেশের উত্তরে প্রবল পরাক্রান্ত রুশ সাম্রাজ্য। ইংরেজরা রুশের ভয়ে ভীত ছিল এবং সন্দেহ করত যে কোন দিন না কোন দিন রুশ আফগানিস্থান বা ইরাণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে পারে। তাই খোজাক ও বোলান গিরিবর্ত্তের মুখে সিংহদ্বার আগলিয়ে রেখে বিশাল ক্যান্টনমেন্ট বা সেনাছাউনী।

ভারতে ঢুকবার অন্য একটি রাস্তা খাইবার গিরিবর্ত্ত এবং তার দ্বার আগলিয়ে পেশোয়ার (হিন্দুযুগের পুরুষপুর) সৈন্যছাউনী। এই ছাউনীগুলির পৃষ্ঠদেশ রক্ষার জন্য কোয়েটা হ'তে খাইবার পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে বহু ছোট বড় সেনাছাউনী ইংরজেরা স্থাপন করেছিল। ইংরেজরা কখনই উত্তর বা পূর্বদিক হতে ভারতবর্ষ বহির্শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে বিশ্বাস করত না এবং সেজন্যই ভারতরক্ষার যত ব্যবস্থা, সবই প্রায় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাঞ্জাব. হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর-প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থানে তৈরী করেছিল। যদিও রুশ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন এবং ইংরেজদের যথেষ্ট পরিমাণ সমর সম্ভার ঐ কোয়েটা, মুস্কি, জাহিদা. রেলপথ দিয়ে ইরাণে এবং সেখান হতে মটর লরীতে রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে—জার্ম্মানিকে সামলাবার জন্য—বস্তুত পক্ষে এই রাস্তাই ছিল সাহায্য করবার একমাত্র সোজা রাস্তা। কারণ আর কোন সিধে রাস্তা স্থলপথে মিত্রশক্তির হাতে ছিল না।

যদিও তখন এপ্রিল মাস তবুও ঐদিকটায়, তখনও বেশ শীত। পাহাড়ের মাথার বরফ কেবল গলতে সুরু করেছে। রাত্রে দুখানা কম্বল চাপিয়ে শুতে হয়েছিলো। ওদিকে সূর্য্য বেশ দেরীতে ওঠে, তবে সাড়ে ছটা, সাতটা নাগাদ ফরসা হয়ে যায়। সূর্য্য আরও পরে ওঠে। কোলকাতা হতে সময়ের ব্যবধান প্রায় দুঘন্টার মত। বিকালে নটায়ও অন্ধকার হয় না। ভোরবেলা ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের দৌলতে একটি লোক এক কেটলী বেলুচি চা ও বিরাট এক মগ নিয়ে—আমার ঘুম ভাঙ্গালো। সেই গরম গরম চা এক মগ পান করে শয্যা ত্যাগ কোরলাম। উঠে দেখি এক বিরাট লম্বা চওড়া বেলুচি দোরের কাছে মেজেতে বসে আছে। আমাকে দেখে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো—কমসে কম সাড়ে ছ ফুট লম্বা। কব্জির হাড় আমার প্রায় দেড় গুণ চওড়া। আমি নিজেও নেহাৎ ছোট খাটো ছিলাম না। ছফুট লম্বা, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। কিন্তু ওর সামনে নিজেকে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল। লোকটি আমাকে লম্বা সেলাম ঠুকে পস্তু, বেলুচি, উর্দ্দু হিন্দুস্থানী—মেশানো ভাষায় যা বললো, তার মর্ম্মার্থ ছিল যে কিজিলবাস স্যার তাকে আমার নিকট পাঠিয়েছে—মাঈকী স্থানমে নিয়ে যাবার জন্য। সে মাঈকীস্থানের রক্ষক ও সেবায়েৎ। রাস্তা প্রায় তিরিশ মাইল মত। জলদি রওনা না হলে রাত্রে আশ্রয় স্থান পাওয়া মুস্কিল হবে। রাস্তায় কোন ভয় নেই। আর সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সাহেবের কোন চিন্তার কারণ নেই।

আমি তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়া সেরে স্নান কোরে যাবার জন্য তৈরী হ'লাম। ইতিমধ্যে ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ী হতে প্রায় এক ডজন, এক ফুট ব্যাসের তন্দুরী রুটি ও সের টাক মাংস জলযোগের জন্য এসে হাজির। আমার পক্ষে অত খাওয়া অসম্ভব তাই দু-তিনখানা রুটি খেয়ে, বাকী সব ফেরৎ দেবার চেষ্টা কোরলাম কিন্তু মাঈকী স্থানের পূজারী বাধা দিল এবং বাকী রুটি ও মাংস প্যাক কোরে সযতনে নিজের ঝোলায় নিয়ে নিলো। ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট হতে বিদায় নিয়ে, সেবায়েতের পিছন পিছন দুর্গা নাম নিয়ে রওনা হ'লাম। মাষ্টার ভদ্রলোক আমার সাথীকে

দেখে বললেন যে ঠিক লোকই পেয়েছেন। আমার আর চিন্তা নেই—পরশু বিকেল পর্যান্ত আপনাকে আবার আশা করব।

আমার সাথী ৺মাঈকীর সেবায়েতের নাম মহম্মদ শা। সে কিন্তু আমাকে বলেছিল যে তার নাম মহম্মদ শা শায়োস্তা বিদ্। শুনে চম্‌কে উঠেছিলাম শাস্ত্রী উপাধি শুনে। কারণ ইতি পূর্বে কোন ভারতীয় মুসলমানের পদবী "শাস্ত্রী" শুনি নাই। পরে কাশ্মীরে বহু মুসলমানের পদবী পণ্ডিত, মালব্য.....ইত্যাদি শুনেছি। আমার এক কাশ্মীরী মুসলমান বন্ধুরই নাম ছিল "আস্‌লাম মালব্য"। তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে যথেষ্ঠ গর্ব অনুভব করতো। তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেছি যে চালচলন, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে ঐ দিককার ব্রাহ্মণদের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে ছিল। তবে নুস্কি অঞ্চলের সবাই সেবায়েৎকে "মহম্মদ শা" বলেই সম্বোধন করতো। কাউকে ওকে শায়োস্ত-বিদ্ বোলে ডাকতে শুনি নাই। বোধহয় হিন্দু পারিবারিক পদবীটা সে শুধু যাত্রীদের নিকটে বলতো। মহম্মদ শা আমাকে বলেছিলো যে ধর্ম্মে সে মুসলমান হলেও, জাতিতে সে ব্রাহ্মণ। তার গলায় একটি রুপার চৌকো মাদুলি ছিল। সে সেই মাদুলি দেখিয়ে আমায় বলেছিলো যে ঐ মাদুলীর ভিতরে তাদের "জনাও" অর্থাৎ পৈতে আছে। ঐ মাদুলী বংশানুক্রমে বড় ছেলের প্রাপ্য এবং যে মাদুলী পাবে, তার উপরে পড়বে "মাঈকী" স্তানের দেখাশুনার ভার। দুঃখ কোরে বোলেছিলো তার বাপের আমলে বহু ইয়াত্রী মাইকীস্তানে পূজো দিতে আসতো কিন্তু ইয়াত্রী সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। এখন খুব কমই ইয়াত্রী আসে। তাও বৎসরে একবার কি দুবার এবং সেসব ইয়াত্রীরাও দরিদ্র সুতরাং আদায় পত্র কম। মাঈকীস্তান রক্ষা করা মুস্কিল। কথায় কথায় মনে হ'ল যে বোধহয় ভাদ্র অমাবস্যায় একবার এবং কালীপূজোর সময় একবার কিঞ্চিৎ হিন্দু তখন পর্যান্ত ৺মায়ের স্থানে যেত।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে আমি বহু সিন্ধি, পাঞ্জাবী, রাজপুত, হিন্দুদের সাথে এসব বেলুচিস্তানের দুর্গম দেবস্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি কিন্তু তারা কেউ এসব স্থানের নামও শোনেনি। হিংলাজ বা নুস্কির মাইকী স্থানের নামও শোনে নাই। ধীরে ধীরে তাই এইসব প্রাচীন দেবস্থানগুলি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বেলুচিস্থানে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এইরূপ বহু হিন্দু দেবস্থান ছিল—যেখানে আমি গিয়েছি—সেগুলি সব তখনই প্রায় বিস্মৃত ও লুপ্ত হতে চলেছে।

মহম্মদ শা আমাকে সিধে কিঙ্গিলবাস সাহেবের বাংলোয় নিয়ে গেলো—তা'র বোধহয় ঐরকমই নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল। কিঙ্গিলবাস সাহেব আমাকে সাদরে তার বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন নাস্‌তা পানি করতে অনুরোধ করলেন। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান কোরে জানালাম যে ওটা ষ্টেশন মাষ্টার মশয়ের দৌলতে ওখানেই সেরে এসেছি। তিনি তবুও বিস্তর রুটি গোস্ত কাবাব, ফল, মেওয়া মহম্মদ শাহের হাতে তুলে দিলেন। পথে প্রয়োজন হবে বোলে। তিনি আমায় আরও জানালেন যে মন্দির প্রায় মাইল তিরিশেক দূর। জায়গাটাকে "হামাম মঙ্গিল বলে"। বন্ধুর

চড়াই উৎরাই রাস্তা। প্রায় কিঞ্চিৎ অধিক তিন হাজার ফুট উঁচু - বেশ শীত হবে। জিজ্ঞাসা করলেন যে পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্র আছে কিনা? আমি জানালাম যে যা আছে, তাতেই হয়ে যাবে। উনি অনুরোধ জানালেন নুস্কিতে ফিরে, আবার যেন দেখা করি। তারপর তিনি মহম্মদ শাহকে ওদেশী ভাষায় কিছু উপদেশ নির্দেশ দিলেন। বুঝলাম আমার দেখভালের জন্য। পরে বুঝেছিলাম যে পথে সরকার অনুমোদিত সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে আমার কিছু না হয়। বোধকরি আমার আর্ম্মি আইডেনটিটি কার্ডই তাকে আমার রক্ষার দায়িত্ব এবং এজেন্ট জেনারেলের অফিসের পরিচয় পত্র সম্বন্ধে বেশী সচেতন করে তুলেছিল। এখানে বলা ভাল ঐসব অঞ্চলকে Non regulated area বলা হতো। অর্থাৎ ইংরেজী শাসন ওসব অঞ্চলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মতন শক্ত ও কায়েমী হয়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীনচেতা পাঠান বেলুচিরা ইংরেজের আইন, কানুন, পুলিশ, আদালতের ধার ধারতো না। আমাদের জানা ইংরেজের আইন কানুন মানতো না যদিও নিজ নিজ উপজাতীয় আইন কানুন তা যতই কঠিন বা আপাতদৃষ্টিতে বর্বরোচিত মনে হলেও—অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো। নিজ নিজ উপজাতীয় মালেক সরদারদের হুকুম মেনে চলতো—ওদিকে ঐ সব অঞ্চলে জায়গায় জায়গায় ইংরেজ স্থাপিত পুলিশ চৌকী ইত্যাদি থাকলেও, তাহার প্রভাব অতি সামান্যই ছিল। ঐ সব উপজাতীয়দের সর্বপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ, তাদের নিজেদের আইন কানুন মাফিক ফয়সালা হতো। আর একটা কথা—যে বেলুচিস্তানে কয়েকটি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল। যেমন লাস, বেলা, কালাত ইত্যাদি। এইসব দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। ইংরেজরা এসব ব্যাপারে নাক গলাতো না। সম্ভবতঃ যাতায়াতের দুর্গমতা এর কারণ। কিন্তু যাতে এইসব রাজ্যগুলি একত্রে মিলিত হয়ে প্রবল না হয়ে ওঠে, কিংবা কোন বিদেশী শক্তির সাথে হাত না মিলাতে পারে. সেদিকে ইংরেজেরা অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। বেলুচিস্তানে, ভারতবর্ষের বড়লাটের একজন বিশেষ দূত থাকতো। তাকে agent general বলা হতো। সমস্ত ক্ষমতাই তার হাতে ছিল। তিনিই সব কলকাঠি নাড়তেন এবং তাঁর কথা আপাত দৃষ্টিতে উপদেশ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আদেশ, যাহাতে ঠিক ঠিক পালন করা হয়, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত করবার জন্য, কোয়েটার ছাউনীতে বিশাল সৈন্য বাহিনী সজ্জিত থাকতো। ছোট ছোট শহরে চমন, নুস্কি, আকৃমাস্—এইসব দুর্গম অঞ্চলেও agent general এর লোক থাকতো - তারা প্রায় সবাই ছেলে ছোকরা তরুণ ইংরেজ। ঐসব দুর্গম অঞ্চলে যেখানে আমাদের জানিত আইন, কানুন, নিয়ম, শৃঙ্খলার বালাই নাই। সে সব জায়গায় ছেলেমানুষ ইংরেজ ছোকরাগুলি একা একা শত্রুভাবাপন্ন উপজাতীদের মধ্যে কি করে থাকতো - তা ভাবলে অবাক লাগতো।

সে যাই হোক, কিজিলবাস সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে, মহম্মদ শার পিছু পিছু অজানা অচেনা—হামাম মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তা বলে কিছু নেই - পায়ে চলা পাহাড়ের

গা বেয়ে পথ উঠে গেছে। ঐ রাস্তায় মানুষ, গাধা, খচ্চর, ভেড়া ছাড়া আর কিছু যেতে পারে না। ওদিকে ছাগল, গরু, বা ঘোড়া আমার চোখে বড় পড়ে নাই। আছে কিনা জানি না। মরুভূমি অঞ্চলে প্রচুর গৃহপালিত উট দেখেছি।

কখন বা কঠিন চড়াই, কখনও উৎরাই, কখনও বা কোন ছোট উপত্যকা পার হয়ে মহম্মদ শাহ'র সঙ্গে চললাম। মাঝে মাঝে দু-একটি গ্রাম, কিছু কিছু ক্ষেত খামার চোখে পড়ছিল। নারী পুরুষ উভয়েই ক্ষেতে কাজ করছে দেখলাম। গায়ের পথে মেয়েরা স্বচ্ছন্দে যাচ্ছে তাও দেখলাম। মেয়েদের পর্দা কোথাও দেখিনি! স্যালোয়ার কামিজে ঢাকা মাথায় ওড়না—এই সাজই মেয়েদের দেখা যাচ্ছিল। তবে মেয়েরা রাস্তায় খুবই কম।

এই উপমহাদেশে বিন্ধ্যপর্ব্বতের চত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে যে বিশাল ভূখণ্ড, সেখানে মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া বোধহয় বহু প্রাচীন বৈদিক সময় হইতে প্রচলিত। এর অন্যথা এই দুর্গম অঞ্চলেও দেখলাম না। এই প্রথা আমি পাকতুনি স্থানেও দেখেছি। এদানিং অবশ্য উত্তর ভারতের এই প্রাচীন প্রথা ক্রমশঃই শিথিল ও লুপ্ত হতে চলেছে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা বলি—বাংলার উলুধ্বনি কি আর্যাতর সভ্যতার দান? দক্ষিণ ভারতে স্থানে স্থানে আনন্দ উৎসবে মেয়েদের অনুরূপ ধ্বনি করতে শুনেছি। উত্তর ভারতে কিন্তু কোথাও উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি শুনতে পাইনি। বোধহয় জায়গায়, জায়গায় বেদে অনুরূপ ধ্বনি দেবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—শঙ্খধ্বনির কথাতো গীতায় পরিষ্কার আছে:

"পাঞ্চজন্য ঋষিকেশ দেবদত্ত ধনঞ্জয়"
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মাঃ বৃকোদর···

তবে উত্তর ভারত হতে উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি কি করে বিলুপ্ত হলো?

মহম্মদ শা'র সাথে সাথে মায়ীকি স্থানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। ওর সাথে পাল্লা রাখা ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে উঠতে লাগলো। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুতবেগে স্বচ্ছন্দে চলতে লাগলো আর আমি তার পিছন পিছন হাঁপাতে, হাঁপাতে প্রায় ছুটতে লাগলাম। রাস্তা ক্রমশঃই চড়াই হতে লাগলো। পাহাড়ের গা ঘুরে ঘুরে পায়ে চলা রাস্তা ক্রমশঃই উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগলো। লোকজন প্রায় না থাকার মত। দু-চারজন যাদের দেখা মিলল, তাদের সবাই মহম্মদ শা'কে চেনে। মধ্যে, মধ্যে তাদের দেখতে পেয়ে মহম্মদ শা দাঁড়িয়ে তাদের সাথে দু-চার মিনিট আলাপ করতে লাগলো। আমার পক্ষে সেটা ভালই ছিল কারণ ঐ অবকাশে আমি জিরিয়ে নিতে পাচ্ছিলাম। তাদের কথাবার্ত্তার ভিতর প্রায়ই "ইন্দি" "ইন্দি" অর্থাৎ আমি যে হিন্দু সেকথা জানাচ্ছিলো। দু-চারবার কলকাত্তা, কলকাত্তাও শুনছিলাম। আমি যে, যে সে লোক নই, সেটা মহম্মদ শাহ্ তাদের সবাইকে গর্বভাবে জানাচ্ছিল। ঐ সব পথচারীগণও আমাকে সম্ভ্রমের সাথে সেলাম জানাচ্ছিল এবং আমি তাদের "মেহমান"

অর্থাৎ অতিথি সে কথা জানাতে ভুলছিল না। ওদের প্রত্যেকের কাঁধেই ঝুলি এবং ঐ ঝুলি হতে খবানি অর্থাৎ শুষ্ক ফল—আমরা যাকে মেওয়া বলি—বের করে আমাকে উপহার দিচ্ছিল আর 'খাও' 'খাও' বলছিল। ওদের ভিতরে একজন অনেকবার নাকি কোলকাতায় এসেছে। তার সুদের কারবার ছিল। সে কিছু কিছু ভাঙ্গা বাংলা বলতো এবং আমায় পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে ভাঙ্গা বাংলায় আলাপ জুড়ে দিল।

কোলকাতার কাবুলিয়ালারা পেশোয়ার—জালালাবাদ অঞ্চলের লোক জানতাম। ওদের মধ্যে যে বেলুচিস্তানের পাঠান সম্প্রদায়ের লোক ছিল—সেটা জেনে বিস্মিত হ'লাম। সে যাই হোক এইভাবে আলাপচারী করতে করতে অভীষ্ট স্থানের দিকে এগুতে লাগলাম। এদিককার পাহাড়গুলিতে কোন বড় জঙ্গল নেই। বড় বড় গাছ, যা হিমালয়ের বা পূর্ব্বসীমান্ত অঞ্চলের পাহাড়ে দেখা যায় তাহা একেবারেই নেই। তবে স্থানে স্থানে জর্দ্দালু বা চীর পাইন গাছের সমাবেশ দেখেছি। ওই অঞ্চলে শীতকালে বরফ পড়ে। তবুও পাহাড়গুলি রুক্ষ—স্থানে স্থানে ছোট ছোট ঝোপ আছে। বরফগলা জল যায় কোথায়? কোন নদী নালাও বিশেষ দেখলাম না। দুই একটি ছোট ছোট ক্ষীণ ধারা চোখে পড়ছিলো। সেটা ঐ বিশাল ভূখণ্ডের—যেটা পাহাড়ের উপর থেকে আমার চোখে পড়ছিল—তুলনায় নেহাৎই নগণ্য। তবে এত জল যায় বা কোথায়? আমার ধারণা ঐ অঞ্চলের ভুগর্ভে বিরাট জলসম্পদ আছে।

মধ্যে মধ্যে গ্রাম, ক্ষেত খামারও যে চোখে না পড়ছিল, তা নয়। তবে খুবই কম। মহম্মদ শা সারা রাস্তাই কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল—ওখানকার আবহাওয়া, লোকজন আচার ব্যবহার খাওয়া দাওয়া, বিবাহ, সাদী, এই সব বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে অনর্গল বোলে যাচ্ছিল। তার কতকটা কথা আমি বুঝতে পারছিলাম, কতকটা পারছিলাম না। এইভাবে প্রায় ঘন্টা চারেক পথ চলবার পর ঝরণার ধারে, বিশাল এক সমতল পাথরের চাটানে বিশ্রাম নিতে বসলাম। মহম্মদ শা ঐ ঝরণার জলে হাত পা ধুয়ে পাথরের চাঁই'এর উপর বসল, আর আমাকেও মুখ হাত ধুয়ে নিতে অনুরোধ করলো। ওর থলির ভেতর থেকে বদনা জাতীয় একটা তামার বাসন বের কোরে জল ভরে নিয়ে এলো তারপর আমাদের দুজনের মাঝখানে ওর ঝুলি থেকে বের ক'রে একটা চাদর বিছালো—বুঝলাম খাবার আয়োজন হচ্ছে। ক্ষিধেও পেয়েছিলো। তারপর ঝুলির ভিতর হতে ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের দেয়া রুটি মাংস এবং কিজিলবাস সাহেবের দেয়া খাবারগুলো বের করে চাদরের উপরে রাখলো। তারপর আমাকে খেতে ইঙ্গিত করে, নিজে শুরু করলো। আমি একখানা সেই বিরাটাকৃতি রুটি আর কিছু মাংস খেয়েই পেট ভরে গেল। সেই বদনা থেকে ঢক্, ঢক্ কোরে জল খেয়ে ঝরণার জলে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলাম—কিছু মেওয়া মুখে দিলাম।

কিন্তু মহম্মদ শা বোধহয় ডজনখানেক ঐ রোটী এবং সেই পরিমাণ মাংস খেয়ে, তারপর উঠল। হাত মুখ ধুয়ে এসে ভুক্তাবশেষ খাদ্যগুলি আবার সযত্নে প্যাক করে ঝুলিতে ভরে নিল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। পাথরটা ছায়াবৃত ছিল—প্রাকৃতিক ভাবেই। কিছু মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়াও বইছিল। সময় তখন প্রায় বেলা দেড়টা কি দুটো। মহম্মদ শা আমাকে শুয়ে পড়বার জন্য ইঙ্গিত করতে আমিও শুয়ে পড়লাম। শোয়া মাত্রই ঘুম।

ঘন্টখানেক পরে মহম্মদ শার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি সে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে যাবার জন্যে তৈরি হ'লাম। তারপর আবার শুরু হলো হাঁটা। ক্রমশই উপরে উঠছিলাম। চারিদিকে শুধুই উঁচু, নীচু পাহাড় নজরে পড়ছিলো। ঠাণ্ডাও অনুভূত হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে গ্রাম দেখছিলাম। পথেও দু একটা গ্রাম অতিক্রম করলাম। আগেই বলেছি যে মহম্মদ শাকে প্রায় সবাই জানতো, চিনতো। প্রত্যেক গ্রামেই তাকে ঘিরে জটলা হচ্ছিল এবং আলোচনার বিষয়বস্তু যে আমি স্বয়ং—সেটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছিল না কারণ সর্বসময়েই 'ইন্দি' 'ইন্দি' এই শব্দ শুনছিলাম আর সবাই আমাকে দেখছিলো। সবাই আমাকে অভিবাদনও করছিল। গ্রামের পথে অতি বিরল হলেও দুচারজন মহিলাকেও দেখেছিলাম—ওদের মুখে পর্দ্দা ছিল না। বাড়ীগুলি সবই মাটী ও পাথর দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক গৃহস্থের চৌহদ্দী প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে মেয়েরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ঘরকন্নার কাজ করছিল। বোরখা নজরে পড়লো না।

এক গ্রামে মহম্মদ শা সর্দারের বাড়ী নিয়ে গেলো। সর্দ্দার বিশাল আকার পুরুষ, আমার পরিচয় শুনে সম্ভ্রমের সাথে চারপাই ছেড়ে দিয়ে আমাকে বসতে দিলেন। ওখানে আরও পাঁচ ছয় জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই অভিবাদন করে হাত বাড়িয়ে আমার হাত, তাদের দু হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে 'দোস্ত' বলে সম্বোধন করলেন। বলতে ভুলে গিয়েছি যে পথে যাদের সাথে দেখা হয়েছে, তারাও দোস্ত বোলে আমার হাতে হাত মিলিয়েছে।

পাঠান আর উত্তর বেলুচিস্তানের একটা বড় বৈশিষ্ট এই যে, তারা যাদের সাথে হাত মিলিয়ে 'দোস্ত' বোলে গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য তারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না—এমন অতিথি বৎসল জাতিও দেখিনি। অতি দরিদ্র পাঠান বেলুচিও দোস্তরা অতিথি এলে "আও, খানা খাও বোলে অভ্যর্থনা করবে। খানা না খাইয়ে ছাড়বে না। সেটা আধখানা পোড়া রুটিই হোক বা ঝলসানো কিছু মাংসই হোক।

আর একটা কথা। প্রায় সবার হাতেই বন্দুক বা রাইফেল। বন্দুক ছাড়া কোন পাঠান বেলুচি দেখেছি বোলে মনে করতে পারছি না অবশ্য ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টের বাইরে। সর্দার কিছুতেই আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়লেন না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো। তার ইচ্ছা ছিল যে রাত্রিটা আমি

তার ওখানে থেকে যাই। বারবার সর্দার অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু মহম্মদ শা কিছুতেই রাজী হলো না। সে সর্দারকে বুঝিয়ে বলায় ফেরার পথে তার সাথে মুলাকাত করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে যেতে দিলেন। আমার মনে একটু একটু ভয় যে না ছিল তা নয়, এই বিদেশ, বিভুইতে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাঠান বেলুচিদের সাথে, মনটা যেন কেমন বাধো, বাধো ভয় ভয় করছিল কিন্তু এই রাস্তায় নেমে প্রথম যে গৃহস্থের বাড়ীতে এলাম এবং গৃহস্বামীর অর্থাৎ সর্দ্দারের সসম্ভ্রম অমায়িক ব্যবহারে আমার মনের ভয় ভাবটা কেটে গেলো। সর্দ্দারের বাড়ী থেকে বের হয়ে আবার গন্তব্যস্থল মুখে রওনা হ'লাম। গ্রামের বেশ কয়জন লোক আমাদের সাথে সাথে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে গ্রামের বাইরে বহুদুর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এ রকমটা অন্যান্য গ্রামের পথেও হয়েছে কিন্তু তখন তাদের সাথে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারিনি কিন্তু এখন আমি এদের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দু পস্তু, বাংলা ইংরেজী ভাষায় স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে লাগলাম। বিদায় নেবার সময় তারা সবাই সেলাম জানিয়ে যাবার পথে আবার দেখা হবে এই বোলে বিদায় নিলেন। এই সমস্ত লোকগুলো সবাই বলিষ্ঠ কিন্তু অতি সহজ ও সরল বন্ধু ও অতিথি বৎসল। সবাই আমার সাথে সদ-ব্যবহার করেছে। আমার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেদিকে যথাসাধ্য যত্ন নিয়েছেন।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে গেলো। সেই জনমানবহীন পার্বত্য রাস্তায় আমি ও মহম্মদ শা ছাড়া, আর কাউকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। পা টন্‌টন্ করছিল। চলতে আর পারছিলাম না কিন্তু তবুও কোনমতে নিজেকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে চলছিলাম। মহম্মদ শা বারবার বলছিল "আউর থোড়াদুর সাহাব। চলিয়ে চলিয়ে বোলে আমাকে উৎসাহিত করছিল। উপায় নেই। যেতেই হবে। শীত ক্রমশই বাড়ছিল। হিমেল হাওয়ার তেজও বাড়ছিল। উপায় নাই—। ক্রমে দূরে একটা আলো চোখে পড়লো। ঐটেই হচ্ছে "হামামজাই" বস্তি। মহম্মদ শার অনুসরণ করে অবশেষে একটা প্রাচীর ঘেরা বাড়ীতে এসে পৌছলাম। এইটাই হামামজাই সরাইখানা। প্রাচীরের ভিতরে ঢুকে দেখি বেশ বৃহৎ একটি উঠান। তার একদিকে অনেকগুলি গাধা খচ্চর ভেড়া ইত্যাদি বাঁধা। অন্য দিকে বড় একটা বাড়ী—যার গঠন পূর্বে দেখা গ্রাম্য বাড়ীগুলির মতন। সেই উঠোনের একধারে অনেক গুলি অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বহু বেলুচিপাঠান হুক্কাতামাক খাচ্ছে আর গল্প করছে। বাঙ্গালী আড্ডা-প্রিয় জাতি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় এই বেলুচিপাঠানরাও কম আড্ডাপ্রিয় নয়। সুযোগ আর সুবিধে পেলেই ওরা ঘন্টার পর ঘন্টা তারা গালগল্প কোরে কাটিয়ে দিতে পারে বাঙ্গালীকে হারিয়ে দিয়ে।

মহম্মদ শাকে দেখে প্রায় সবাই অতি উল্লাসে এক সাথে সেলাম জানিয়ে তাকে আহ্বান করলো। পিছনে আমাকে দেখে সবাই একেবারে চুপ। মহম্মদ শা উচ্চেস্বরে আমার পরিচয় জানিয়ে দিল এবং তারপরেই উচ্চৈস্বরে আমাকে জানিয়ে তাদের আড্ডায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করলো। মহম্মদ শা কারো কথায় কান না দিয়ে সরাইখানার মালিককে ডেকে আমার জন্য

একখানা ভাল ঘর খুলে দিল। ঘরের মেঝে পাথর পেটানো। উপরে একটি মাত্র জানালা আর একখানি চারপাই। মহম্মদ শা আমার হাত পা ধোবার বন্দোবস্ত করলো। খাটিয়ার উপর একখানি কম্বল বিছিয়ে দিয়ে আমাকে বিশ্রাম করতে বোলে দরজা ভেজিয়ে চলে গেলো। আমিও চারপাই' এর উপর শুয়ে পড়লাম— রাত তখন প্রায় দশটা (I. S. T.) কিন্তু দিন রাত্রি হিসাবে. রাত ঘন্টাখানেক মাত্র।

সকাল আটটায় পথে নেমেছি আর এখন রাত দশটা। মাঝে ঘন্টাখানেক দুপুরে বিশ্রাম আর ঘন্টাখানেক সর্দ্দারের বাড়ীতে চা পান ও বিশ্রাম—মোট বারো ঘন্টা এক নাগাড়ে হেঁটেছি প্রায় চব্বিশ পঁচিশ মাইল ঐরকম বন্ধুর চড়াই, উৎরাই রাস্তায় চলেছি। শক্তির শেষ সীমায় এসে পৌছেছি। কিছুক্ষণ পরেই মহম্মদ শা ঘরে ঢুকে আমার হাত, পা, গা, টিপে দিতে লাগলো। বাধা দিলেও মানলো না। বললো তার সাথে এতটা রাস্তা অল্পসময়ে খুব কম যাত্রী করতে পেরেছে তাই গা, হাত, পা ব্যথা না হয়। এই দলাই, মলাই আমার নাকি প্রয়োজন। সত্যিই ওই বিরাট শক্তিশালী হাতে গা হাত টিপুনীতে, আমি অনেক সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। তারপর ও গিয়ে আমার জন্য দুখানা নান, রুটি ডাল ও ঝোল আলা মাংসের শবজী নিয়ে এলো। খেয়ে নিলাম। তারপর ও নির্ভয়ে ঘুমুতে বলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলো। যাবার সময় কাল ভোর ছটা নাগাদ বেরোতে হবে, সে কথা বলতে ভুললো না।

চারপাইতে শুয়ে এই অভিযানের কথাটা চিন্তা করছিলাম—পরিশ্রান্ত থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না। বাইরে অন্যান্য মুসাফিরদের কথাবার্ত্তা, হাসি, এমন কি গানের রেশও ভেসে আসছিল। ওর ভিতরে মহম্মদ শার কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছিলাম। অদ্ভুত এই পাঠান বেলুচিরা। আগ্নেয় অস্ত্র ছাড়া পথেই বার হবে না কিন্তু দেখলে উগ্র বোলে মনে হলেও বস্তুতঃ কিন্তু ওরা মোটেও উগ্র নয়। কর্কশ বা উগ্রস্বরে কাউকেই কথা বলতে শুনি নাই। .....এদিককার হাটবাজারের রাস্তাঘাটে যে কদর্য্যভাষায় উচ্চেস্বরে গালাগালি—মারামারি চেঁচামেচি—যা প্রায়ই দেখা যায়, সেরূপ একটি দৃশ্যও আমার চোখে পড়েনি যদিও সুদীর্ঘ কাল আমি ওদের দেশে যত্র তত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। কথাবার্ত্তায় আলাপ ব্যবহারে সংযত, অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ এবং বিদেশীকে সাহায্য করবার প্রবণতা ওদের বোধহয় সহজাত। আমার সঙ্গে কখন কোনপ্রকার অশালীন, অভব্য ব্যবহার করেনি। অথচ এত স্বাধীনতা প্রিয় জাতি আর আছে কিনা সন্দেহ।

ইংরেজদের শাসনে প্রায় একশত বৎসর থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা তাদের বাগমানাতে পারেনি। সম্পূর্ণ এলাকাটাই নামে মাত্র ইংরেজের অধীন ছিল। এসব কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলো মহম্মদ শার ডাকে। চোখ মেলে দেখি মহম্মদ শা ধূমায়িত এক বিরাট মগ চা হাতে দাঁড়িয়ে—উঠিয়ে সাব, বোলে হাতে চায়ের মগ ধরিয়ে দিলো। বাইরে তখন বেশ

অন্ধকার। হাত ঘড়িতে দেখি প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। বেশ ঠাণ্ডা। সরাই নিস্তব্ধ। মহম্মদ শার তাড়ায় তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। ওকে বলতে এক মগ গরম জল এনে দিল। মহম্মদ শার সাথে বেরিয়ে পড়লাম ঐ ভোর রাতে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মহম্মদ শার কথায় আমার ঝুলি, এমন কি পয়সাকড়ি সমেত ঐ ঘরে রেখে গেলাম—ফিরবার পথে নিয়ে যাবো। মহম্মদ শা বললে কই ডর নেই সাব।

পথে বেড়িয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই বুঝলাম যে হালকা হয়ে বেরিয়ে কত ভাল করেছি। সিধে চড়াই। অতিকষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ভাঙতে লাগলাম। ততক্ষণে পূর্ব্বদিগন্তে আলো দেখা দিয়েছে। সে পথকে রাস্তা বলা ভুল। পাহাড়ের গা বেয়ে জায়গায় জায়গায় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হচ্ছিল অতি কষ্টে। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক এইভাবে চলার পরে মোটামুটী একটা সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছলাম। দেখে মনে হলো যে পাহাড়ের চুড়া কেটে এই সমতল ক্ষেত্রটি তৈরী।

একটু দূরে ছোট পাহাড়ের একটা কুয়াসাবৃত ছায়া চোখে পড়লো, আমার সঙ্গী বলে উঠলো "আ গ্যায়া সাব"। জনমানবহীন প্রান্তর।

কিঞ্চিৎ নীচে পাহাড়ে ঘেরা বেশ একটি বড় হ্রদ। লম্বায় আনুমানিক মাইল তিনেক, চওড়ায় মাইল খানেক কিংবা তার কিছু বেশী—মোটামুটী ডিম্বাকৃতি। এই হচ্ছে হামাম মঞ্জিল হ্রদ। যারা নৈনিতাল গিয়েছেন তারা বেশ বুঝতে পারবেন চারিদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা নৈনি হ্রদের মত। এ রকম ছোট ছোট হ্রদ বেলুচিস্তানে আরও কয়েকটি দেখেছি। কোয়েটার কাছেই মাইল দশেক দূরে এমন একটি ছোট হ্রদ দেখেছি। হামাম-মঞ্জিলের হ্রদের গভীরতা কত জানিনা তবে দেখে গভীর বলেই মনে হলো। আর একটু এগিয়ে সেই ছোট পাহাড়টির কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম যে তার গা ঘেঁসে একটি ছোট নদী উত্তর পূর্ব্বদিক অর্থাৎ আফগানিস্থান হতে প্রবাহিত হয়ে ঐ হ্রদে ঝরণার মতন এসে পড়েছে আর সেই সঙ্গমের নিকটে একটি ধ্বংসপ্রায় স্তূপ। ঐ স্তূপই হচ্ছে মন্দির। নদীটির নাম আমার পুরোহিত, মহম্মদ শা শাস্ত্রবিদ্ "বরা" বোলে জানালেন। নদীটির নাম উচ্চারণ বৈষম্যে 'বরাহ'কে বরা বোলে শুনলাম না তো?

স্তূপটিকে আমার বৌদ্ধস্তূপ বোলে মনে হলো। শুনেছি আফগানিস্থানের বৌদ্ধস্তূপ ও বহুস্থানে বৌদ্ধমন্দির আবিস্কৃত হয়েছে। পাহাড় কেটে তৈরী বা পাহাড়ের গায় খোদাই করা বহু বুদ্ধমূর্ত্তি, আফগানিস্থানের যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে। এই জায়গাটা হামাম-মঞ্জিল—বিগত ব্রিটিশ বেলুচিস্তান আর স্বাধীন আফগানিস্থানের সীমন্ত রেখার অতি নিকটবর্ত্তী। সুতরাং বৌদ্ধমন্দির হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমার পুরোহিত মহম্মদ শা শাস্ত্রী আমাকে জুতো মোজা খুলে, হাত মুখ ধুইয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল দিয়ে বিচিত্র ভাষায় কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে, আমাকে বারবার অঞ্জলিবদ্ধ জল —আমরা যাকে দেবতীর্থে বলি—সেইভাবে নদীতে অঞ্জলি দিতে বললেন। কয়েকবার এইভাবে জল দিলাম, আমার মনে হলো যেন আমাকে দিয়ে পিতৃতর্পণ করালেন। বালির মণ্ড তৈরী করে

নদীতে নিক্ষেপ করতে বললেন—পিণ্ডদান নয়তো? তারপরে আমাকে স্তূপের কাছে নিয়ে গেলেন। স্তূপটি খুব বড় না হলেও খুব ছোটও নয়। কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণটাই ভেঙ্গে পড়েছে। বোধহয় বিধর্ম্মীর হাতে ধ্বংস হয়েছে। আর যুগ, যুগ ধরে ঐ স্তূপের পাথরগুলো নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে গৃহনির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সমস্ত স্তূপটি আগাছার জঙ্গলে ভরা। ভাল করে দেখবার উপায় নাই। স্তূপটিকে বেষ্টন করে তিনবার প্রদক্ষীণ করালেন। তারপর ঐ স্তূপের মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিঁড়ির মতন এক গলিপথ দিয়ে আস্তে আস্তে পুরোহিতের পিছনে পিছনে প্রায় ফুট তিরিশেক উপরে উঠলাম। উঠে দেখি যে একটা গুহার মতন স্থান—তার তিন দিক বেষ্টন করে পাথরের দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে আর তার মাথার উপরে ছাদ তখনও ভেঙ্গে পড়েনি। পিছনের দেওয়ালে পাথরের উপর খোদাই করা একটি মূর্ত্তি। ভেতরটা অন্ধকার। ভাল কোরে বোঝা যাচ্ছিল না। আমার পুরোহিত মহম্মদ শা শাস্ত্রবিদ্ ভিতরে প্রবেশ করে মোমবাতি জ্বালালেন। তারই অস্পষ্ট আলোকে দেখলাম চতুর্ভুজ একটি নারীমূর্ত্তি। দাঁড়াবার ভঙ্গিমা দেখে বৌদ্ধ বজ্রযানের তারামূর্ত্তি বোলে মনে হলো—মূর্ত্তির মাথাটি নেই, তাছাড়া প্রায় অক্ষতই ছিল। একটি স্তনের অর্দ্ধেকটা ভাঙ্গা ছিল। আমাদের পরিচিত কোন হিন্দুদেবীর সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না। বরঞ্চ দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে অজন্তা গুহার নারী চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর লেপা। পুরোহিত আমাকে দিয়ে, তার মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজো করালেন—মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে যেন বেশ কয়েকবার "ওঁ" এবং "বজ্রতারা" শব্দটি শুনতে পেয়েছিলাম বোলে মনে হলো। পুরোহিত মোমবাতি দিয়ে আরতি করলেন তারপর সেই শিখা আমাকে স্পর্শ করতে বললেন। সুগন্ধি ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করলেন। পূজা উপকরণ একমাত্র বরানদীর জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পুষ্প পত্রাদি নৈবেদ্যাদি—এ সমস্ত ছিল না। পূজা শেষে পুরোহিত যেন মন্ত্র উচ্চারণের সাথে শান্তি বারি আমার মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে প্রণাম করতে বললেন। মন্ত্রের মধ্যে পরিষ্কার "ওঁকার" ধ্বনি, "ওঁ স্বাহা" এই দুটি স্বর বার বার বুঝতে পারছিলাম।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ করতে শাস্ত্রবিদ্ মহাশয় বোধহয় মিনিট পনের সময় নিয়েছিলেন। পরিস্থিতিটা চিন্তা করলে এখন আশ্চর্য্য বোধ হয়—পাঠান মুসলমান পুরোহিত স্যালোয়ার কামিজ, ওয়েষ্ট কোট, পাগড়ী পরিহিত এক পুরুষ আর আমি অখণ্ড ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তের এক যাত্রী অখণ্ড ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কোন দেবীর আরাধনা করলাম? চারিদিক নিস্তব্ধ।

ঐ মন্দিরের ধারে কাছে কোন বসতি নাই বটে তবে কিঞ্চিৎ নীচে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তখন পর্য্যন্ত ঐ স্থানটিকে "পুণ্যভূমি" বলে, মাঈকী স্থান বিবেচনায় সম্ভ্রম করে এবং যাত্রীরা এলে, তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করে। তারা জানে যে প্রাচীনকালে, তাদের পূর্ব্বপুরুষরা এই দেবীর স্থানে তীর্থ করতে, হজ্জ করতে যেতেন। যদিও তারা এখন ধর্ম্মে মুসলমান, তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম সমীহ বোধ লক্ষ্য করলাম।

একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি যে দেবস্থান নির্ম্মাণ করতে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি নির্জন মনোরম স্থান নির্ব্বাচন করতে ভুল করতেন না। এই দুর্গম গিরি প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বার বার এই কথা মনে আসছিল। উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম যে দিকেই তাকাই, সেখানেই দেখছি পাহাড়ের পর পাহাড়—কোনটা ধূসর, কোনটা শ্যামল—সব নির্জন প্রকৃতি। দূরে আফগানিস্থানের বরফমণ্ডিত হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার শিখর সমূহ, পশ্চিমে সেই বিশাল হ্রদ। পায়ের তলে বরা নদীর কুল কুল ধ্বনি। সব মিলিয়ে সেই প্রাতে যেন আমার কাছে স্বপ্নলোক সৃষ্টি হয়েছিলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে বহুযুগ আগে এই সংঘারামে কত বৌদ্ধ-ভিক্ষু, শ্রমণ, স্থবির বাস করতেন—'বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণম্ গচ্ছামি, সংঘম্ শরণম্ গচ্ছামি' এই ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পূর্ণ হতো। হয়তো বা এই গিরিপথ দিয়েই তা'রা দক্ষিণ গান্ধার এবং উত্তর ইরাণে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে গিয়েছিলেন। হয়ত বা এই গিরি সঙ্কট দিয়েই আর্য্য, হূণ শক্ জাতীয় লোকও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলো। যাঁরা মহেঞ্জদরো সভ্যতার পত্তন করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চই যদি বিদেশী হন, এই পথ দিয়েই এসেছিলেন। পট পরিবর্ত্তন হ'ল। কণিষ্ক যুগের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আর গুপ্ত সম্রাটদের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের সময়ে হয়তো এই সংঘারাম হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়েছিলো। বজ্রযান বৌদ্ধদেবী বজ্রতারা হিন্দু শক্তি দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। এই স্থানটি সাধন ভজনের উপযুক্ত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই·····এই সব কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কল্পনা করছিলাম। মহম্মদ শার ডাকে, সাব চলিয়ে,—সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখি যে সে যাবার জন্য প্রস্তুত। বাক্য ব্যয় না করে, তার অনুসরণ করলাম—ফিরে চললাম। তখনও প্রভাতের সূর্য্য ঝলমল করছে—বেলা দশটা।

এবার ফিরবার পালা। সরাইখানা যেতে প্রায় বেলা বারোটা বেজে গেলো। মহম্মদ শা জানালো যে যদি আজই যেতে হয়, তবে এখনই রওনা হওয়া দরকার। কারণ পথে আর কোন সুবিধা মতন রাত কাটাবার স্থান নেই। যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি সরাইখানার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে রওনা হলাম। মহম্মদ শা তার ঝুলিতে ভজনখানেক পেল্লায় বেলুচি রুটি আর সের দুই রান্না করা শুকনো মাংস, সাথে লবণ খানিকটা নিতেও ভুলল না। মহম্মদ শা জানালো যে নুস্কি পৌছতে প্রায় রাত বারোটা হবে, তবে খুব বেশী রাত নয় কারণ বিকালে রাত নটা পর্য্যন্ত সূর্য্য আলোর রেশ থাকে। আর এদিককার লোকেরা অনেক রাত পর্য্যন্ত সরাইখানা, হোটেল ইত্যাদিতে আড্ডা মারে।

তারপর অনবরত পথচলা। মাঝে এক জায়গায় ঘন্টাখানেক খাওয়ার জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলাম—প্রায় রাত বারোটায় নুস্কির ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হ'লাম—ষ্টেশন নির্জন কারণ রাত্রে ঐ লাইনে ট্রেন চলাচল করে না। ষ্টেশনের বেয়ারা ওয়েটিংরুম খুলে দিল—দেখি আমার চারপাই আর শয্যা প্রস্তুত। ষ্টেশন মাষ্টারের সৌজন্যে কোন অসুবিধেই হ'ল না। হাতে, মুখে জল দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম—মহম্মদ শা আমার গা হাত পা, বেশ কোরে দলাই মলাই করে, কাল সকালে আবার

আসবে বলে বিদায় নিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে ও একবারও পয়সা কড়ির কথা জিজ্ঞেস করেনি বরঞ্চ মাঈকী স্থান হতে সরাইখানায় ফিরে এসে, কিছু দিতে চাইলে ও বললো যে তীর্থগুরু হিসাবে তাকে ত' কিছু নিতেই হবে নচেৎ ইয়াত্রীর কল্যাণ হবে না, কিন্তু সে পরে হবে।

দুই দিন ওর সাথে ঘুরেছি। এমন সহজ সরল সিধে লোক খুব কমই দেখেছি—অতি নির্লোভ প্রকৃতির। আমার সুখ সুবিধের দিকে তার যত্নের ত্রুটি ছিল না এবং ঐ সব জায়গায় যতটা সম্ভব সবই করেছে। বিনা আহ্বানে নির্দ্বিধায় এসে আমার হাত পা টিপে দিয়েছে কারণ ও জানতো যে এই রকম দুর্গম পার্বত্য রাস্তায় এতক্ষণ একসঙ্গে পায়ে চলার অভ্যাস আমার নেই। নিষেধ শোনে নাই—এসে আমাকে দলাই মলাই করে চাঙ্গা করে তুলেছিলো। রাস্তায় অনেক কথা হয়েছে—ওদিককার সম্বন্ধে। কত কিংবদন্তী. কি কোরে ওরা মুসলমান হলো তার ইতিহাস, কী কোরে ঐ মাঈকী স্থান ধ্বংস হলো……সে আমাকে বলেছিলো। তার কথা কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলাম, কিছু কিছু আন্দাজে বুঝেছিলাম আর কতকটা বুঝতেও পারিনি।

বার বার বলতে লাগলো হাজার হাজার বছরের পুরোনো এই দেবস্থান আস্তে আস্তে লুপ্ত হতে চলেছে। আগে তার বাপ, পিতামহ'র আমলে অনেক ইয়াত্রী আসতে সে দেখেছে, কিন্তু ক্রমশঃই সেটা কমে যাচ্ছে। এখন (অর্থাৎ তখন) বছরে পাঁচ সাতশ'র বেশী ইয়াত্রী হয় না। ওর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে বোধহয় ভাদ্র অমাবস্যায় একবার আর শ্যামাপূজার সময় আর একবার—এই দুইবার মাঈকী স্থানে যাত্রী সমাগম হ'ত। যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু বেলুচি পাঠান, আর সিন্ধু রাজস্থান, গুজরাট হতেই যাত্রীরা আসতেন। মহম্মদ শা যে জাতের ব্রাহ্মণ এবং মাঈর পূজার অধিকারী—এ কথা সে বারংবার গর্বের সঙ্গে বলেছে। দুঃখের সঙ্গে বলেছে যে, সে গরীব, কী করে এই পবিত্র স্থান রক্ষা করবে? মন্দির ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে—তার চোখের সামনে, কিন্তু সে অসহায়, করবার কিছুই নেই। ওদিককার লোকেরা স্থানটিকে পবিত্র মনে করলেও, রক্ষার দায়িত্ব নিতে রাজী নয়—ধর্ম্মে আঘাত লাগবার আশঙ্কায়। সরকার উদাসীন, তাই এই পবিত্র স্থান ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে, তার জীবিত অবস্থাতেই। বারংবার ক্ষেদোক্তি করতে লাগলো। তার গলায় পবিত্র মাদুলী পুরুষানুক্রমে তার কাছে এসেছে—সেই মাদুলী তার বড় পুত্রকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেবার আগেই বোধহয় এই দেবস্থান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। কোন ইয়াত্রি আসবে না। কেউ মাঈকে পানি চড়াবে না। সব শেষ হয়ে যাবে। এইসব শুনতে শুনতে আমি পথ চলছিলাম আর ভাবছিলাম ক্যাস্পীয়ান সী'র পূর্ব তীর হতে কাপিসা, বাহ্লীক, গান্ধার ইত্যাদি দেশ থেকে, ইতিহাসের অমোঘ নির্দ্দেশে হিন্দুসভ্যতা ক্রমে, ক্রমে সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলো। ১৯৪৭ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবের পর সম্পূর্ণ সিন্ধু প্রদেশ ও পঞ্চনদের সিংহভাগ মুসলমান রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্থান হয়ে গিয়েছে। মুষ্টিমেয় সামান্য কিছু হিন্দু এখন সেখানে আছেন। সম্পূর্ণ ভাবে ইসলাম রাষ্ট্র। সেখানে ঐ সব মুষ্টিমেয় ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হিন্দুদের পক্ষে দেবস্থানগুলি রক্ষা করা অসম্ভব। কয়েকটি

শিখ পবিত্রস্থান পশ্চিম পাঞ্জাবে আছে এবং সেখানে ঐ কয়েকজন গ্রন্থি এখনও ধর্ম্মস্থানগুলি আগলিয়ে আছেন, কিন্তু চলাফেরার স্বাধীনতা বিশেষ নাই।

ঐ সব স্থানগুলিতে এখনও ভারত ও পাকিস্থান গভরমেন্টের অনুমতি সাপেক্ষ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিখ তীর্থ করতে যেতে পারেনা। কিন্তু হিন্দু দেবস্থানগুলি রক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। রাওলপিণ্ডি এবং পেশোয়ারে বড় বড় দুইটি কালীবাড়ী ছিল। দুইটিই পাকিস্থান সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন বলে শুনেছি। বহু চেষ্টাতেও তাদের বর্ত্তমান অবস্থা জানতে পারিনি। এইভাবেই লুপ্ত হয়েছে। সরকারের আনুকুল্য না পেলে, এইসব পবিত্রস্থান রক্ষা করা যায় না। মহম্মদ শা'র মাঈকী স্থান নিশ্চয়ই এতদিনে, ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। আজ আমি কল্পনাই করতে পারি না কোন হিন্দু ইয়াত্রী সেই অতি দুর্গম দেবস্থানে তীর্থ করতে গেছে। মহম্মদ শার ভবিষ্যৎ বাণী নিশ্চয়ই এতদিনে ফলে গেছে। জানিনা মহম্মদ শা তার মাহুলী তার বড় পুত্রকে দিয়ে গেছে কিনা কিংবা তার পুত্র এখনও বছরে দুইবার মাঈকী স্থানে জল চড়াতে যায় কিনা।

ভোর বেলায় ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের লোক চা নিয়ে এসে ঘুম ভাঙ্গালো। তার কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক নিজে এসে তার সাথে তাঁর বাড়ীতে নাস্তা করতে অনুরোধ করলেন। সে অনুরোধ আমাকে রাখতেই হলো। অতি সজ্জন ও অমায়িক লোক। আমাকে যথেষ্ঠ সাহায্য করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ম'ষ্টার মহাশয়ের নামটা মনে নাই ঠিক—বোধহয়, আহ্‌মেদ শা মঙ্গোল যদিও তার চেহারায় মঙ্গোলিয়ান ছাপ বিন্দুমাত্র ছিল না। তার কিছুক্ষণ পরে শোয়াস্ত-বিদ্ মহাশয়—বোধহয় শাস্ত্র-বিদ—হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার গায়ে দরদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, আরও বললেন "সাব্বাস" দুই দিনে এই পথ যাতায়াত করতে, তিনি কোন ইয়াত্রীকে বিশেষ দেখেন নাই—। তারপর আমার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাদি করলেন।

তারপর আমি সঙ্কোচের সহিত দশটাকার একখানি নোট বের করে, তীর্থগুরু হিসাবে তাকে দক্ষিণা দিলাম। পূর্ব্বেই আমি মাষ্টার মশাইকে এই অভিযানে কত দিলে উচিত হবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনচার টাকা দিলেই যথেষ্ঠ। কিন্তু মন মানে নি তাই দশটি টাকা দিয়েছিলাম।

মহম্মদ শা'র মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো। সে আমাকে তার গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে আগেই জেনেছিলো যে আমি ঐ দিনটি মুস্কিতেই বিশ্রাম করবো। শরীরও ক্লান্ত ছিল। তাই মহম্মদ শা'র কথায় তখন রাজী হতে পারিনি। সে কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়লো না। সে সারাদিনই আমার ফাই ফরমাস্ খাটবার জন্য ওয়েটিংরুমে হাজির ছিলো। কিজিলবাস সাহেব এসে হাজির হ'লেন। আমার কুশলাদি বিনিময়ের পরে আমার ইয়াত্রা কেমন হলো.....ইত্যাদি অনেক কথাবার্ত্তা হলো। আমি তাকে বললাম যে আমি আকুমাস্ হয়ে জাহিদান

যেতে চাই। উনি বললেন—নুস্কির পশ্চিমে স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়দের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন এবং সেটা এই নুস্কিতেই করিয়ে নিতে হয়। আমার প্রোগ্রাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, কাল সকালের গাড়িতে আমি আক্‌মাস্‌ যেতে চাই। সেখানে বেলা দুপুর বারোটা নাগাদ পৌঁছুবো। সেদিনটা ওখানে কাটিয়ে তারপরের দিন ঐ ট্রেন চেপে জাহিদান যাবো। একদিন জাহিদান থেকে তারপরের দিন সন্ধ্যায় নুস্কি ফিরে আসবো। তারপর দিন কোয়েটা ফিরে যাবো। ...কিজিলবাস সাহেব হিসাব কোরে বললেন—আপনাকে তবে চারদিনের পাশ করিয়ে দিচ্ছি। তারপর লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে অফিসে চলে গেলেন। আমিও মহম্মদ শা'কে নিয়ে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। দেখবার বিশেষ কিছুই নেই—সরকারী এলাকাটা কিঞ্চিৎ ফিট্‌ফাট ছিম্‌ছাম্‌ কিন্তু বাজার ও দেশী বস্তিগুলি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত। ধুলো, বালি, খোলা নর্দ্দমা। চা ও খাবারের অনেক দোকান চোখে পড়ল এবং সে সব দোকানে ভীড়ও বেশ দেখলাম।

কিজিলবাস সাহেবের সাথে লাঞ্চ সেরে ওয়েটিংরুমে ফিরে এসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। বেলা চারটে নাগাদ মহম্মদ শা এসে হাজির—এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কলকাত্তাইয়া ইয়াত্রীকে তার বাড়ী নিয়ে যাবেই। তার গ্রামের সবাই নাকি বাঙ্গালী সাবকে দেখতে উৎসুক। যেতেই হলো তার সাথে। নুস্কি হতে প্রায় মাইল চারেক দূরে তাদের গ্রাম। আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে মহাসমারোহে খাটিয়ার উপরে (বেশ পুরু গালিচা বিছানো) বসালো। আগেই বলেছি যে ওদিককার সব বাড়ীই মাটীর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মহম্মদ শা'র বাড়ীও সেই মত ঘেরা। ভিতরে বেশ বড় উঠান আর তিনদিকে তিনটি বড় বড় ঘর। দেখতে দেখতে আমার চারপাশে ভীড় জমে গেলো। গাঁয়ের মুরুব্বিরা একে একে সবাই এসে জড়ো হলো। অনেকগুলি খাটিয়া পাতা ছিল। সবাই সে সব খাটিয়ায় বসলেন। মহম্মদ শা'য়ের বৃদ্ধামাতাও এই বাঙ্গালী ইয়াত্রিকে দেখতে এবং মাঙ্গীকীর দোয়া মাঙ্‌তে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং ওদের ভাষায় আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। বুড়ীর কী রং, কী সুন্দর দেখতে! বাচ্চাগুলি—সবাই দুধে-আলতার রং, সুদৃশ্য মুখশ্রী, রক্তিম কপোল।

দেখতে দেখতে ওদের সাথে আমার আড্ডা জমে উঠলো। মহম্মদ শা এই দুই তিন দিনেই, আমার জগা খিচুরী ভাষা কিছুটা বুঝতে শিখেছিলো। সেই আমার দোভাষীর কাজ করতে লাগলো। পর্দ্দা প্রথার কড়াকড়ি দেখি নাই। যদিও মেয়েরা ঐ ভীড়ের কাছে আসছিলেন না, তারা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিলেন। মহম্মদ শা তার ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। গর্বভরে নিজের মাতুলিটা আর তার বড় ছেলেকে দেখিয়ে বললো যে—তার পরে বড় ছেলেই হবে মাঙ্গীকীর সেবায়েৎ। বড় ছেলের গলায় কালো গোল মসৃণ পাথরের গোলক, কালো সুতো দিয়ে মাতুলীর মত গলায় ঝুলতে দেখলাম। মহম্মদ শা ঐ পাথরটি দেখিয়ে বললেন যে মহম্মদ শা'র পরে, যখন ওর মাতুলীটা বড় ছেলের গলায় যাবে, তখন ঐ পাথর, তার বড় নাতির গলায় দেওয়া হবে।

এই প্রথাই ওদের বংশে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। ছেলেটিকে কাছে ডেকে ঐ কালো গোলকটা ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ঐ পাথরটির ভিতরে ছিদ্র কোরে, কালো সুতো দিয়ে গলায় ঝোলানো। দেখে মনে হলো বোধহয় শালগ্রাম-শিলা। সব ব্যাপারটাই যেন আশ্চর্য্য মনে হয়। প্রায় হাজার বছর আগে এই সব দেশ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী জাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো, কিন্তু কিসের প্রেরণায় মাদুলীর ভিতর পৈতে রেখে, শালগ্রাম শিলা গলায় ঝুলিয়ে, মাঈকী স্থানের সেবা চালিয়ে যাচ্ছিল! হয়তো বা সে পূজা শাস্ত্রানুমোদিত নয় কিন্তু তাতে কি আসে যায়? পুরুষানুক্রমে এই যে নিষ্ঠা —তার চেয়ে বৃহৎ অর্চ্চনা আর কী হতে পারে?

আজ অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিককাল পর এবং অতি বৃহৎ রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে—যার পট ভূমিকা হিন্দু মুসলমান দুই জাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—কী অবস্থা জানিনা। মহম্মদ শা এবং তার বংশধরগণ এখনও তাদের পুরুষানুক্রমে বংশগত প্রথা বজায় রেখেছেন কিনা কে জানে? না থাকাই বেশী সম্ভব। কারণ এখন কি কোন হিন্দুযাত্রী সেই অতি দুর্গম মাঈকী স্থানে তীর্থ করতে যায়? বোধহয় যায় না। কারণ পাকিস্থান হিন্দু শূণ্য বললেই চলে।

এর মধ্যে চা, একগাদা শুকনো ফল, মেওয়া এবং ঘরে তৈরী বিস্কুটের মতন অতি শক্ত একটি খাদ্য—থালায় করে নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলো। এবং মাতব্বর ব্যক্তিদের দিল। চা পানের পর আমি সবার কাছ থেকে বিদায় চাইলাম। পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্য্য হেলে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মহম্মদ শা বাক্যব্যয় না করে আমাকে নিয়ে ফিরে চললো। কী সমাদরই না ওরা আমাকে করেছিল। সবাই বারংবার আমাকে সেলাম করছিল এবং আমার হাতে হাত মেলাচ্ছিলো। পুনঃপুনঃ আমাকে আবার আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিল।

সবাই খুব সুন্দর, সহজ ও সরল। আমি যে বিধর্ম্মী এবং অন্য জাতীয়, ভিন্ন ভাষী, সেকথা একবারও ওদের মধ্যে ঘণ্টা দুই থেকেও মনে হয়নি। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছিল। সন্ধ্যা আটটা নাগাদ মহম্মদ শা আমাকে নুস্কী শহরের ওয়েটিংরুমে পৌছে দিয়ে গেল। যাবার সময় আমার জন্য বারংবার মাঈকী দোয়া মাঙতে লাগলো। বার বার সেলাম কোরে আল্লার দোয়া মেগে ছলছল চোখে বিদায় দিল। যাবার সময় বল্লে কাল সকালে এসে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাবে। আবার ফেরার পথে নুস্কীতে দেখা করবে। মাঈকী-স্থান দেখবার পর্ব এইখানেই শেষ। আকুমাস্ জাহিদান—সে অন্যপর্ব। অন্যত্র সুযোগ পেলে বলবো।

পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা। স্মৃতির উপর নির্ভর কোরে লেখা। স্থান, কাল, সময় দূরত্ব কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হতে পারে। তবে বোধহয় আমিই একমাত্র হিন্দু বাঙ্গালী যে নুস্কি, আকুমাস্ জাহিদান্ মাঈকীস্থান দেখে এসেছি। ব্যাপারটায় কিছু অভিনবত্ব আছে, তাই লিখলাম।

বোবা কান্না

(গল্প)

তপতী চক্রবর্ত্তী

লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ডক্টর সাকসেনা। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে সামনের লাল গেরুয়া মাটির রাস্তায় বে-হিসাবী চলতে শুরু করলেন। অনেক দিনের পুরানো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট জায়গাটা দেখিয়ে স্বপনকে বললেন, ঐ যে মহুয়া গাছ আর সিমেন্টে বাঁধানো বেদীটা দেখছ আর এই পূর্ণিমার রাত—

কথাগুলো বলে থমকে গেলেন ডক্টর সাকসেনা। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে নীল আকাশের দিকে চোখ তুলে কি যেন খুঁজতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পেলেন কিনা তা তিনিই জানেন। এক সময়ে বেদীটার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

স্বপন অবাক হয়ে যাচ্ছিল ডক্টর সাকসেনার এহেন আচরণ দেখে। সে সবে মাত্র কদিন হল এখানে এসেছে সহকারী হয়ে। সে এ কদিনে ডাঃ সাকসেনার স্বভাব আচরণ সম্বন্ধে যতখানি পরিচয় পেয়েছে তার সঙ্গে যেন আজকে অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করছে। মুখে সে তার মনোভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ না করে ডাঃ সাকসেনাকে অনুসরণ করে ওনার পাশে এসে দাঁড়াল।

কি যেন চিন্তা করছিলেন ডাঃ সাকসেনা। এই পূর্ণিমার নীলাকাশে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ওনার চোখে মুখে। যা স্বপনের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

বেদীটা কার জানো স্বপন? স্বপন হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে এমন এক অভিব্যক্তি প্রকাশ করল যা সম্ভবত তার সাকসেনাকে পরবর্তী ঘটনাবলী বলার ব্যাপারে উৎসাহিত করল। সে সোজা চোখে ডাঃ সাকসেনার দিকে চেয়ে রইল।

সামান্য একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ফুলের মত নিষ্কলঙ্ক মেয়ের জীবনে নেমে এসেছিল দুঃখের করুণ পরিণতি। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে আকাশের একপ্রান্ত হতে বিজুরীর তীব্র কষাঘাত করেছিল সেদিনের আকাশকে। যার ফলস্বরূপ নিষ্পাপ পবিত্র সেই মেয়েটির মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল সেদিনের ক'জন মানুষ। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সানাইয়ের করুণ সুর বেজে উঠলো।

নববধূবেশী নীতু আর বর সাজে প্রতাপ মন্দিরের ঠাকুর দর্শন ক'রে আমার কাছে এসেছিল বিদায় নিতে। নীতুর বাবা অধ্যাপক সৌমেনবাবু ছিলেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে।

'আমাদের এবার আসতে হবে'—কথাটী বলে প্রতাপ যখন আমার পায়ে হাত রাখতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল ঘটনাটী। কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন প্রতাপের কাকা শ্যামসুন্দর ব্যানার্জী। প্রতাপের সামনে এক বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়ালেন।

তুমি কি ভেবে দেখেছ, যার পায়ে হাত রাখছ তিনি প্রণাম নেবার মত উপযুক্ত মানুষ কিনা।

উপস্থিত সকলেই হতবাক। প্রতাপকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শ্যামসুন্দর সৌমেনবাবুকে বলে উঠলেন, জালিয়াতি করে অনেককে ঠকিয়েছেন। অন্যের জীবনকে ঠকাবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? একজন শিক্ষিত লোক হয়ে একটা পরিবারের আভিজাত্য বংশমর্যাদাকে কলুষিত করার অধিকার আপনাকে কে দিল?

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক। আমি আর সৌমেনবাবু সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। প্রতাপ সেই সময় কিছু একটা বলতে চাইল। শ্যামসুন্দরবাবু হাত উঠিয়ে প্রতাপকে থামিয়ে দিলেন। শুরু করলেন নিজেই। শোন প্রতাপ, জালিয়াতদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। আর বে-জাতের মেয়েকে আমি ঘরের বৌ করতে পারব না।

কাউকে কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে শ্যামসুন্দরবাবু একপ্রকার জোর করে প্রতাপ আর নীতুর সদ্য বিয়ের গাঁটছড়া খুলে দিয়ে বললেন, এ বিয়ের কোন দাম নেই সমাজের চোখে। সামাজিক নিয়ম মতে এ বিয়ে হয়নি। বিয়েটা ছেলেখেলা নয়।

প্রতাপকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে আসা লোকজন একপ্রকার জোর করে প্রতাপের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেখান থেকে সবার চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে চলে গেল। স্বামীর দেওয়া লজ্জার অভিরণ অবগুণ্ঠনকে সম্বল করে সদ্য বিবাহিত নীতু ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে একদৃষ্টে ওদের চলে যাওয়াকে প্রত্যক্ষ করে দুচোখ ভাসিয়ে দিল কান্নার জলে। সৌমেনবাবু মেয়েকে কি ভাবে সান্ত্বনা দেবেন তার ভাষা হারিয়ে ফেলে অভাগী নীতুর দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকলেন বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায়।

নীতু ছুটে এসে সৌমেনবাবুর বুকে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। সৌমেনবাবুর যে কি অসহায় অবস্থা না পারছেন মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে না পারছেন নিজেকে। মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে নীতুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। আর এই অসহনীয় অবস্থায় থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় বুকের উপর ঝোলানো যীশুর ক্রশ চিহ্নটি নিজের কপালের উপর ঠেকালেন চোখ বন্ধ করে, হয়ত মনে মনে বললেন, প্রভু ওদের ক্ষমা করো।

কি যেন ফিরে পাওয়ার আশায় নীতু তখন দুহাতে ওর বাবার সারা শরীরটাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলতে থাকে, বাবা তুমি কিছু বল। আমরা ওদের জাত ধর্ম কোথায় নষ্ট করলাম।

সৌমেনবাবু মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি নিজে মুখার্জী বাড়ীর ছেলে হয়ে লরেন্সকে বিয়ে করার পর তোর মা আমাকে কখনও জাত ধর্ম ত্যাগ করতে বলেন নি। ভুলটা হয়তো আমাদেরই হয়েছিল। দেখলি না, ওরা আমাকেও জোচ্চোর ঠগবাজ বলে গেল।

নীতু তখনও কেঁদে চলেছে, আর সৌমেনবাবু আকাশের দিকে দুহাত তুলে হঠাৎই উচ্চস্বরে আবেগ মেশানো গলায় বলে উঠলেন, আর তুমি চেয়ে চেয়ে তাকিয়ে দেখলে। ভেঙ্গে পড় আমার মাথায়। এ অপমানের বোঝা বইবার মত শক্তি আর আমার নেই।

বুঝলে স্বপন, সে মুহূর্তে আমারও যে কি করণীয় তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জীবনে এরকম অসহায় অবস্থার সামনা সামনি কখনও হতে হয় নি। সামান্য ক'টা মানুষের হৃদয়কে শত চেষ্টা করে গলানো, সম্ভব হল না। হয়ত বনের পশু পাখীরাও সে-ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে মনে মনে উপলব্ধি করে বলেছিল—আমাদের অবুঝ হয়েই থাকতে দাও, মানুষ করো না।

সম্ভবতঃ এতবড় অপমানের আঘাতটা সহ্য করতে পারেনি ঐ মা-মরা মেয়েটি। শোকে দুঃখে সে বধির হয়ে গেল। কথা বলার শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলল চিরদিনের মতো। এ মায়া জড়ানো পৃথিবীর প্রতি আর কোন আকর্ষণ বা অভিযোগ নেই নীতুর। সে নিজেকে নিষ্প্রাণ এক পাথরের মূর্তি করে ফেলল। মেয়ের এই অবস্থাকে চোখে দেখতে না পেরে একদিন হঠাৎই সৌমেনবাবু হার্ট এ্যাটাকে মারা গেলেন। বেচারা নীতু জানতে পারল না যে এ পৃথিবীতে তার আর কোন আপনজন বলতে কেউই অবশিষ্ট রইল না।

সৌমেনবাবুর স্মৃতিটাকে কেন এই বেদীটার মধ্যে ধরে রেখেছি জান স্বপন, নীতু যদি কোনদিন আবার কথা বলতে ও বুঝতে পারে সেদিন যদি ও খোঁজ করে তার বাবা কোথায়? তখন তাকে এই বেদীটা দেখিয়ে বলব, তার বাবা এই সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বেদীর মধ্যে বিশ্রাম করছে।

স্বপনকে কথাগুলো বলে ডক্টর সাকসেনা খুব ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন নীতুর ঘরের সামনে। পূর্ণিমার আলোই এখন নীতুর ঘরে আলো জ্বেলে রেখেছে। শোবার খাটের উপর বসে নীতু তাকিয়ে আছে দূরের আকাশের দিকে। ও এখন কি ভাবছে কে জানে? মাঝে মাঝে নিজেকে ভারমুক্ত ভেবে হয়তো হেসে উঠছে। আর সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকে নিজের দুচোখ ভিজিয়ে নিচ্ছে।

'পাগলেরও আপনা বুঝ'

(গল্প)

মণিকা ঘোষাল

আমার এক পিশেমশাই ছিলেন। এমনিতে তিনি ভাল ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু বছরে প্রায় সাত মাসই তিনি পাগল হয়ে থাকতেন। স্বভাবে একটু আধটু পাগলামী তা' নয়। যাকে বলে ঘোর উন্মাদ। তখন ডাক্তারী করা দূরে থাক তাঁকেই পাগলাগারদের ডাক্তারের চিকিৎসায় রাখা হত।

তাঁর যখাসময়ে বিয়ে হয়েছিল। বাংলাদেশে মেয়ের আকাল কোনদিনই নেই। তা' জামাই, ঘাটের মরাই হোক বা পাগল ছাগল, যাই মিলবে দিব্বি বিকিয়ে যাবে।

অবশ্য যখন বিয়ে হয়েছিল তখন ঠিক উন্মাদ ছিলেন না। ছিট্‌পাগল ধরণের ছিল। কাজেই 'পাগল' নাম ছড়িয়ে পড়েনি তখনো। আমার ঠাকুদ্দা এমন ডাক্তার পাত্র পেয়ে বর্তে গেলেন। পাত্রের পিতাও ওটা গোপন করেই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে ফেললেন। একবার সাতপাকে বেঁধে আনতে পারলে আর তো ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

পিশেমশাইরও তেরো বছরের টুকটুকে ডব্‌কা বউ পেয়ে বেশ কিছুদিন ঠাণ্ডা মাথায় বাইরে ডাক্তারি, ঘরে খোয়ারি করে ভালই কাটল। বাপ হাঁফ ছেড়ে ভাবলেন, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। তাই ছেলের যেটুকু ই-য়ে ছিল তার থেকে মুক্তি হল। নিজে ডাক্তার না হয়েও ডাক্তার ছেলেকে উৎকৃষ্ট দাওয়াই দিয়ে পাগলামী সারিয়ে দিলাম।

সারল যে তার প্রমাণ, বছর পেরোতেই বউ তাঁকে একটি নাতি উপহার দিল।

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের আগেই পিশেমশাইর পুনরায় পাগলামী শুরু হল। ক্রমে বেশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ডাক্তারী চিকিৎসা, কবিরাজী ঘৃতকুমারীসহ বড়ি কোন কিছুতেই তাঁকে সুস্থ করা গেল না। পিসিমা প্রতিমুহূর্ত শঙ্কিত, কখন কচি ছেলের টুটি টিপে ঠাণ্ডা করে দেন। অথবা এক লাথি মেরে পেটের সন্তানটির পৃথিবীর মুখ দেখা বন্ধ করে করে দেন।

সেকালে সন্তান প্রসবের সময় বউকে বাপের বাড়ী পাঠাবার রেওয়াজ ছিল। বুদ্ধিমান শ্বশুর এবারে অনেক আগেই বউমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

সন্তান জন্মাবার পরেও বছর খানেক গত হ'ল কিন্তু মেয়েকে পাঠাবার কোন লক্ষণ নেই। তাগাদা দিলেন পত্র মারফৎ। উত্তরে জবাব পেলেন, পাগল জামাইর কাছে মেয়েকে আর পাঠানো হবে না। আমার ঠাকুদ্দা বেশ ডাকসাইটে ছিলেন। তাই এ নিয়ে গোলমাল কিছু হল না। সেই থেকে পিসিমা বাপের বাড়ীই থেকে গেলেন।

মেয়েকে বাবা পাঠালেন না বটে কিন্তু যে চার পাঁচ মাস জামাই সুস্থ থাকে প্রায়ই এসে ঘর-জামাই হয়ে থাকতে লাগলেন। যখন পাগলামী না থাকত তখন বেশ স্বাভাবিক ভাল মানুষ। কখনো মস্ত দুই পদ্মার ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে একগাল হাসি মুখে এসে হাজির হতেন। কখনো বা একহাঁড়ি রসগোল্লা বা কাঁচাগোল্লা সন্দেশ আনতেন।

উপযুক্ত জামাইকে তো আর দুর দুর করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা'ছাড়া তখন পাগলামীর চিহ্নমাত্র প্রকাশ পেত না। ছেলেদের কত আদর করতেন, বউকে তো চোখে হারাতেন। কাজেই স্বামীর প্রতি পিসিমার দুর্ব্বলতা ছিলই। সীমিত দিনের জন্য হলেও নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হত। এইভাবে পিসিমার কোলে ছেলেমেয়ে গোটাগুটি ছয়টি।

প্রতি বছর পূজোয় আমরা দেশের বাড়ী যেতাম। দেশের বাড়ীতে দুর্গাপূজো হত। তখন গিয়ে যদি পিশেমশাইকে দেখতাম আমরা ভয়ে তটস্থ থাকতাম। কারণ পিশেমশাইর বিষয় আমাদের জানা ছিল। তিনি কিন্তু খুব আদর টাদর করতেন।

একবার পিশেমশাই আমাদের বাড়ী এলেন। আমরা ঢাকা সহরে থাকতাম। তাঁকে দেখে তো আমরা ভয়ে কাঠ। কেন না তাঁকে দেখামাত্র বুঝেছিলাম, মোটেই ধাতস্থ নন। তবে বিশেষ কিছু উপদ্রব করলেন না।

আমরা সবাই খেতে বসেছি। পিশেমশাই বড় বড় থাবায় গোগ্রাসে চটপট খেয়ে উঠে গেলেন। খেয়ে উঠে তাঁকে দেখতে পেলাম না। অবশেষে জানা গেল, বাবার দামী মলিদাখানা নিয়ে বেরিয়েছেন। একজন ফেরিওয়ালা কমলালেবু বিক্রী করছিল রাস্তায়। তাকে নতুন মলিদাখানা দিয়ে চারটে কমলালেবু খেতে খেতে বাড়ী এলেন। মাকে বললেন, দেখুন বৌঠান, মাত্র একখানা মলিদা দিয়ে কেমন সস্তায় চার চারটি লেবু পেলাম। আবার একদিন আমার ছোট ভাই-এর খেলনা পিস্তল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক সাইকেল আরোহীর পেছনে গিয়ে ফটাস ফটাস করে ফোটাতে সে বেচারা চমকে প্রায় পড়ে যাবার অবস্থা।

তারপর ক্রমশঃ দৌরাত্ব বাড়তে লাগল। ছোটবেলায় কোল্ডষ্টোরেজ ছিল না। তখন দেখেছি ভাড়ার ঘরে বালুর উপর গোল আলু, রাঙা আলু মজুত করে রাখা হত। বর্ষায় দর বেড়ে যায় তাই। আমাদের বাড়ীর পাশে একটা ডোবামত ছিল। পিশেমশাই সেইসব আলু একটা একটা করে ছুড়ে ছুড়ে ডোবায় ফেললেন। তারপর আমাকে দেখিয়ে মাকে বললেন, ওকেও ফেলে দিই? শুনে তো আমি এক দৌড়ে পাশে মামাবাড়ি হাজির। আমার মামা তক্ষুনি আমাদের বাড়ি এসে দেখেন মা ভয়ে কাঁপছেন। পিশেমশাই তখন উন্মাদ। মামা তাঁকে ধরতে যেতেই তার হাতে এক কামড়। লোকজনের সাহায্যে ধরে এনে বেঁধে রাখা হল। বাবাকে ট্যুরে যেতে হবে, তাই মামা আর বাবা পাগলাগারদে দেবার জন্য সুত্রাপুর থানায় নিয়ে গেলেন। তখন

সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন একজন সাহেব। তিনি পরীক্ষা করে পাগলা গারদে দেবার ছাড়পত্র দিতেন। পিশেমশাই সুস্থ লোকের মত ভালমানুষ সেজে তাঁকে বোঝালেন, আমাকে ঠকিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার মতলবে মিথ্যে মিথ্যে পাগল সাজিয়ে এখানে এনেছে। আমার বাবা ও মামার মাথায় হাত। কথায় আছে পাগলেরও আপনাবুঝ আছে। সে কথা তো মিথ্যে নয়। সাহেব বাবা ও মামাকে কটু কথা বলে বিদায় দিলেন লিখলেন। 'লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ'।

বাবা ও মামা হতভম্ব। সাহেব যখন বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠছেন, পেছন ফিরে পিশেমশাইকে হাত নেড়ে 'বাই' বললেন। পিশেমশাই তখন দুই বুড়ো আঙুলে কাঁচকলা দেখিয়ে ভেঙ্গচি কাটলেন।

সাহেব গট গট করে ফিরে এসে খসখস করে লিখলেন, 'হি ইজ কম্পলিটলি ম্যাড'।

'যৌবনের স্বপ্ন'

চন্দ্রা বসু

যৌবনের স্বপ্ন ছিল যত
রঙ্গিন পর্দায় দেখা নায়িকার মত
হেসে খেলে কেটে যাবে জীবন
রঙ্গিন পর্দার ঠিক নায়কের মতন
কোন এক জীবন সঙ্গীকে নিয়ে।

বাড়িতে থাকবে স্কুটার থাকবে গাড়ি
আলমারির থাকে থাকে রং বেরঙের শাড়ি
চোখ ধাঁধানো বাগান ঘেরা মস্তবড় বাড়ি
প্রাচীরের পাশে থাকবে দেওদারের সারি।

গোলাপ ফুলের গন্ধে
যখন হবে সন্ধ্যে
চারিদিকে উঠবে আলো জ্বলে
আমি তখন সবকিছু ভুলে
আমার পোষা মেনিকে নিয়ে কোলে
দেখবো বসে ফোয়ারার জলে
রঙ্গিন মাছের খেলা
তখন সন্ধ্যেবেলা।

আঁধার যখন হবে ঘন
রাত্রি আসবে নেমে
আমি তখন হলঘরেতে বসে
করব পার্টির আয়োজন।

যৌবনের স্বপ্ন ছিল যত
মরুভূমির মরীচিকার মত
হঠাৎ মিলিয়ে গেল কোথা
হারিয়ে গেল স্বপ্নের সেই গাঁথা।

বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ি এসে
অন্ধকার এক ঘুপসি ঘরে বসে
দেখতে পেলাম ঘরের কোণে ছেঁড়া কাঁথা
রান্নাঘরে পরে আছে ভাঙ্গা খুন্তি হাতা
চায়ের কাপগুলো সব ফাটল ধরা
ভাঙ্গা চোরা জিনিসে ভরা
আমার স্বপ্নের সেই বাড়ি।

অতঃকিম

(গল্প)

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

বৃটিশ আমলের ম্যাজিষ্টেট ব্যোমকেশ মুখার্জী কর্ম্ম উপলক্ষে চিরকাল ভারতের বড় বড় সহরে পরিচ্ছন্নতার ভেতর কাটিয়ে রিটায়ার করার পর কালীঘাট রোডের পৈত্রিক বাড়ীতে এসে তাঁর দম বন্ধ হবার উপক্রম হোল।

ভাগ্যক্রমে আলিপুরে নিউরোডে একটি সুন্দর বাগানওলা বাড়ীর সন্ধান পেয়ে তাড়াতাড়ি কিনে ফেললেন।

স্ত্রী এবং দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁর বদলির কাজ সেইজন্যে ছেলেকে দুন স্কুল থেকে পাস করিয়ে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন C. A. করবার জন্যে। ওখানে বেশ ভালভাবে পাস কোরে একেবারে চাকরী নিয়ে ফিরেছে জয়ন্ত গত বছরে। মেয়ে রায়া দার্জিলিং লোরেটো থেকে পাস কোরে ব্রেবোনে ভর্ত্তি হয়েছে।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ছোট সংসারের সুখী কর্ত্তা তিনি। ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ গর্ব্বিত মুখার্জী সাহেব।

রিটায়ার করার পর চুপচাপ বসে থাকেন নি, তিনি ক্যামাক স্ট্রীটে এক্সপোর্টের বিজনেস করবার জন্যে অফিস খুলেছেন। নিজেকে কাজের ভেতর ব্যস্ত রাখতে পছন্দ করেন মুখার্জী সাহেব।

জয়ন্ত স্বভাবে বাবার মত না হলেও, এখনকার মত হুজুগপ্রিয় আবেগপ্রবণ নয়। পড়াশুনো করবার জন্যে চিরকাল বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। ঘরোয়া পরিবেশ পছন্দ করে সে। অফিস থেকে ফিরে টেনিস খেলতে ক্লাবে যায়, কিন্তু অন্তরঙ্গতা কারোর সঙ্গে হয়নি।

এদিন অফিস থেকে ফিরে চায়ের টেবিলে বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করছে, রায়া এসে বললে, দাদা তোমার ফোন!

—আমার ফোন! চায়ের কাপ হাতে বিস্মিতভাবে জয়ন্ত উঠে দাঁড়ালো।

—বোধহয় তোমার কোন বান্ধবী ফোন করছে। জয়ন্ত ধমকে উঠলো, আমার বান্ধবী! ভারি ফাজিল হয়েছিস।

রিসিভার তুলে হ্যালো বলতে, ওধার থেকে সুমিষ্ট কণ্ঠে উত্তর এল—আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না?

অবশ্য চেনবার কথাও নয়।

জয়ন্ত বললে—ঠিক ধরেছেন।

মেয়েটি হেসে বললে—আচ্ছা, লক্ষ্ণৌয়ের সুজাতার কথা নিশ্চয় মনে আছে। আপনার একটা চিঠিতে আপনার বাড়ীর ফোন নম্বর দেওয়া ছিল, তাই তো ফোন করতে পারলুম। এবার চিনতে পারছেন তো ?

জয়ন্ত রীতিমত ঘেমে উঠলো। মেয়েটি এত পরিচিত অথচ সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। তার স্মৃতিশক্তি কি এতই দুর্ব্বল হয়ে গেছে ?

খুব সাবধানে উত্তর দিলে—ফোন করেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য।

—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য সেটা পরে বুঝবেন, এখন বলুন আমাদের এখানে কবে কখন আসছেন।

জয়ন্তর অকূল পাথারে পড়ার মত অবস্থা। যাঁকে চেনে কিনা মনে করতে পারছে না, তার বাড়ীতে যাবার পথ কোথায় ?

এলোমেলোভাবে বললে, আপনার বাড়ী যাবো ?

সুজাতা রাগ কোরে বললে বাঃ আসবেন না ? আমি অতদূর থেকে আপনাদের দেশে এসেছি, আর আপনি ভদ্রতা কোরে একবার এখানে আসতে পারেন না !

জয়ন্ত ব্যস্ত হোল। —না না, সে কথা নয়, হঠাৎ ফোন—বাধা দিয়ে সুজাতা বললে, হঠাৎ এলে ফোনটা হঠাৎ-ই হয়, এটা বোঝেন না ?

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে জয়ন্ত বললে, হঠাৎ আসার কারণটা জানতে পারি কি ?

—একটা কেসের ব্যাপারে বাবাকে কলকাতায় আসতে হোল। এবার বাবার খেয়াল হোল আমাদেরও নিয়ে আসতে। আমার কলেজ বন্ধ, কাজেই চলে এলুম। আচ্ছা সত্যি কোরে বলুন তো, আমার ফোন পেয়ে খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন নিশ্চয়।

জয়ন্ত সাবধানে উত্তর দিলে, তা একটু হয়েছি, সেটা অস্বীকার কোরবো না। আপনার কণ্ঠস্বর শোনবার সৌভাগ্য কোনদিন হবে, এটা কল্পনা করিনি।

—কেন লক্ষ্ণৌ আর কলকাতার ভেতর কি অমরনাথের মত দুর্গম পাহাড় আছে, না হিংলাজের মত ধু-ধু মরুভূমি আছে যে আসতে পারবো না।

জয়ন্ত হেসে উঠে বললে—বর্ত্তমান যুগে দুর্গম অগম্য বলে কোন কথা নেই, এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?

—বেশ তো নিজে আমাদের এখানে এসে কথাটার সত্যতার প্রমাণ করুন।

জয়ন্ত ইতঃস্তত কোরে বললে—আসল ব্যাপারটা হয়েছে—বাধা দিয়ে সুজাতা বললে দেখুন, আমি ব্যারিষ্টারের মেয়ে কাজেই আসল নকলটা বেশ ভালই জানি। মনে হচ্ছে এখানে আসতে ভয় পাচ্ছেন।

নম্বর বিভ্রাটের জন্যে এবং একই নাম হওয়ার কারণে সুজাতা তাকে পত্রবন্ধু বলে মনে করছে। মেয়েটির কণ্ঠস্বর মুগ্ধ করেছে। সেই জন্যে অন্যায় হচ্ছে জেনেও জয়ন্ত ভুল শোধরাবার চেষ্টা না কোরে বললে – না না ভয় নয়, আমি ভাবছি—

—অত ভাববার কি আছে বলুন তো! এতদিন চিঠিপত্রের ভেতর আলাপ পরিচয় হয়েছে, এবারে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াটাই তো দরকার।

—আমাকে কি পরীক্ষা দিতে হবে?

জয়ন্তর কথা শুনে সুজাতা হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললে—আপনার কি এখনও পরীক্ষার ভয় আছে?

—না না ভয়ের কথা নয়।

—তবে আসতে অ সুবিধে কিসের? আজ কি কোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে।

জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার কোন বান্ধবী নেই।

সুজাতা কৌতুকভরে বললে—আমাকে কি বান্ধবী বলে স্বীকার করছেন না?

জয়ন্ত ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে—বিশ্বাস করুন আপনি ভিন্ন আর কোন বান্ধবী নেই।

—তবে আসতে অসুবিধে কোথায়? তাহলে নিশ্চয় শ্রীমতীর সঙ্গে কোথাও যাবার কথা আছে!

জয়ন্ত হেসে বললে—অধীনের জীবনে এখনও কোন শ্রীমতীর শুভাগমন হয়নি। বাধা অন্যখানে।

সুজাতা কৌতুকভরে বললে—আহা কি দুঃখ! গুরুজনরা কি কোন চেষ্টা করছেন না? না কি অন্য কোথাও মন বাঁধা পড়েছে, গুরুজনদের ঠেলায় আনতে পারছেন না।

—ওঁরা বিস্তর চেষ্টা করছেন, আমি ঠেলা খাবার ভয়ে কোন মতে ঠেলে রেখেছি।

সুজাতা রাগ কোরে বললে, আমার বোধগম্য ভাষায় কথা বলবেন তো। না কি লক্ষ্ণৌয়ের ভুল ভুলাইয়ার মত আমাকে কথার ধাঁধায় ঘোরাবেন।

—যে নিজেই ডুবে আছে, সে অপরকে কি কোরে ডোবাবে?

সুজাতা—আপনার কাছ থেকে কথা বলার কায়দা শেখা গেল।

—আমার কাছ থেকে যখন শিখলেন, তাহলে আমাকে গুরু বলে স্বীকার করছেন তো!

—আহা! কি আমার গুরুদেব এলেন।

—শাস্ত্রে আছে গুরুর সঙ্গে ভক্তি ভরে কথা বলতে হয়।

—গুরু কি গরু সেটাই বিবেচ্য।

—গরু হতে আপত্তি নেই, যদি উপযুক্ত মালিক পাই।

—মালিক খুঁজে নিন।

—খুঁজতে খুঁজতে যদি আপনার দরজায় হাজির হই, তখন দড়িটা হাতে নেবেন তো!

—কথা দিতে পারছি না। দুষ্টু গরুর দড়ি ধরা নিরাপদ নয়।

জয়ন্ত হেসে বললে, গরু শান্ত কি দুষ্টু সেটা বিচার করেই ধরবেন। দুষ্টু গরুর দড়ি ধরতে আমি বোলব না।

সুজাতা বললে গরুর কথা পরে বিবেচনা করা যাবে, এখন বলুন কবে কখন আসছেন।

বিপদগ্রস্থভাবে জয়ন্ত বললে—কিন্তু দেবী, কোন ঠিকানায় যাবো, তাতো বললেন না।

সুজাতা বিস্মিতভাবে বললে—কলকাতার বাড়ীর ঠিকানা কি আপনাকে লিখিনি? আপনি বোধহয় হারিয়ে ফেলেছেন। এবার ভাল কোরে শুনে নিন……লেক য়্যাভিনিউ।

ফোন ছেড়ে জয়ন্ত চিন্তিতমনে নিজ কক্ষে প্রবেশ করলে। এইমাত্র যার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা হোল তার কণ্ঠস্বর জয়ন্তকে মুগ্ধ করেছে, সেই কারণে অন্যায় জেনেও সত্যি কথা বলতে পারেনি। মনকে বুঝিয়েছে রোজ তো রং নাম্বার হবেনা, এবং আমিও ওখানে যাচ্ছি না, তাহলে অন্যায় কিসের?

সুজাতার বাবা লক্ষ্ণৌ কোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। আদি বাড়ী কলকাতায় হলেও বহুকাল ওদিকে আছেন। বিয়েও করেছেন প্রবাসী বাঙালীর ঘরে। সুজাতার মা অরুন্ধতীদেবীও এদিকে আসতে চান না। এদিককার পরিবেশ তাঁর পছন্দ নয়। ব্যারিষ্টারের আত্মীয়স্বজন বলতে একমাত্র বোন ভিন্ন আর কেউ নেই। কাজেই বছরে একবার কলকাতায় এসে লেক য়্যাভেনিউয়ের বসত বাড়ীতে ওঠেন। বেশ কিছু জমি নিয়ে ছোট একটি দোতলা বাড়ী। নীচেটা বিশেষ পরিচিত এক প্রফেসরকে ভাড়া দিয়েছেন। উপরটা নিজের জন্যে রেখেছেন। তাঁরও এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে সংসার। ছেলে বিলেতে ব্যারিষ্টারি পড়তে গেছে, মেয়ে লক্ষ্ণৌয়ের কলেজে পড়ে।

কেসটা জটিল, সেই জন্যে কদিন খুবই ব্যস্ততায় কাটলো। এখনও বেশ কয়েকদিন লাগবে। যেদিন কোর্ট ফেরৎ বাড়ী এসে অরুন্ধতীদেবীকে বললেন, আজ একটু ফ্রি আছি, ভাবছি ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা কোরে আসি। তোমরাও চল আমার সঙ্গে।

—তুমি আবার আমাদের টানছো কেন?

—তোমার কি ব্যোমকেশকে মনে নেই? সেই, যে বছর মুসৌরী গিয়ে ওদের সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল, মনে পড়ছে? ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যোমকেশ মুখার্জী।

অরুন্ধতীদেবী বললেন, মনে ছিল না, তুমি বলতে মনে পোড়লো। কিন্তু তাঁদের কি মনে আছে?

—কেন থাকবে না! আমি যখনি কলকাতায় আসি ব্যোমকেশের সঙ্গে সব সময় দেখা করি। যোগাযোগ আছেই, সেটা দু'জনের মনের। তাছাড়া শুনেছি, ওর ছেলে জয়ন্ত বিয়ের উপযুক্ত। খোঁজ নিয়ে জেনেছি সব দিক থেকে একেবারে জুয়েল। গিয়ে দেখে ভাল লাগলে প্রস্তাব দেবো।

অরুন্ধতীদেবী উৎসাহ বোধ না করলেও আপত্তি করলেন না।

বিকেলে স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে ব্যারিষ্টার নিউ রোডের বাড়ীতে এলেন। গাড়ী থেকে নেমেই সামনেই বন্ধুকে দেখে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার হে, এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছো মনে হচ্ছে আমাদের আসার খবরটা আগেই পেয়েছো।

ব্যোমকেশ হাত বাড়িয়ে বন্ধুর হাত ধরে বললেন, দেখছো তো মনের টান। একি ব্যাপার আপনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর আমি, ছিঃ ছিঃ আসুন আসুন। আমি ভাবতেই পারিনি, কলকাতায় আসবেন। ড্রইংরুমে সকলকে বসিয়ে তিনি সুজাতার পানে তাকিয়ে বললেন, এটি নিশ্চয় তোমার মেয়ে। সেই কত ছোট দেখেছি—থাক মা আর প্রণাম করতে হবে না। তুমি আমার পাশে বোস।

সপ্রতিভ ভাবে সুজাতা তাঁর পাশে বসে পোড়লো।

ব্যারিষ্টার বললেন—তুমি কি কোথাও যাচ্ছিলে, আমরা এসে—

—আরে না-না এমন কিছু নয়। রিটায়ার করার পর চুপচাপ বসে না থেকে এক্সপোর্টের ব্যাপারে ব্যস্ত রেখেছি নিজেকে। ক্যামাক স্ট্রীটে একটা অফিস আছে, মোটামুটি ভালই চলছে।

ব্যারিষ্টার কিছু বলবার আগেই ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বোস, ভেতরে খবর পাঠাই। এই যে জয়ন্ত এদিকে আয়। ব্যারিষ্টার এই আমার ছেলে জয়ন্ত। ছেলেকে বললেন জয় ইনি আমার বন্ধু একে প্রণাম করো, উনি মিসেস ব্যানার্জী ওকেও করো। এবার তুমি তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এসো।

জয় নাম শুনেই সুজাতা সচকিত ভাবে তাকিয়েছিল। ওই ভদ্রলোকের নামও জয়। অবশ্য তার পত্রবন্ধুর নাম বিজয়, সংক্ষেপে জয়। এই ভদ্রলোকের নাম জয়ন্ত সংক্ষেপে জয়।

একটু পরেই জয়ন্ত মাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে। জয়ন্তর মায়ের নাম শ্রীময়ী। সত্যি-ই তিনি শ্রীময়ী।

তাঁকে দেখে ব্যারিষ্টার উঠে নমস্কার জানিয়ে বললেন, —মিসেস ব্যানার্জী আমাদের কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে। শ্রীময়ী এগিয়ে এসে অরুন্ধতীদেবীর পাশে বসে বললেন, —আমার স্মরণশক্তি সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ হচ্ছে ?

অরুন্ধতীদেবীকে বললেন—আপনি এসেছেন, আমি ভাবতেই পারিনি আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে !

অরুন্ধতী দেবী হেসে বললেন—সত্যি বলছি আপনাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। ভাগ্যে এসেছি। কি জানেন, এই কলকাতার আবহাওয়া আমার ভাল লাগে না। কেমন যেন দমবন্ধ করা পরিবেশ। দিনরাত চিৎকার কোলাহল, রাস্তাগুলো যেমন নোংরা তেমনি ভিড় !

শ্রীময়ী হাসলেন, বললেন—আমরা এতেই অভ্যস্থ হয়েছি ভাই। তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন····

—তোমার মেয়ে সুজাতা ? ওমা দেখেছেন, আপনি থেকে একেবারে তুমিতে চলে এসেছি।

অরুন্ধতী হাসিমুখে বললেন, তুমি বলার পর আপনি বললে সেটা কিন্তু গ্রাহ্য হবে না।

—সেটা উভয়তঃ।

—নিশ্চয়। সুজাতা তোর বোধহয় ওঁর কথা মনে নেই।

—সুজাতা সলজ্জভাবে বললে, একটু একটু মনে পড়ছে।

—শ্রীময়ী রায়াকে বললেন, রায়া সুজাতার সঙ্গে গল্প করো তোমরা।

রায়া হেসে বললে, এস ভাই আমরা ওদিকটাতে বসি। দাদা তুমি চলে যাচ্ছো কেন ? এস আমাদের সঙ্গে বসে গল্প কোরবে। আজ তোমার খেলা বাদ দাও।

সুজাতা বললে, ওঁর বোধহয় আমাদের সঙ্গটা পছন্দ হচ্ছে না। সত্যি বলুন, কথাটা ঠিক কিনা।

জয়ন্ত বললে, সেটা আপনার পক্ষেও প্রযোজ্য হতে পারে তো!

—দেখুন মশাই, আমি পশ্চিমের মেয়ে লজ্জা ভয় দুটোই কম, পছন্দ না হলে বিশেষ কথাই বোলবো না।

—পশ্চিম! মানে আপনারা কলকাতায় থাকেন না ?

—আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে আসছি। কলকাতায় বিশেষ আসা হয় না। এবার মা মত পালটে কলকাতায় এলেন। আমিও চলে এসেছি।

—লক্ষ্ণৌ ? মানে সুজাতা ? তবে কি—

জয়ন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে থেমে গেল। অল্প হেসে বললে, মানে আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার।

সুজাতা বললে—উহুঁ, আসল কথা বাদ দিচ্ছেন কেন ?

—না-না, ঐটাই আসল কথা। আমার এই বোনটি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে, আজ তার মুখে কথা নেই কেন ? এই রায়া কথা বলছিস না কেন ?

—আমি তোমার কথার মাঝে কথা বললে তোমার ভাল লাগবে ?

সুজাতা প্রসঙ্গ বদলে বললে, আচ্ছা ভাই রায়া নামের মানে কি ?

—রায়া মানে শ্রীরাধার আর এক নাম।

—ভারি সুন্দর নাম, বেশ নতুনত্ব আছে। দেখছো তো বাংলা কথার অনেক কিছুই জানি না।

— তার জন্যে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এই যুগের অনেকেই বাংলা কথা পুরোপুরি জানেন না, কিংবা জানতে চান না। ওসব বাদ দাও। তোমরা কতদিন থাকবে ?

—ঠিক জানি না। বাবার কেস শেষ হয়ে গেলেই চলে যেতে হবে। খুব খারাপ লাগবে আমার।

—আমারও লাগবে। তুমি গিয়ে চিঠি লিখবে তো?

—নিশ্চয়। আমার এক পত্রবন্ধু আছে কলকাতায়। তার নামও জয়। অবশ্য বিজয় থেকে জয়।

—এখানে এসে দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

—না হয়নি। আমি ফোন করেছিলুম। ভদ্রলোক আসবে বলেছিলেন, কেন জানি না আসেননি।

—জয়ন্ত রীতিমত ঘেমে উঠলো। পাছে বেফাঁস কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে যায় সেই জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে পোড়লো—কিছু মনে করবেন না। একটা কাজ—

বাধা দিয়ে রায়া বললে—রাখো তোমার কাজ! কাজ তো তোমার ঐ খেলা। একটা দিন বাদ গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। বোস গল্প করো।

অগত্যা জয়ন্ত বসে পড়ে।

বিদায় নিতে চাই

রমা গুপ্ত (হাওড়া)

চলার হয়েছে শেষ, এবার গতি থামাও
বোঝা তো হয়েছে ভারী, নামাও তবে নামাও!
ঝুলি যে ভ'রে গেছে, হ'ল তো অনেক পাওয়া
বন্ধন কিসের আর? এবার উচিত যাওয়া।
তবু কেন ফিরে ফিরে চাই, চরণ না চলে
মনের গহনে অন্যমন, ভিন্ন কথা বলে।
এই অন্তর্দ্বন্দ্বে আমি ক্ষত বিক্ষত হই,
এই 'আমি' তবে কিনা, বল, সেই আমি নই?
চাওয়ার তো শেষ নেই, অসীম বাসনা
দগ্ধ হই দিবারাত্র, তাই ধিক্কারি আপনা!
এ মলিন আবর্জ্জনা, চাই ধুয়ে মুছে ফেলে
শান্তির আস্বাদ পাব বিদায় নিয়ে গেলে।
জীবন সায়াহ্নে এসে, দৃষ্টি ভ্রম হয়ে যায়—
অত্যাচারে, অবিচারে, বেঁচে থাকা বড় দায়।
পারিনা করিতে কিছু, অন্যায়ের প্রতীকার
কোন সাধ্য নেই, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আমার—
অবরুদ্ধ বেদনায় দিশাহারা হয়ে যাই
তাইতো এবার আমি, বিদায় নিতে চাই।

CENTRAL LIBRARY

৺ভোলানাথ পণ্ডিত মহাশয়কে লিখিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র

সংগ্রাহক ঃ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু, 28-3-46

ভাই ভোলানাথ, তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কর। হয়তো এ পত্রে তোমাকে বিব্রত করছি। শাস্ত্রের একটা নির্দ্দেশ আছে—'সত্য অপ্রিয় হলে বলবে না'। অপ্রিয় সত্য বলতেই যেখানে নিষেধ সেখানে সত্যের নির্দ্দেশে অপ্রিয় কর্ম্ম করা অবশ্যই উচিত নয়। কিন্তু এই শাস্ত্র বাকাটি আমি মানি না। কোন শাস্ত্রকারের এটি অত্যন্ত দুর্বল মুহূর্ত্তের চিন্তার ফল। সংসারে যাদের Escapist বলে তারাই এটা আঁকড়ে ধরে আছে। এতে ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায় কিন্তু ন্যায় এবং ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। কথাগুলি কয়েকদিন ধরে বিশেষ চিন্তা করে দেখে তোমাকে লিখছি।

সম্প্রতি আমি একখানি পত্র পেয়েছি। লাভপুর স্কুলের ছাত্রবৃন্দ এই সই করে পত্রখানি লিখেছে। পত্রখানি এইরূপ—

"বন্দে মাতরম্" লাভপুর

জয় হিন্দ্ 21-3-46

পরমপূজনীয়,

আমাদের ছাত্রদের তরফ থেকে একটা আবেদন জানাচ্ছি। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের স্কুল স্বদেশের কাজে একরূপ নীরব ছিল। তাহার কারণ আপনি অব্যাহত আছেন। বর্ত্তমান নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধীদল হিন্দু মহাসভা। এখানে সত্যনারায়ণ বসু[১] হিন্দু মহাসভার canvas করছেন। প্রথমে আমরা কংগ্রেসের হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক ভোটারের কাছে গিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। হেড মাষ্টার মহাশয়[২] সত্যনারায়ণ বসুকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য আমাদিগকে দমাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের মিটিংয়ের দিন আমাদের স্কুল থেকে ছেড়ে দেন নাই। তারপর তিনি কতকগুলি ছেলেকে একে একে অযথা অপমান করেন। মঙ্গলবার নির্বাচনের দিন আমরা কংগ্রের হয়ে canvas করেছিলাম। পূর্বদিন আমাদিগকে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আমরা সে নিষেধ মানি নাই। নির্ব্বাচনের দিন বাবুদের কর্ম্মচারী ফোড়নবাবু মেয়েরা ভোট দিতে আসিলে তাঁহাদের সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহার সহিত আমাদের বিরোধ হয় এবং তিনি হেড মাষ্টার বা অন্যান্য মাষ্টার মহাশয়দিগকে ডেকে এনে আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করেন।

তাহা আমরা সমবেত ভাবে অস্বীকার করি। সেইজন্য হেড মাষ্টার মহাশয় আমাদের স্কুল বোর্ডিং এর সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী ছাত্রকে একা ডেকে নিয়ে গিয়ে অযথা অপমান করেন। এইরূপে যে একটু দেশের কাজ করতে যায়, তাকেই অপমান করে দমিয়ে দেন। এর প্রতিকারের জন্য আমরা আপনার কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত
লাভপুর স্কুলের ছাত্রবৃন্দ

পত্রখানি পড়ে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি পত্রখানি মিথ্যা। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অবিশ্বাস করতে পারিনি। দু-চারটি কেন অনেক ঘটনার কথা মনে পড়েছে। দুটির উল্লেখ করছি। বহুকাল পূর্বে ১৯৩০শেরও আগে যখন ইউনিয়ন বোর্ডের কাজও গ্রহণ করিনি সেই সময় 'এ্যান্টি ম্যালেরিয়াল' কাজ করবার চেষ্টা করি। আমি রবিবার রবিবার এই কাজে ইচ্ছুক ছেলেদের সাহায্য চেয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত পুলিনবাবু ছেলেদের অনুমতি দেননি। বোধহয় বছর দুয়েক পরে শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীবাবুর[৩] এই খেয়াল হয়। তখন আমি সে সুযোগ গ্রহণ করি। আশ্চর্য্যের কথা শ্রীযুক্ত পুলিনবাবু তখন ষষ্ঠীবাবুর মনস্তুটির জন্য পরমোৎসাহে উৎসাহিত করে ছেলেদের সেই আমারই নেতৃত্বে ছেড়ে দেন।

গত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইলেকশনে (তখন ৺নির্ম্মলশিব বাবু[৪]) জীবিত ছিলেন। নিত্যনারায়ণ[৫] যখন কংগ্রেসের প্রার্থী বিজয়চন্দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন কংগ্রেসের বিপক্ষে কাজ করবার জন্য ছাত্রদল প্রেরিত হয়েছিল নানা এলাকায়।

আরও আছে সে সব থাক। তবে অনুরূপ ঘটনাগুলি স্মরণ করে অবিশ্বাস করে চিঠিখানা ফেলে দিতে পারছি না। কিন্তু ভালভাবে না জেনে কোনকিছু করাও কর্ত্তব্য মনে করি না। এজন্য আমি লাভপুরে বিশেষ ভদ্র এক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে পত্র লিখেছিলাম। তিনি লিখেছেন, বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে ঘটনাটি সত্য বলেই ধারণা। ছেলেরা ভয়ে বলতে চায় না। অর্থাৎ এ বিষয়ে শাসন কঠোর।

তুমি আমার বন্ধু এবং স্কুলেরও শিক্ষক। শ্রীযুক্ত পুলিনবাবুকে পত্র লিখলেই সেটা কার্য্যকারণে Challange-র রূঢ়তায় আত্মপ্রকাশ করবেন। তাই তোমাকে পত্র লিখছি। আমার এই অভিপ্রায় নয় যে শিক্ষককে ছাত্রদের কাছে নত হতে হয় কোন কারণে। কিন্তু আজকের দিনে পৃথিবীর বৃহত্তর জীবনের কল্যাণে এবং ন্যায় ও সত্যপথে চলার আদর্শে অপুপ্রাণিত জাতির বংশধরগণ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে, বলতে গেলে লাঞ্ছিত হবে শিক্ষায়তনের শিক্ষকের দ্বারা। কোন বিপরীত ভাবমূলক আদর্শবাদের প্রেরণায় নয়—নিছক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার ধনশালী বংশধরকে তোষণ নীতির অভিপ্রায় আজও কি সেই পুরাতন মনোভাবের বদল হবে না? প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের ইস্কুল একটা সম্পত্তির সামিল

হয়েই থাকবে ? শিক্ষকেরা তাঁদের অন্নদাতা মনে করে তাঁদের প্রতি আনুগত্যের ভাবাবেগে আলোকেও কালো বলবেন ? যে নূতন দিনের আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে—তার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে বাধ্য করবেন ছাত্রদের ? স্কুলে আপন আপন জাতি-ধর্ম-কুল সংস্কারের আদর্শ মেনে চলার অধিকার আছে ছাত্রদের। শিক্ষকদের এতে হস্তক্ষেপের অধিকার নাই। আজকের দিনে ঐগুলির সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের অধিকার যুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদিত যে কোন রাজনৈতিক মতবাদ পোষণের এবং সেই অনুযায়ী যাবতীয় আইন সঙ্গত কাজ করবার অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, রাজা মহারাজা ব্রাহ্মণ থেকে দরিদ্রতম এবং পতিততম বলে কথিত জাতির ব্যক্তির পর্য্যন্ত এ অধিকার আছে। সুতরাং ছাত্রদেরও আছে। শিক্ষকেরা এ অধিকার স্বীকার করেছেন প্রায় সর্ব্বত্রই। একটা-আধটা জায়গায় কোন শিক্ষক "জয়হিন্দ" বললে বেত্রাঘাত করেন, কংগ্রেসকে ভোট দাও বললে ছাত্রকে অপমান করেন। থাক্—।

এখন প্রশ্ন—এই বিষয় বিবেচনা করে হেড মাষ্টার মশায় আমাকে কি করতে বলেন ? অর্থাৎ তিনি যদি বলেন যা খুশী, তবে সেটা আমি গ্রহণ করব। অথবা তুমি যদি লেখ এতে ছাত্রদেরই দোষ আছে তবে সেইটাই আমি বিশ্বাস করব। কিন্তু উৎসাহী ফোড়নবাবুটি যে মিথ্যা কথা বলেন না এবং বলতে পারেন না এমন বিশ্বাস আমার আদৌ নাই।

এ বিষয়ে আমার প্রস্তাব জানাই। মাষ্টার মশাইরা ছেলেদের এই অধিকার অতঃপর স্বীকার করলে এই কথা ছেলেদের কাছে নয় আমাকে জানালেই হবে। এবং ফোড়নবাবুর অশ্লীল উক্তি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করে যদি তার অপরাধ সত্য প্রমাণিত হয় তবে হেডমাষ্টার মহাশয়কে অন্তরালে রেখে তুমি বা অন্য কেউ ছাত্রদের সান্ত্বনা (ক্ষমা নয়) দিয়ে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলবে।

তোমাকে সত্য কথা জানাই। ব্যাপারটি আমার কাছে এখন তুচ্ছ নয়। এটি আমি লাভপুর তরুণ সম্প্রদায়ের ডাক-আহ্বান বলে মনে করি! তারা জাগতে চাচ্ছে। হাসতে পারো হয়তো ভাববিলাসী বলে। কিন্তু ভাববিলাসই আমরা সর্ব্বস্ব।

আমি তোমার পত্রের অপেক্ষা করব সোমবার পর্য্যন্ত। তারপর নীরবতাকে আমি challange ধরে নেব। এবং সেই অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হব। প্রথম ২,৩টি অধ্যায় জানিয়ে রাখি।

বুধ-বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত এখানকার সকল দৈনিক ইংরাজী বাংলায় এই সংবাদ প্রকাশিত হবে।

এখানে যেসব ছাত্র প্রতিষ্ঠান আছে তাদের কোন একটির বা কয়েকটির হাতে ব্যাপারটি সমর্পন করব। এবং তাদের কয়েকজনকে নিয়ে আমি নিজে লাভপুর গিয়ে প্রতিকার এবং প্রতিবাদ আন্দোলনের ভিত্তি পত্তন করে আসব। এবং আমার সহিযুক্ত বিবৃতি সংবাদপত্র মারফতে ও প্রচারপত্র বিলির দ্বারা প্রকাশ করব। ঘটনা এরপর অবশ্যম্ভাবী গতিতে অগ্রসর হবে। যাই হোক তারজন্য চিন্তিত হব না। লাভপুর ইস্কুল থেকে একদা বৈশাখ মাসে স্কুল কমিটির সভ্যপদ প্রার্থী হিসাবে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মালিকানুগত্যের সমবেত শক্তির কাছে ব্যর্থতার বোঝা

অম্লানবদনে বয়ে ফিরে এসেছিলাম। অবশ্যম্ভাবী হলে এবারও তাই বয়ে কলকাতায় ফিরব। অনুশোচনা করব না।

শ্রীযুক্ত পুলিন বাবুকে বলো—সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমি তাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। তাঁর কোন অসম্মান করা আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের খাতিরে শিক্ষক হিসেবে তাঁর এই তোষণনীতির বিরুদ্ধে আমার না দাঁড়িয়ে উপায় নাই।

স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে, বর্ত্তমান স্কুলের ছাত্রবৃন্দের দু একজন ছাত্রের অভিভাবক হিসেবে সর্ব্বশেষে লাভপুরের সন্তান হিসাবে বাংলার সাহিত্যিক হিসাবে এ আহ্বানে সাড় না দিয়ে আমার উপায় নাই। ইতি—

1/1A, Ananda Chatterjee Lane
Baghbazar, 28-3-46

প্রীতিমুগ্ধ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

• পরবর্তী চিঠিতে অন্যান্য জবাবী বিষয় প্রকাশিত হবে।

১। সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর, বীরভূম। বীরভূমের কৃতিসন্তান, তদানীন্তন হাই স্কুলের সম্পাদক।
২। পুলিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। হাইস্কুলের হেড মাষ্টার।
৩। ষষ্ঠীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। লাভপুরের জমিদার।
৪। সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন।
৫। সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা।

ল্যান্সডাউন মার্কেটের বিখ্যাত মৎস্য ব্যবসায়ী
৺মধুসূদন রায়ের পুত্র
শ্রীকমলকান্ত রায়
বিবাহ অথবা উৎসবে কিংবা নিত্য প্রয়োজনে সকল
রকম মৎস ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়।
যোগাযোগ করুন :
মৎস্য পট্টির ১নং ষ্টল, ল্যান্সডাউন মার্কেট।

প্রত্যাবর্তন

জিতেন কুমার দাস (বীরভূম)

মাধাইয়ের সাধ্য সাধনা নেই মাধবীকে কোলগত ক'রে রাখতে। কেননা উড়ো পাখি পোষ মানে না। মাধবী বোষ্টমীর অন্য বোষ্টম ছিল। একদিন মাধাই শাসন করতে প্রস্তুতি নেয় মাধবীকে। শাসনও করে। শাসনের ভাষায় বলে—যা খুশি তাই হবে না এ আখড়ায়। আখড়ার একটা মর্যাদা আছে।

মুখ ঘুরিয়ে মাধবী বলে—অমর্যাদার কি হয়েছে শুনি ?

—কিছুই হয় নি! আবার সাজ্‌ছো। নিজের ঘটনা—অথচ কিছুই জান না যেন। এ আখড়ায় দেবনা ডোম কি জন্যে আসে ? কি জন্যে আসে হরেন চাটুজ্যে ?

—হাব্‌লার মার কাছে শুনেছ বুঝি।

—হাব্‌লার মা! শুধু কি হাব্‌লার মা ? ও রকম কত হাব্‌লার মা গাঁয়ে পাড়ায় চৈ চৈ ক'রে ফেললে।

—ভারী আমার গাঁ। এ গাঁ তিলকে তাল করে। এ গাঁয়ে খোলাং কুচিতে কথা বলে। হয়কে লয় করে, আর লয়কে হয় করে।

—সবটাই কি মিথ্যে ? সত্য কি তার মধ্যে এক কনাও নেই ? আমায় ঘর করতে ইচ্ছে না হয়, ক'রো না। তাই ব'লে দ্রোপদীর মত পঞ্চস্বামী নিয়েও ঘর বেঁধো না। ক্ষতি হবে। কুলটা নারীর জীবন সুখের হয় না। তোমাকে আগেই আমি বলেছি—এ গাঁ আমার বাড়ি নয়, এ আখড়া আমার আখড়া নয়। অকালে মা বাপ হারিয়েছি। অকূল পাথারে ভসেছি। পথে প্রান্তরে ঘুরেছি। ভিক্ষে ক'রে বেড়িয়েছি। চায়ের ষ্টলে বয়ের কাজ ক'রে বেড়িয়েছি। বাবুদের দয়ায় এ গাঁয়ে ঠাঁই পেয়েছি। ঠাকুর সেবার দায়িত্ব ঘাড়ে চড়েছে। রাধাকৃষ্ণের সেবা, চৈতন্য মহাপুরুষের সেবা, আখড়ায় গোঁসাই বাবাজীদের ফুল বেলপাতা দেওয়া, ভোগ-আরতি, নাম সংকীর্তন—এ কি মুখের কথা। কে পায় এ সব কাজ! বিনিময়ে পাওয়া গেছে বিঘে দশেক জমি, দু'চালা এ আশ্রম, আর আশ্রম সংলগ্ন বাগান।

—অত কথা শুনতে চাই না। ও সব অনেকবার বলেছ। শুনে শুনে কান ভুতিয়ে গিয়েচে।

—কান ভুতিয়ে গেলে মানছ কই। তোমার জ্ঞান কই। যারা আমায় পথ দেখিয়েছে, রুটি রোজগারের ব্যবস্থা করেছে, যাদের পরামর্শে তোমাকে এ আখড়ায় আমার সেবাদাসী ক'রে এনেছি —তারাই জানিয়ে দিয়েছে যে আখড়ায় অনাচার চলছে। আর সে অনাচারের বিষয় তুমিই।

—আমি ?

—হ্যাঁ তুমি। যে আখড়ায় হরিনাম আসর চলে, সে আখড়ায় শুরু হয়ে গেছে খেমটি নাচ আর ঝুমুর গান।

—আর থাম। রায়জী মশাই মুখের সামনেই বলেন - বোরেগী বাইশমুনে জাত। জাত হারিয়ে জাত না পেলে সে বোরেগী হয়।

—ও বেটা তো বলবেই। ছুঁচ যে চালুনকে নিন্দে করে। রায় বামুন কি বামুন হল? মদে ঘটিঘটি মেয়ে নিয়ে লটাপটি। অনাচার—অনাচার! অনাচার যারা ক'রে বেড়ায়, তারাই শুধু জাত পাতের প্রশ্ন করে। এক জাত আর এক জাতকে ঘৃণা করে। জাতপাত আমি মানিনা মাধবী, তবে আচার আচরণটা মানি। ন্যায়-অন্যায়টা বুঝি, ভাল মন্দটা জানি। গাঁয়ে অনেকেই বলছে—আখড়াটা চোরের আড্ডাখানা হয়ে দাঁড়িয়েচে। মদ গাঁজার আসর বসছে। তুমিও ধরে ফেলেছ গণিকা বৃত্তির পথ। আইবুড়োতেও তুমি ভাল ছিলে না। নোংরামী ক'রে বেড়িয়েছ। আশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছ।

—আর ধর্ম! তোমাদের ধর্ম আমি মানি না। ও সব নোড়ানুড়ি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না।

—ঐ নোড়া পাথর আর মাটির ঠাকুরের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয় জাগে। সে আত্মপ্রত্যয়ে অনেক কিছুর অসাধ্য সাধন হয়। সাধনতত্ত্ব কিছু বোঝ না মাধবী।

বেশ কিছু তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর পরস্পরের চারিত্রিক ব্যাপার নিয়ে, অতীত ইতিহাস নিয়ে, ধর্ম অধর্ম নিয়ে কলহ তুঙ্গে ওঠে। সে কলহটাকে কেন্দ্র ক'রে ঝাঁটা বটি, ইট পাটকেল ছোড়াছুড়ি হয়ে যায়। গাঁয়ের প্রান্তে আখড়া হলেও গোল থামাতে লোকের ভিড় জমে। কেউ নেয় মাধবীর পক্ষ, কেউ নেয় মাধাইয়ের পক্ষ, কেউ বা নিরপেক্ষ কথা বলে। কেউ ঘটনাটাকে বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে, কেউ থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। সমাজের যারা হোমড়া চোমড়া এবং যারা আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন, তারা বললেন—চাবকিয়ে দেব। বিদায় তো বোষ্টমীকে নিতেই হবে। ও থাকলে আখড়ার আর ইজ্জৎ থাকবে না মোটেই। যে বাঘ রক্তের স্বাদ পায়, সে বাঘ আরো রক্তের জন্যে দৌড়ে বেড়াবে। আর মাধাই বোষ্টমও চাপা। তোমাকেও অন্যত্র যাওয়ার টিকিট কিনতে হবে।

বেশ কড়া মেজাজে উক্তি করেন—যে উদ্দেশ্যে আখড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়,—তবে আর আশ্রমে থাকার কোন অধিকার নেই। ঠাকুর সেবার আরো লোক মিলবে। পরিচ্ছন্ন আখড়াই আসল আখড়া।

ভিড় কেটে যায়। রক্ষকেরাও বিদায় নেন। তারা বলাবলি করেন—আশ্রমের বিষয় সম্পত্তি আমরা নিজেরা দেখব। বরং মাসোহারা দিয়ে একটা লোক রাখা যাবে। সে শুধু পুজো পাঠ করে যাবে। হরিনাম সংকীর্তন, মাঝে মাঝে মচ্ছব আমরাই ম্যানেজ করব। আমাদের মধ্যেই ভুল হয়েছে। দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষে লাভ নেই। আমাদেরই ছোবল মারবে একদিন।

সেদিন-ই সাঁঝের মুখীতে আখড়া থেকে বেরিয়ে যায় মাধবী। পুটলী বগলে দেব্‌না ডোমের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরদিন সকালে কুলাইপুর ত্যাগ ক'রে চলে যায়। গাঁময় রাষ্ট্র হয় ঝুমুর দলের ম্যানেজার আইবুড়ো দেব্‌না ডোমের সঙ্গে মাধবী বোষ্টমী পালিয়েছে।

এতখানি ঘটে যাবে ঘটনা, সে কথা ভাবতে পারেনি মাধাই। বাঙ্গালী যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না—সে কথা পলাশীর প্রান্তরেই প্রমাণিত হয়েছে। তিন বছর মাত্র ঘর বেঁধেছে মাধবীর সঙ্গে। তারই ভুলের জন্য ঘর ভেঙ্গে গেছে মাধাইয়ের। আশ্রম যে আশ্রম। ঐ সব লোকেদের আশ্রমে ঢুকতে না দেওয়াই ভাল ছিল। এতখানি যে ওদের প্রেম জমে যাবে, তা কে জানে! ভেবেছিল—গোঁসা ক'রে কিছুক্ষণের জন্য হয়ত স'রে থাকবে। রাতের আঁধারে ফিরে আসবে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাছে টেনে নেবে। ঝড়ের পর জল। উত্তপ্ত প্রকৃতি কেমন শীতল হয়ে যায়। তম্বি ইম্বি ক'রে একটু বাড়াবাড়ির পর কেমন যেন শান্তির ঢল নেমে আসবে। মোহনপুরের মেয়ে আর উদয়পুরের ছেলে যে জোট বেঁধে কুলাইপুরে আশ্রয় নিয়েছে—সেটা আশ্রম পরিচালকদের দয়া। কিন্তু দয়াটা অদয়ায় পরিণত হয়ে গেল।

মনের অনুতাপ বেড়ে যায় মাধাইয়ের। চক্রান্তের জাল বোনে মোড়ল গোষ্ঠীর বৃন্দাবন। সে আখড়ার জমিগুলো ভাগীদার স্বরূপ চাষ করতে চায়। মাধাইয়ের আশ্রয়দাতাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে শলা পরামর্শটা মজবুত ক'রে নেয়। মাধাইয়ের উপর অযথা দোষারোপ করে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। মাধাই যখন আখড়ায় ব'সে স্ত্রীর চিন্তায় মশগুল, তখন বৃন্দাবন তার কাছে গিয়ে বলে—ওহে এ আখড়ায় আর তোমার স্থান হচ্ছে না। তোমার যা কেত্তন আর বাউল, লোকে আর শুনতে চায় না। তল্পিতল্পা গোটানো ছাড়া আর পথ নেই। কোন দিন চামড়া কে ঝুরে দেবে। পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার চেষ্টা কর। কথাগুলে ছুঁচের মত বিঁধে যায় মাধাইয়ের মনে। সকাল ছেড়ে গেলে মাধাই বেরিয়ে পড়ে মাধবীর সন্ধানে। শ্বশুর বাড়ি থেকে শুরু ক'রে আশে পাশের গাঁগুলো ঘুরে বেড়িয়ে কোথাও সন্ধান মেলে না মাধবীর। মনের তিতিক্ষায় দিন দু'য়েক ঘুরে বেড়িয়ে আশ্রয় নেয় বর্ধমান জেলার দধিয়া গাঁয়ের গোপাল দাস বাবাজীর আখড়ায়। সাধু বোষ্টমের আড্ডাস্থল সে জায়গাটা। অনেক আখড়ার মধ্যে মোহন আখড়ায় স্থান ক'রে নেয় মাধাই। দিনের বেলায় গাঁ গঞ্জে ভিক্ষেয় বের হয়। রাতে হরিনাম সংকীর্তনে আর বাউল গানে মেতে ওঠে। ফাঁকে ফাঁকে আখড়ার গোঁসাই বাবাজীরা ধর্মীয় আলোচনায় একত্রিত হন। মাতাজীরাও উপস্থিত হ'য়ে অবাক হ'য়ে শোনেন। পুরুষ ছাড়া প্রকৃতি নয়, প্রকৃতি ছাড়া পুরুষ নয়। রাধাকৃষ্ণের যুগল যেন সোনা দিয়ে মোড়া, নিকষিত হেম। একটা দেহের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণ। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নয়। শুধু আয়ান বাবাজী—মাঝখান থেকে যত নষ্টের গোঁড়া।

এ সব কথা মোহন বাবাজীর মুখ থেকে শুনতে শুনতে কেমন যেন বিভিয়ে যায় মাধাই। একদিন গোপাল দাস বাবাজীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন মোহন। গোপাল দাস যে একজন সাধক পুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সাধনার পথ—বড় দুর্গম। গোপাল দাস পাটে নিত্য সেবা ছাড়াও মাকুরী সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত যথাক্রমে চিড়া মহোৎসব, অন্ন মহোৎসব ও ধুলোট উৎযাপিত হয়। সমগ্র বর্ধমান জেলার মধ্যে সেখানে বোরেগীতলার মেলা নামে খ্যাত মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় জমে। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানের প্রসার ঘটা সত্ত্বেও এ পীঠস্থানের মৃত্তিকায় একশিরা ও অম্বশূল ব্যাধির নিরাময় ঘটে। সাধনতন্ত্রে সিদ্ধ সাধকের ঔষধে মেয়েদের মুর্চ্ছা রোগের নিষ্পত্তি ঘটে। গোপাল দাস ছিলেন কৃষ্ণ প্রেমিক। সাধনায় সিদ্ধলাভ করেছিলেন। কেমন সাধক পরীক্ষার জন্য একদল দস্যু পথিমধ্যে স্থির করেছিল গোপাল দাসের ঘরে আগুন ধরানো। তারা আশ্রমে পৌঁছাতেই গোপাল দাস তাদের পরামর্শের কথা বলে দিয়েছেন। মুখের দিকে শুধু তাকিয়েই তাদের শান্ত করেছিলেন। স্পষ্টভাষায় তাদের উদ্দেশ্য ব'লে দিয়েছিলেন। অবাক হয়েছিল দস্যুদল। প্রণাম ক'রে আশ্রম থেকে বিদায় নিয়েছিল। উদ্মাহরণপুরে মড়া পুড়িয়ে একদল লোক গোপাল দাস বাবাজীর আশ্রমে হাজির হয়। তখন পৌষমাস। বাবাজী সাধক বটেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে একজন বলে—কাঁচা আম দিয়ে সোয়াল মাছের ঝালটক খেতে ইচ্ছে হয় বাবা।

গোপাল বাবাজী নির্দেশ দেন—সামনের ঐ গাছ থেকে কাঁচা আম পেরে আন, আর ঐ পুকুরের ঘাটে একটা সোয়াল মাছ ঘুর ঘুর করছে—ওকে ধরে নিয়ে আয়।

বাবাজীর কথামতো কাজ ক'রে হাতে হাতে তার প্রমাণ পায়। কথাগুলো শুনে মাধাই সেদিন থেকেই সাধনতন্ত্রে মন দেয়। ঠাকুর নিয়েই মোহন বাবাজীর চেলা হয়ে পড়ে থাকে।

বছরের পর বছর কাটে। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে যায়। দেব্‌না ডোম মাধবীকে নিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে ডেরা পেতেছে। সবশেষে আশ্রয় নিয়েছে মদনপুরে। হারিয়ে গেছে তার ঝুমুর দল। কারো ডাকে ছুটো মুনিসের কাজ করেছে। কঞ্চি দিয়ে ঝুরি বুনে চাষীর বাড়িতে বিক্রী করেছে। খালে নালায় মাছ ধরেছে। মাধবীকে নিয়ে ফুর্তি করতে অযথা মদ মেরেছে। গাঁয়ের যুবকদের কেউ কেউ দুঃস্থতার অজুহাতে কিছু পয়সার বিনিময়ে মাধবীকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ ক'রেছে। যাত্রার দল খুলে তারা তাকে নাচিয়ে বানিয়েছে। আমোদ করতে দেব্‌নাকে তারা তাদের বাড়িতে কাজে ডুবিয়েছে। মদে গাঁজায় তাকে ভরিয়ে রেখেছে। এত অত্যাচার শরীরে সইবে কেন। দেব্‌নাকে যক্ষ্মা রোগে ধরেছে। ঘন ঘন হাঁপায়। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে। জরাজীর্ণ দেহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির পথ সম্বল হয়েছে। যৌবন কুড়্ কুড়ায় কি ভাত কুড়্ কুড়ায়। এক সন্তানের মা হয়েছে। কিন্তু সে সন্তান সঙ্গে সঙ্গেই মারা

গেছে। সে থেকে তার গনোরিয়া অসুখ এবং মূর্চ্ছা। গাঁয়ের দু'একজন দয়াবতী নারীর সাহায্যে সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। টুট্‌কো টাট্‌কা কয়েকটা ভড়ি বড়ি খেয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের ঔষধ অভাবে, ডাক্তারবাবুর তেমন গ্রাহ্য না থাকাই মাধবীর আর অসুখ সারে না। দোচালা ঘর বানিয়ে মদনপুরে স্বামী-স্ত্রীতে দিন কাটায়। যে সব যুবকরা আমোদ করতে আসত, তারা সব অসময়ে কেটে পড়েছে। মৃতপ্রায় দ্বিতীয় স্বামীর পাশে ব'সে অনেক কথাই মাধবী ভাবে। ভাবে—ফেলে আসা দিনগুলো। বেশি ক'রে মনে পড়ে মাধাইয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধা। উপলব্ধি করে—নারীর নারীত্ব, নারীর সতিত্ব। কোন্‌টা বড়—আচার না অনাচার? ধর্ম না অধর্ম? নিজে সে বড়ই অনুতপ্ত। সেদিন সে কেন শোনেনি—স্বামীর কথা? ঘন ঘন মনে পড়ে মাধাইয়ের মুখখানা। সে যে আদর্শের পথে, ন্যায়ের পথে, সংযমের পথে থাকতে বলতো। কাজের সময় আশ্রমের কাজ সেরে ঠাকুর সেবা, ফল ফুলের গাছপালা নিয়ে, হরিনামের সঙ্গে ভুলে থাকতে বলত।

ভরা ভাদরে একদিন দেব্‌না ডোম কাশতে কাশতে হার্টফেল করে। পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রাম কমিটির দু'একজন চাঁদা তুলে গাঁয়ের পাশে ভান্দরের ধারে দেব্‌নাকে জ্বালিয়ে দেয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটা ছাড়া সে পথে পা মাড়ায় না। আমোদ কারীরাও না। তারা তো অনেক দিন-ই সে পথ ত্যাগ করেছে, অর্থাৎ যেদিন থেকে রোগিনী হয়েছে মাধবী।

একদিন কলেজ পড়ুয়া কিশোর সেই দোচালার পাশ দিয়ে কলেজ যেতে মাধবীর মুর্চ্ছা দেখে থমকে দাঁড়ায়। রইল তার কলেজ যাওয়া। খাতা বই নামিয়ে মাথায় জল ঢালে, পাখার বাতাস করে। আধ ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরলে মাধবী বলে—কে গো তুমি? তোমাকে কোন দিন এখানে দেখি নাই।

—আমি পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। গাঁয়ে তেমন ঘুরি না। তবে কানে এসেছে সব কথা। ভিন গাঁয়ের মেয়ে তুমি।

—হ্যাঁ ভাই। পোড়ার স্যাকন।

—পোড়ার স্যাকন কি এমনিতেই হয়। ভাগ্য গাছের ফল নয়, কর্মের ফল।

কথা শুনে চমকে ওঠে মাধবী। কিশোর বলে—মানুষ কি একই ভাবে দিন কাটায়! বেদনা কিসের?

কিশোর শুনতে না চাইলেও মাধবী জোর ক'রে শোনায়—তার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সে সঙ্গে শোনায় ব্যথা বেদনা ও জ্বালা যন্ত্রণার কথা।

কিশোর বলে—আমার মামার দধিয়া। সেখানে একবার যাও দেখি। যদিও বিজ্ঞানের যুগ, কুসংস্কার মুক্তির যুগ, তবুও সেখানে গেলে মনে হয়, ও সব রোগের মুক্তি ঘটবে তোমার।

কিশোর চলে যায়। বিলম্ব করে না মাধবী। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে পথ চলতে চলতে দধিয়ায় গোপাল দাস পীঠস্থানের সংলগ্ন মোহন বাবাজীর আশ্রমে পৌঁছায় মাধবী। মাধাই যোগাসনে বসে তখন ধ্যানস্থ। কি চেহারা তার! যেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মাধাইয়ের পাশে ব'সে মোহন বাবাজী ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। মাধবী আশ্রমে ঢোকামাত্র মাধাইয়ের ধ্যান ভেঙে যায়। মোহন বাবাজীর ইষ্টমন্ত্র বন্ধ হয়। বলে—কি চাও ?

—চন্নামিত্তি, একটু প্রসাদ, একটু ঠাঁই। আখড়ার ঝি হতে চাই।

মাধাই এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকায়।

"শেষ বিন্দু"

সরোজ কুমার পাণ্ডে

যে দিন আসিবে মোর শেষ দিনটি
সেই দিন রেখো মোর শির
তোমার কোলে তুলে
শেষবারের মত একবার দিও ভালোবেসে।
আমার জীবনের শেষ বিন্দুতে
তুমি দিও ফুলমালা
হয়তো সেদিন পারিবো না
দেখিতে তোমার প্রেমের অমোঘ কান্না।
এ জীবনের যত ছিল তিক্ত
ভালোবাসা, মোর মৃত্যুর পরে
রেখ সেথা মধুময় করে
জানিবো না জীবন ছিল রিক্ত হয়ে
অমৃত সম রাখিও প্রেম ধরার বুকে।
মোর মৃত্যুর শিয়রে পারিবে কি দিতে
অঞ্জলি, তোমার কোমল হৃদয়কে
শেষ হয়েও হবেনা, জীবন মোর
শেষ বিন্দুতে এসে।
প্রিয়া তুমি দিও না বিদায় মোরে
অশ্রু বিন্দু দিয়ে,
হাসি মুখে বিদায় দিও
মৃত্যুর কোলে যবে লবে হরে।

সুরের সংসার বনাম সংসার

(গল্প)

সুনীল কুমার মণ্ডল (বীরভূম)

মনের মাধুরী মিশিয়ে বীণা বাজিয়ে চলেছে রিক্তা। সুরের মূর্ছনায় নিঃশেষে সঁপে দিয়েছে প্রাণকে, নিবেদন করেছে বাণীদেবীর বীণাতে—অমূর্ত অতলান্ত সুরের মাঝে। রাত যে কত হয়েছে তা জানেনা রিক্তা। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে নিশীথ শয্যায় নববিবাহিতা পত্নীকে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু, কানে ভেসে আসছে বীণার মধুর সুর। সাধনায় নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে রিক্তা নিজেকে। ভাবতেই হৃদয়টা আনন্দে লাফিয়ে উঠল নিশীথের। কিন্তু পরমুহূর্তে কাছে না পাওয়ার বেদনা অস্থির ক'রে তুলল। বিছানা ছেড়ে ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল সুরের সাধনায় ডুবে যাওয়া রিক্তার দরজায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে সুরের মূর্ছনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল ভুলে গেল কাছে না পাওয়ার বেদনা!

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল নিশীথ, তা সে জানেনা। এক সময় বাজনা বন্ধ হল। রিক্তা উঠে দাঁড়াল বীণা রেখে। চোখ ফেরাতেই নজর পড়ল নিশীথের উপর। তপঃ স্নিগ্ধা রিক্তাকে আরও উজ্জ্বল মনে হল নিশীথের। ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল, একেবারে বুকের কাছাকাছি। চার চোখ এক হয়ে গেল ক্ষণি বিরহের পর। নির্বাক বিস্ময়ের মধ্যে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। কিছুক্ষণ পর স্বামীর একটা হাত হাতের উপর তুলে নিয়ে রিক্তা বলল, 'কতক্ষণ এসেছো?'

মুগ্ধ বিস্ময়ে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে বলল,

'কতক্ষণ আর, এই হবে একটু।'

মৃদু হেসে লাবণ্যঝরা কণ্ঠে রিক্তা বলল, 'খুব কষ্ট দিচ্ছি তাই না?'

শান্তভাবেই জবাব দিল নিশীথ, 'হয়তো তাই, তবে এ কষ্ট –ভাগ্য আর সাধনা ছাড়া মেলে না!'

এক ঝলক হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে রিক্তা বলল, 'তাই বুঝি।' —গভীর আবেগে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল রিক্তা, মাথাটা সঁপে দিল নিশীথের প্রশস্ত বুকে।

এমনি করেই বয়ে চলে সময়। সুরের আকর্ষণ, প্রয়োজনের ক্ষুধায় ম্লান হয়ে এলো ক্রমশঃ। নিজের প্রয়োজন মাফিক কাছে না পাওয়ার বেদনা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হতে শুরু করল। কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

ধৈর্য্য ধরে স্ত্রীর ক্রম পরিবর্তনের আশায় সংযমের বাঁধনকে আরও একটু শক্ত করল নিশীথ। দেখতে দেখতে বছর অতিক্রান্ত হল। শতচেষ্টা সত্ত্বেও স্বামীর প্রয়োজনের হিসেব ও হৃদয়ের আহ্বান জেনেও অজানা আকর্ষণে রিক্তাকে যেতে হ'ত বীণার পাশে, বীণা হাতে নিলেই হারিয়ে যেতো অজানা রহস্যে—প্রাণময় সুরের জগতে! একদিন যে রিক্তাকে পবিত্র ফুলের সৌন্দর্য্য ও সুর সাধিকা হিসেবে পেয়ে জীবনকে শিল্পের মানদণ্ডে ধন্য করার কল্পনা এসেছিল নিশীথের মনে, সে কল্পনা শুধু কল্পনাই —বাস্তবের রূঢ় প্রয়োজনের শাণিত আঘাতে পথ হারাল। নিশীথের জীবনের দাহিকা শক্তি ভোগের ধূপকাষ্ঠের কাঠ গোড়ায় এসে দাঁড়াল—নগ্ন প্রয়োজন, নগ্ন ক্ষুধায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল।

একদিন বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম এলো না নিশীথের। এমন প্রায়ই ঘটে। ধীর পায়ে মাঝে মাঝে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর রিক্তার বীণা বাজানো শেষ হলে ফিরে আসে। তেমনিই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিশীথ। কিন্তু অন্য দিনের মতো আর অপেক্ষা করতে পারল না, ধৈর্য্যের পরীক্ষায় আজ হেরে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলো. 'রিক্তা!'

কিন্তু, কোন সাড়া মিলল না—নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে রিক্তা বীণার সুরের জগতে। বিরক্ত হয়ে কড়া গলাতেই আবার ডাক দিল নিশীথ, 'রিক্তা! শুনতে পাচ্ছো?'

—চমকে উঠল রিক্তা! বেসুরো রাগিণীতে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে গেল সুর, থেমে গেল বীণার ঝঙ্কার! দরজার দিকে তাকালো বীণা হাতে করেই, চোখে পড়ল স্বামীর রুক্ষ মেজাজী মুখ। কিন্তু নির্বাক রিক্তা।

তিক্ত শ্লেষ মিশিয়ে নিশীথ বলল, 'আমাকে কি এমনি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে!'

কথা শুনেও চুপচাপ বীণা হাতেই বসে রইল রিক্তা বাণীমূর্তির মতো।

নিশীথ আবারও বলল, 'এমন ক'রে কতদিন কাটবে? শুধু তোমার মুখ চেয়েই বসে থাকবো!'

স্বামীর ইঙ্গিতটা যে রিক্তা বোঝেনি তা নয়, তবু সে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। বলবারই বা কি আছে। সত্যিই তো সে বধূ হিসেবে স্বামীর প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি করছে নিয়তই। ধীরে ধীরে বীণাটা নামিয়ে রাখল যথাস্থানে। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বীণার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল বাক্যহারা অপরাধিনীর মতো।

কোন কথার উত্তর না পেয়ে নিশীথ অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'আমাকে একবারেই প্রয়োজন নাই!'

তবুও কোন উত্তর মিলল না দেখে নিশীথ অগ্নিদৃষ্টিতে স্ত্রীর নির্বাক মুখের দিকে তাকালো। নিষ্পলক দৃষ্টিতে রিক্তাও তাকিয়েছিল স্বামীর মুখের দিকেই। হঠাৎ কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল নির্মল শিশিরবিন্দুর মতো রিক্তার সৌন্দর্য্যমাখা নিটোল গাল বেয়ে। বিদ্রুপের হাসিতে

মুখ ভরিয়ে নিশীথ বলল, 'তোমার চোখের জলের মায়াকান্নায় রক্তে মাংসে গড়া জীবন্ত নিশীথ আর ভুলবে না, বহুদিন থেকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছো, এবার—একটা বোঝাপরা দরকার, তাই বাধ্য হয়েই বিরক্ত করলাম !!'

নিশীথের মুখ থেকে সোজাসুজি কথাগুলো শুনে রিক্তার ঠোঁট দু'টো একবার কেঁপে উঠেও থেমে গেল। অশ্রুধারা বইতে শুরু করল। অশ্রুর উপর আলোর রশ্মিতে যেন ফুটে উঠল রিক্তার মনের কথা নিশীথকে বোঝাবার চেষ্টা করল কিন্তু, না—নিশীথের মনের দরজায় বহুদিনের জমা জঞ্জালে, অশ্রুবিন্দুর কথা নিশীথের অন্তরে কোন ছাপ ফেলতে পারল না। ধীরে ধীরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রিক্তা বলল, 'ভুল বুঝো না, আমি যে'—

—ঠোঁট দুটো কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল। মুক্তাবিন্দুর মতো উষ্ণ অশ্রু অবিরল ধারায় বইতে লাগল। ক্রমশঃ সংজ্ঞা হারিয়ে টলে উঠল সে। তারপর আর কিছুই মনে নাই রিক্তার।

বিছানায় স্বামীর পাশে শায়িত অবস্থায় নিজেকে ঘুম ভেঙে দেখল রিক্তা। নিশীথের একটা হাত রিক্তার বুকের উপর রাখা হাতের উপর। অকাতরে ঘুমুচ্ছে নিশীথ। ধীরে ধীরে স্বামীর হাতটা সরিয়ে রেখে উঠবার চেষ্টা করল রিক্তা। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল নিশীথের। গভীর আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরল রিক্তাকে। কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল নীরবে রিক্তার চোখের কোণ বেয়ে।

সকাল হয়ে এলো। বিছানা ত্যাগ করার পর স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা কাজকর্ম করতে লাগল রিক্তা। দিনশেষে রাত্রি নেমে এল। খাওয়া দাওয়া সেরে শয়নকক্ষের মধ্যে বিছানা পেতে বসে রইল রিক্তা। কিছুক্ষণ পর নিশীথ এলো, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির ছোঁয়া। দেখতে লাগল স্ত্রীকে। বিছানায় স্ত্রীর পাশে বসে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, 'বীণা বাজাতে গেলে না ?'

ধীর শান্তভাবে মৃদু হেসেই জবাব দিল রিক্তা, 'বীণা আর নাই বা বাজালাম, ওসব আর ভাল লাগছে না।'

কথা কোনরকমে শেষ করে সযত্নে রিক্তা চাপা দীর্ঘশ্বাসের ঢেউ আত্মগোপন করালো। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল নিশীথ স্ত্রীর মুখের দিকে।

সময়ের স্রোত বয়ে চলে, আসে যায় জোয়ার ভাটার টান—নিশীথ রিক্তার জীবন! রিক্তা বীণা আর বাজায় না। বীণা যন্ত্রের মোহেই বাবার সঙ্গে সে এদের ঘরে বীণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, নিশীথকে বিয়েও করেছিল নির্ঝঞ্ঝাট এই বাড়ীতে বীণার সাধনা ক'রে অখণ্ড শান্তি পাবার দুর্নিবার আশায়। নিশীথের তাৎক্ষণিক ভালবাসার বাঁধনে সে এই কারণেই বাঁধা পড়েছিল—নিশীথের সে কথা অজানা নয়।

সে রাত্রির সেই ঘটনার পর সাতমাস হতে চলল একবারও বীণা ছোঁয় নাই রিক্তা। কয়েক মাস অন্তঃস্বত্বা। রায়বাড়ীর বংশের সন্তান আশ্রয় নিয়েছে তার দেহে। দীর্ঘ একমাস অসুস্থ রিক্তা। বিছানার একপাশে বসে নিশীথ শায়িতা স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। চিকিৎসক সাবধান ক'রে দিয়েছেন, রিক্তার মনে যেন কোন রকম উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়। যদি এই পরিস্থিতি আসে, রোগিনী যে কোন সময়ে হার্টফেল করতে পারে। ধীরে ধীরে কোটরগত চোখ মেলে তাকাল রিক্তা স্বামীর মুখের দিকে। একসময় ক্ষীণকণ্ঠে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির ছোঁয়া মাখিয়ে বলল, 'সুখী করতে পারলাম না, যদি চলে যাই দুঃখ ক'রো না।'

আবার কিছুক্ষণ থেমে টেনে টেনে বলল, 'মনের মতো দেখে একটা বিয়ে ক'রো, তাতে—সত্যিই শান্তি পাবো।'

কথাগুলো শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, সামান্য কথাগুলো বলাতেই ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়তে চাইছে যেন। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশীথের চোখের কোণে জল এসে গেল। বাষ্পরুদ্ধ নীচুগলায় বলল. 'সেরে ওঠো, সত্যিই সুখী হয়েছি! তোমার ইচ্ছায় বাধা দিয়ে সব শান্তি কেড়ে নিয়েছি, তার জন্য আমি সত্যিই'—

কথাটা শুনে হাসির শ্লথ ঢেউয়ার এসে গেল রিক্তার মুখমণ্ডলে—রেখায় রেখায় তা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিশীথ আবার বলল, 'এবার থেকে রোজ বীণা বাজানো শুনবো, বলো—অভিমান ভুলে এবারকার মতো আমাকে—'

কিন্তু নির্বাক রিক্তার মুখ থেকে একটা কথাও বেরুলো না। ধীরে ধীরে ক্লান্ত চোখের পাতা মুদে এলো। ব্যথা ভরা দৃষ্টিতে নিশীথ স্ত্রীর মুখের দিকেই চেয়ে রইল। স্ত্রীকে নির্বাক দেখে নিশীথ আবার বলল, 'এতদিন হয়তো শুধু তোমার দেহটাকেই ভালবেসেছিলাম, এবার তোমাকেই চাই, সম্পূর্ণভাবে তোমাকেই!'

কথাটা শুনে আবার চাইল রিক্তা স্বামীর মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পর টেনে টেনে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমিও তাই চাই, কিন্তু'—গভীর একটা দীর্ঘশ্বাসে তার ক্ষীণ বক্ষপিঞ্জর কেঁপে উঠল।

মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে ভেবে নিশীথ আর কথা বাড়াল না। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ত্রীর চোখের কোণে উদ্গত অশ্রু মুছিয়ে দিতে দিতে নিশীথ বলল, 'তোমার শিল্পিত জীবনের ব্যথা আজ আমাকে বড় অসহায় করে তোলে!'

আবার একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিক্তা বলল, 'আজ আমিও বড় অসহায়, ওসব ভেবে কষ্ট পেয়ো না, ভুলে যাওয়াই ভাল!'

টেনে টেনে কথাগুলো কোনরকমে শেষ করে হাঁফিয়ে উঠল রিক্তা। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য নিশীথ বলল, 'আর একটাও কথা নয়, চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা ক'রো।'

স্বামীর কথা শেষ হতে স্বামীর হাত দুটো বুকের উপর টেনে নিয়ে মৃদু চাপ দিল রিক্তা। শুকনো ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির কুঞ্চন দেখা দিল, তারপর গভীর শ্রান্তিতে চোখের পাতা দুটি ডুবিয়ে দিল। ব্যথা ভরা দৃষ্টি নিয়ে শুধু চেয়ে রইল নিশীথ রুগ্না স্ত্রীর মুখের দিকে।

রাত দুটো বেজে গিয়েছে। নিশীথ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেনা। ওষুধ খাওয়াবার বোধহয় সময় হয়ে এসেছে। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ঘড়ি দেখলো নিশীথ। না, এখনো আধঘন্টা দেরী আছে। স্ত্রীর মুখে হাত বুলিয়ে দিল সে। কিন্তু একি! ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গিয়েছে রিক্তার শরীরটা! তবে কি তাকে ফাঁকি দিয়ে রিক্তা পাড়ি জমিয়েছে দূরে বহু দূরে! আকুল হয়ে ডাকলো নিশীথ, 'রিক্তা! রিক্তা!! রিক্তা!!!

—নির্মম এ বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিধ্বনি দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ফিরিয়ে দিল নিশীথের কথাগুলোকেই—

রিক্তা! রিক্তা!! রিক্তা!!!

জাগ্রত ভারত আত্মা

নীরেন্দু হাজরা

কেউ কি দেখেছে কভু ঐ আকাশ? যদি
চাস হৃদয়ের চাষ বরং দু চোখের নীর—
আগলে রাখিস বক্ষ দিয়ে আরুণির
মতো দেহের পল্লবে। বৈতরণী নদী

হরি পার। শুধু বিশ্বাস। বিবেকানন্দ
শুনেছেন আর্তনাদ। দুঃখ কী স্ফটিক!
যেমন অশ্রুর মুক্ত। হায়রে আনন্দ
তুই আয় আর্তজনের বিশ্বাসে সঠিক।

দুর্গত স্বদেশ ত্রাণ্। লাখেরাজ হ'য় কালি—
মাঠের হৃদয়। কে বাঁচাবে শিশুগাছ
মাটি দিয়ে, জল সেচে? হালফিল মালি
বিশ্বাস ফেরৎ দিচ্ছে—বাতাসে কী আঁচ?

জাগ্রত ভারত আত্মা—সৃষ্টির সৌকর্য
জ্বলে আলো—নীল, জ্বলছে আলোক বর্ষ।

'সেই পয়লা জানুয়ারী'

আদিত্য নাথ মুখোপাধ্যায়

"ভোঁ-ও—ও"

একটানা একটা আওয়াজ বুঝি শুধু !

না। পয়লা জানুয়ারী এলো উনিশ-শো নব্বইয়ের আঁচল ধরে - যেন গর্ভিনী জননী সন্তান প্রসব করলে এইমাত্র।

বৃন্দাবন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

মনে মনে বলে, ঋষিরা বলেছেন, "শব্দই ব্রহ্ম" উপলব্ধিও তাই বলে। তাইতো প্রতিবছর পয়লা জানুয়ারীর প্রাক্কালে ঐ শব্দটাই জানিয়ে দেয় তার পূর্বস্মৃতি। এরপর সপ্তাহ খানেক তাকে কাটাতে হয় অর্ধ-উন্মাদের মতো, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ থেকে শত যোজন দূরে থেকে।

না-না, শুধু উননব্বইয়ের আটটাকে মুছে দিয়ে নয় সংখ্যাটাকে আগিয়ে দিয়ে পাশে একটা শূন্য বসানোর ব্যাপার নয়। উনিশশো নব্বই সানন্দে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে বা বিকৃত মস্তিষ্ক উননব্বই গঙ্গাবক্ষে বিলীন হয়ে গেল—তাও নয় !

দুর্ঘটনার সূত্রপাত অতীব করুণ। মর্ম্মভেদী।

অথচ প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বুঝি কমপক্ষে চব্বিশ হাজার দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়ে দিনগুজরাণের পালা গান গেয়ে থাকে। যেন ছোট ছেলের মতো আঁকি বুকি কেটে চলে, বা আলপনা এঁকে যায় দুষ্ট-মিষ্টির হাসির মোয়া হাতে নিয়ে কিংবা তৃপ্তি অতৃপ্তির মশলা মুড়ি চিবোয় প্রকৃতি তাচ্ছিল্য ভাবে।

নবাবপুত্তুর ঘরে ঢুকছে মাতাল হয়ে।

গভীর রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বুঝতে পেরেছে বকুললতা ছেলে বাড়ী ঢোকার ছাড়পত্র চাচ্ছে। মন টকে গেছে অনেকদিন আগেই। একটা স্বতঃস্ফূর্তভাব···নারীর টান···আপ্লুত স্নেহধারার বালাই আর নেই শুধুমাত্র খট্‌খট্ আওয়াজ কানে আসে। মনে তাচ্ছিল্য আর বিরক্তি—হুঁ, তেড়ে টিকটিকি গায়ে তোলা হয়েছে, দূর মরুক্ গে ছাই। আর পারিনা নাটকের মুখ্য ভূমিকায় যেন অভিনয় চলেছে অন্তরে। পাশ ফিরে শোয় সে।

বৃন্দাবন খাটের উপর ঘুমুচ্ছিলো নাক ডাকিয়ে। বিছানায় উঠে বসে কান বাজায়। এক-দেড় মিনিট অন্তর খট্‌খট্ কড়া নাড়ার শব্দ—'নিশ্চয় সে হতভাগাটা' !

তবু বলে, 'কে—কে কড়া নাড়ে ?'

সাড়া শব্দ নেই।

বুঝতে পারে বৃন্দাবন, হতচ্ছাড়ার পা টলছে। অস্ফুটস্বরে কি যেন বিড় বিড় করে বকছে। মনে মনে গর্জায়, 'কালসাপ! নির্বাচনে ভুল হয়ে গেছে। ওঃ, আর ফিরিয়ে দে'য়া যায় না তাকে!'

দরজা খুলে দেয় বৃন্দাবন তারপর বকুলকে জাগাতে গিয়ে 'থ' বনে যায়। ও ঘুমোয়নি। যেন কোন অজানার তপস্যায় বিভোর হয়ে এলো চুলে হাতো দিয়েছে। বিরক্তি কণ্ঠে বলে, 'ওগো, তোমার ছেলে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেছে—সামলাও!'

মনে মনে বকুল বলে, 'আমার ছেলে!' ভ্রু-কুঞ্চিত করে পেছন দিকে তাকায় সে। কড়া জবাব দিতে গিয়ে থেমে যায়। এ রাত দুপুরে ঝগড়া বাধাবে স্বামী স্ত্রীতে? হুঁ, কেলেঙ্কারী বাধিয়ে লাভ নেই—সকাল হলেই পড়শীদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সামলে নিয়ে বলে, 'বেশ—আসুক'!

শরীরের সব রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। দাঁতে দাঁতে চেপে অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে, 'খচ্চরের ঝাড়'! মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে বকুল নিজেকে প্রশ্ন করে, 'কি প্রয়োজন ছিল পোষ্যপুত্র নে'য়ার? কি সুখটা দিচ্ছে? উঃ, যদিও বা শেষমেশ দুজনে একমত হলো পোষ্যপুত্র নে'য়ার—ঈশ্বর এমন একটি ছেলে জুটিয়ে দিলেন, যাকে নিয়ে অষ্টপ্রহর ভুগতে হচ্ছে!

ও আর ভাবতে পারে না। উৎকট মদের দুর্গন্ধ তখন ঘরে মৌ-মৌ করছে। বাপ দরজা খুলে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে কিন্তু মা—

কথা বলতে ইচ্ছে করে না বকুলের। তবু অত্যন্ত শক্ত হয়েই বলতে হয়। 'হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও—ঘরে খাবার ঢাকা দে'য়া আছে'!

'ঠিক আছে! তুমি ঘুমোও গে—অনেক রাত করে ফেললাম জানোয়ারদের পাল্লায় পড়ে!' অনন্ত টলতে টলতে বলে।

তাচ্ছিল্যের হাসি পায় বকুলের। 'জানোয়ার-জানোয়ারদের দুষছে, এর চেয়ে আশ্চর্য্যের কি আছে?

বিছানায় গিয়ে শোয় বকুল। ক্ষোভ-দুঃখ-ঘৃণা সব একাকার হয়ে যেন গলিত লাভার মতো আপাদমস্তক দৌড়চ্ছে। মন নিয়তির নিষ্ঠুর কারসাজির আর বিড়ম্বনার শিকার হয়ে ভর দুপুর রাতে নীরব ক্রন্দনধ্বনিতে মুখর করে তুলেছে ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর মুসাবিদায়।

লক্ষ্য করে বকুল, অনন্ত হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসা মাত্র, উঠে হাত মুখ ধুয়ে মেঝেতে ধুপ করে শুয়ে পড়লো। নেশার ঘোর তার কাটেনি তখনো। ও এখন সকলের ঘৃণার পাত্র। অথচ সে যখন বাচ্চা ছিলো, আর শুধু তাই বা কেন—যখন এ বাড়ীতে প্রথম আসে, অমন সুন্দর ফুটন্ত ফুলের মতো চেহারাখানা শুধু তারা মা-বাবা নয়, পাড়াপড়শীদের কোলে লোফালুফি হতো।

দুর্ভাবনার মতো যন্ত্রণা নেই। সারারাতে চোখে-পাতায় এক করতে পারেনি বকুল। খসখস্ করে ঘরের ইট খসার মতো জীবনেতিহাসের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে সামনে তার। —মিথ্যের খোলস ছেড়ে সত্যের প্রকাশ অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে—হ্যাঁ, ঐ কালসাপের জন্যেই।

"আয়রে পাখি লেজ ঝোলা
খেতে দেবো চাল ছোলা।"

পাশের বাড়ীর খোকা জেগে উঠছে। মা আদর করছে। হোস পাইপ দিয়ে রাস্তা ধোয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু একখানা করে গাড়ী যাতায়াতের শব্দ কানে আসে। দূরে মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে আসে। বিষন্নতা আর দুশ্চিন্তা চেপে ধরেছে তাকে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনা—বড় ক্লান্ত সে।

পথ নেই।

না শিউলি কাটার না জাল ছেঁড়ার।

মন সত্য প্রকাশে আজ কত উন্মুখ।

হ্যাঁ, সত্যই সত্য।

তবে অসত্যেরও একটা ভূমিকা আছে। সত্যকে দাবিয়ে রেখে সময় সময় তার স্বরূপ সত্য বলেও প্রভাবিত হয়—হার মানিয়ে দেয় চরম সত্যকেও।

অনেক বেলা হয়েছে। তবে তাদের তিনজনের কাছে আরো বড় রাতের প্রয়োজন ছিল—অন্ততঃ আজকের রাতটা।

প্রথমে জেগেছে বৃন্দাবন। টাইমপিসটার ক্রিং—ক্রিং শব্দ ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। হিটারে চা তৈরী করে পরপর দু'কাপ খেয়েছে আর ভেবেছে—'এরপর কি'?

কিছুক্ষণ পর অলসপদে গিয়েছে বকুলের ঘরে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে সে। মুখখানা যেন কালিমা মাখা। ঠোঁটের কোনে একটা অব্যক্ত রেখা তাকে বেদনা বিধুর করে তুলেছে। তারপর গিয়েছে অনন্তর ঘরে—

একমাথা উস্কো খুস্কো চুল। জামা প্যান্ট পরেই দিব্যি মেঝেতে পড়ে হাঁ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। সে সব বদ্‌লাবার মতো ধৈর্য্য ধরতে পারেনি। পাতা বিছানায় একটা বিড়াল দিব্যি ঘুমুচ্ছিলো আরাম করে। বৃন্দাবনকে দেখে ভয় পেয়ে লাফিয়ে মেঝেতে নেমে ডাক ছাড়ে, "মিউ-মিউ—" তারপর দে ছুট—।

ফের বকুলের ঘরে যায় বৃন্দাবন। ঠেলা দিয়ে জানিয়ে বলে, 'যা ঝক্কি গেল তোমার সারারাত আজ আর অফিসের ভাতের জন্য তাড়াহুড়ো করতে হবেনা—খেয়ে নেবো হোটেলে! তুমি বরং আর একটু ঘুমোও, কেমন? হ্যাঁ, আমি চান করে অফিস যাচ্ছি!'

একটা হাই তুলে বকুল জিগ্যেস করে, অনেক বেলা হয়েছে, না?

—সাড়ে ন'টা, যাক্ বাস্ত হয়ো না। নীরব বকুল ঘাড় নাড়ে। ইচ্ছে করেই উঠলো না বকুল। ছোঁড়াটার মাতলামি এই নিয়ে তিনবার ধরা পড়লো। দুবার অনেক বোঝানো অনেক অনুরোধ করা হয়েছে—বিনয়ের অবতারের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়েছে কিন্তু এবার—। আর ক্ষমা নয়; মায়া দয়া নয়, ওকে ঘর থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে।

আচম্বিতে বুকটা টনটন করে ওঠে। ডুকরে কেঁদে ওঠে। 'কথায় বলে' গায়ের কুষ্ঠ আর পেটের দুষ্ট!'

মনটা আড়াল করতে যায়, 'ভাগ্যিস্ কেউ শুনতে পায়নি।' চোখ দুটো ভয়ার্তভাবে ঘরের চার দেওয়ালের দিকে নজর ফেলে।

সেই মুখটা আচম্বিতে ভেসে ওঠে। যথেষ্ট মিল আছে। চোখ-মুখ-দাঁত-নাকের হুবহু মিল। এমন ঘরে অমন চাঁদপানা মুখের ছেলে বেমানান কিন্তু ভবিতব্য—!

প্রথম প্রথম বৃন্দাবন বলতো, 'ছেলেটা এমনভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে মনে হয় মায়ের চেয়েও তোমাকে বেশী চেনে জানে। আমি কোলে নিলে কেবল বলে, মা যাবো—মা যাবো!'

'হয়তো তাই'। বকুল মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়। মনে মনে বলে, যেন প্রভাতসূর্য্য উঁকি দিচ্ছে—শত ঝড়ঝঞ্ঝা, ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তাকে দাবিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে—আলো ঠিকরে বের হবেই। ব্যর্থতার কালিমা ঘায়ের মতো বুকের মাঝে কিলবিল করে ওঠে। হারানো প্রাপ্তির মধ্যে যেন দুস্তর দ্বন্দ্বের অনুপ্রবেশ—তথা স্বমহিমায় প্রকাশের আকুল তৃষ্ণা!

'গেরস্তর কল্যাণ হোক—জয় রাধা গোবিন্দ—মা জননী—কইগো, আমার মা কোথায়'?

সেই খোঁড়া ভিখারীটা দরজায় হাঁক দিচ্ছে।

বকুল জানে, ও যেদিন এ বাড়ীতে ভিক্ষেয় আসে দু'খানা রুটি আর একটু গুড় বা চিনি দিলে খুশী হয়। প্রাপ্যবস্তু মিলতেই করুণ কণ্ঠে বলে, 'বাঁচালে মা। এ দু'খানা খেয়ে দিব্যি এ বেলাটা চলে যাবে—পাঁচ-দশটা পয়সায় কি হবে?'

কাল রাতে রুটি তৈরী করা হয়নি। কি দেবে ওকে? বিছানা ছেড়ে উঠে চোখমুখে জল দিয়ে বকুল সাড়া দেয়। 'যাই রাখহরি—একটু থামো'! তারপর ড্রয়ার থেকে একটা টাকা তুলে নিয়ে বার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। 'আজ রুটি নেই—টাকাটা দিয়ে একখানা পাউরুটি কিনে খাও গে!'

'তোমার কাছে খাবার ভিক্ষে করতে আসি মা, টাকা নয়—থাক্ অন্যদিন বরং আসবো।'

'ভিক্ষের জন্যে দিতে আসা টাকা ঘরে তুলতে নেই হরি—এটা নাও!'

হাত পেতে ভিক্ষে নিয়ে রাখহরি বলে, 'সুখী হও মা, শান্তিতে থাকো'!

করে দিচ্ছি, নার্সিং হোমে ডেলিভারী হবে—যথাসময়ে অনাথাশ্রমে সন্তান পৌঁছে যাবে। হ্যাঁ, তারপর তোর নষ্টা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবো ধুমধাম করে—কুকীর্তি কাক কোকিলেও টের পাবেনা বুঝলি'?

মা বলেছিলো কেঁদে কেটে, 'আমার যে ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে'!

বড়বাবু শ্লেষকণ্ঠে বলেছিলেন, 'যাবারই' তো কথা। মেয়ের রূপ আছে, কাজকর্মেও পটু কিন্তু সভ্যতা শেখাসনি এতটুকু! চোখদুটো যেন পুরুষ মানুষ দেখলেই জরিপ শুরু করে দেয়। হুঁ, যত সব নচ্ছার মেয়ে!

বড় ঘরের আহাম্মুকি কথাও সহ্য করতে হয়। —মাথা পেতে নির্দ্দোষীকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বকুলের সঙ্গে ছোটবাবুর জোর জবরদস্তি ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নেবার কথা সবিস্তারে আর ভয়ে তুলতে পারেনি মা। নিরুপায় হয়ে বড়বাবুর মত ও পথের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে বকুল। তারপর কুমারী মনের পাপ ছাই চাপা দিয়ে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে বৃন্দাবনের কাছে।

'উঃ—সেই অনন্ত! আর কার কাছে মুখফুটে বলবে বিবাহোত্তর জীবনের সন্তান হাত ফের হয়ে তার কাছেই ফিরে এসেছে। অসহ্য!'

অসহ্য হলেও বিষক্রিয়া ষোল আনা।

পুরো মাতাল অনন্ত! অনন্ত তার আচার-আচরণ। বৃন্দাবন মুষড়ে গিয়েছে অনেকদিন কিন্তু বকুল পিতৃকুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে যাচ্ছে—পরিবেশ কতটুকু ভারসাম্য রাখতে পারে?

* * * * *

অফিস ফেরত বৃন্দাবন আসতেই বকুল তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না গো—ওকে তাড়িয়ে দাও বাড়ী থেকে'।

মৃদু হেসে বৃন্দাবন বলে, 'বলেচো ঠিক তবে ওকে তাড়াতে হবে না—যেসব সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা, নিজেই ভেগে যাবে কোনদিন'!

—'ও যে সুখের পায়রা!'

'পতঙ্গ কি সাধ করে আগুনে ঝাঁপ দেয়'?

* * * * *

বৃন্দাবনের কথা ঠিক হলো। কিছুদিন পর মাতাল অবস্থায় বাস চাপা পড়ে অনন্তের পথে চলে গেল অনন্ত।

শ্মশান ঘাটে বকুল নিরস্ত করে বৃন্দাবনকে, 'আমাকে শেষকৃত্যের সুযোগ দাও—হ্যাঁ, মুখাগ্নি আমাকেই করতে হবে!'

'সে কি—তুমি? কি বাজে বকচো! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বকুল, 'আমি যে ওর গর্ভধারিণী!'

'ব-কু-ল, তুমি—!' বৃন্দাবন নিশ্চুপ!

'হ্যাঁ সত্যই সত্য—মিথ্যে কোনদিন সত্য নয়! বিশ্বাস করো. এটা প্রমাণিত সত্য'।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। আজ বৃন্দাবনের ছুটির দিন। আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে একত্রিশে ডিসেম্বর রাত বারোটায় এই কাণ্ডটাই ঘটেছে, পয়লা জানুয়ারী সবে তখন জন্মাচ্ছে।··· সব মনে আছে তার, আর বকুল সেই রাতেই আসামীর জবানবন্দী দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল···সে যে কোথায় কে জানে!

এখনো ভোঁ শব্দটা কানে বাজছে বিস্ময়ের চরমসীমা অতিক্রম করে। বৃন্দাবন আজ বড় একা অন্যদিকে পরম নিশ্চিন্ত; তবু মন চায় এ বয়েসে একজনকে—যার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। দোষ গুণের সংমিশ্রণেই তো মানুষ! বকুলকে সে মনে মনে বারবার ক্ষমা করে।

থাকা না-থাকা

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

আকাশে ছিল বর্ণাঢ্য মেঘমালা
পুষ্পিত ফুলের সম্ভার সবুজে
নদীতে জোয়ারের কলতান
দুধেল শস্য ভরা মাঠ;

এখন এনামেল রংয়ের আকাশ
নিষ্পত্র সর্বস্বান্ত গাছ
বিশীর্ণ নদীর কঙ্কাল
ধূ ধূ হাহাকার মাঠ—

ছিলে তা-ও মিথ্যে নয়
নেই তা-ও যে সত্যি।

একটি কবিতা যেন

নিখিল ঘোষ

ডুবেছি আমি
তুষার-শুভ্র স্থলপদ্মের
পাপড়ীর সাগরে।
ভোরের ভিখারী শিশির
রাত্রি-জাগা স্বপ্নের দুঃখে
কাঁদে, প্রভাতের নূতন কিরণ
মায়ের আদরের মতো,
বিছিয়ে দেয় স্নেহ।
পরিপ্লুত রাজ-হংসীর মতো
একটি কবিতা যেন
নিরতিশয় অভিমানে ঠাসা।

— নিয়মাবলী —

লেখকদের প্রতি

১। 'আভা'তে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনা নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

২। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত রচনা বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

৩। বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় এমন লেখক বা লেখিকার রচনা প্রকাশের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে।

৪। জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যে কোন রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫। নূতন লেখক-লেখিকার প্রকাশযোগ্য রচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

৬। মিল ও ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে সুযোগ দেওয়া হবে।

৭। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৮। উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকদের এক বৎসরের চাঁদা সডাক ২১ টাকা। আজীবন গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫০ টাকা।

২। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

৩। ভি. পিতে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। গ্রাহকদের চাঁদা মণি অর্ডার যোগে 'আভা' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

নারী সেবা সংঘ

১/১/২এ, গড়িয়াহাট রোড, যোধপুর পার্ক,
কলিকাতা-৭০০০৬৮

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

দুঃস্থ মেয়েরা হোমে থেকে নানা ধরণের হাতের কাজের শিক্ষা পায়। এছাড়া ইণ্ডাসট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুলে স্বল্প বেতনে মেয়েরা নানা হস্তশিল্প শিখতে পারে এবং ক্যান্টিন সব রকম খাবার সরবরাহ করে থাকে।

কবি লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক-এর
ভিন্ন স্বাদ ও ছন্দ মধুর
এক অনন্য কালজয়ী কাব্য-গ্রন্থ

কবিতা লহরী মূল্য ৭ টাকা

পরিবেশনায় : ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
সংস্কৃত ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
মতিশীল লাইব্রেরী
১০১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

With best comliments from

M/S. MAHABIR PRASAD KISHANLAL & CO.

H. S. ROAD, DIBRUGARH-786001

A S S A M

Distributor : NESTLE INDIA LTD.

Sister Concern :

ENGINEERING CHAMBER

Dealers in all Types of Electrical Items.

মূল্য ১০·০০ টাকা
Price Rs. 10·00

আভা—ABHA

Regd. No. WB/SC73
R. N. 18638/72

আশ্বিন-কার্ত্তিক—১৩৯৯
September-October—1992

Space Donated by :

RAVI MOTORS
(MARUTI SPECIALIST)

85, MANSATOLA LANE
KIDDERPORE, CALCUTTA-700 023

প্রকাশক :—শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

মুদ্রক :—কৃষ্ণা আর্ট প্রেস, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২০।

ফেরৎ পাঠাতে হলে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাবেন।